

কল্লোল যুগ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রকাশক : শ্রীমতি সরকার
এম. সি. সরকার & সন. প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বক্সিং চার্জের স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৭

মুদ্রক : লালমুদ্রাকার
প্রীতাদিকার প্রিন্টিং
২১ বি, রামনাথ রোড লেন, কলিকাতা-৬

দীনেশরঞ্জন দাশ

ও

গোকুলচন্দ্র নাগের

উদ্দেশে উৎসর্গ

এক

একই প্লেটের ছাপিঠে দু'জনে একই জনের নাম লিখলাম।

ভেরো শ আটাশ সালের কথা। গিয়েছিলাম মেয়েদের ইন্সল-হস্টেলে একটি ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। দারোয়ানের কাছে প্লেট জিন্মা আছে, তাতে কাক্সিতদর্শনার নামের নিচে দর্শনাকাজীর নাম লিখে দিতে হবে। আরো একটি যুবক, আমারই সমবয়সী, এধার-ওধার ঘুরঘুর করছিল। প্লেট নিয়ে আসতেই দু'জনে কাছাকাছি এসে গেলাম। এত কাছাকাছি যে আরি বার নাম লিখি সেও তার নাম লেখে।

প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বন্ধু হয়ে গেলাম দু'জনে।

তার নাম সুবোধ দাঁশগুপ্ত। ডাক নাম, নানকু।

দ্ব্যুত্তা এত প্রগাঢ় হয়ে উঠল যে দু'জনেই বড় চুল রাখলাম ও নাম বদলে ফেললাম। আরি নীহারিকা, সে শেকালিকা।

তখন সাউথ সুবার্বন কলেজে—বর্তমানে আন্ততোধ—আই-এ পড়ি। এন্টার কবিতা লিখি আর “প্রবাসী”তে পাঠাই। আর প্রতি খেপেই প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (তখনকার “প্রবাসী”র “সহসম্পাদক”) নির্মমের মত তা প্রত্যর্পণ করেন। একে ডাক-খরচা তার গুরু-গল্পনা, জীবনে প্রায় শিকার এসে গেল। তখন কলেজের এক ছোকরা পরামর্শ দিলে, মেয়ের নাম দিয়ে পাঠা, নির্ধাৎ মনে ধরে যাবে। তুই যেখানে পুরো পৃষ্ঠা লিখে পাশ করতে পারিস না, মেয়েরা সেখানে এক লাইন লিখেই ফাস্ট ডিভিশন। দেখছিল তো—

ওই ঠিক করে দিলে, নীহারিকা। আর, এমন আশ্চর্য, একটি সন্ত-ফেরৎ-পাওয়া কবিতা নীহারিকা দেবী নামে “প্রবাসী”তে পাঠাতেই পত্রপাঠ মনোনীত হয়ে গেল।

দেখলাম, সুবোধেরও সেই দশা। বহু জায়গায় লেখা পাঠাচ্ছে কোথাও জায়গা পাচ্ছে না। বললাম, নাম বদলাও। নীহারিকার সঙ্গে মিলিয়ে সে নাম রাখলে শেকালিকা। আর, সঙ্গে-সঙ্গে সেও হাতে-হাতে ফল পেল।

লেখা-ছাপা হল বটে, কিন্তু নাম কই? যেন নিজের ছেলেবেলা পরেই বাড়িতে পোদ্দ বিয়েছি। লোককে বিভ্রাণ করানো শক্ত, এ আমার রচনা।

শুক্লজনের গল্পনা শুক্লভর হয়ে উঠল। কেননা আগে শুধু গল্পনাই ছিল, এখন সে সঙ্গে বিশল এসে শুক্লন। নীহারিকা কে?

অনেক কাগজ গায়ে পড়ে নীহারিকা দেবীকে কবিতা লেখবার জন্তে অহ্বোধ করে পাঠাতে লাগল। নিমন্ত্রণ হল কয়েকটা সাহিত্যসভায়, দু-একজন গুণমোহিতেরও খবর পেলাম চিঠিতে। ব্যাপারটা বিশেষ স্বস্তিকর মনে হল না। ঠিক করলাম অন্যথাই ত্রাণ খুঁজতে হবে। বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ ইত্যাদি। অনেক ঠোকাঠুকির পর “প্রবাসী”তে ঢুকে পড়লাম অন্যত্র, “ভারতী”ও অনেক বাধাবারণের পর দরজা খুলে দিল।

গেলাম স্ববোধের কাছে। বললাম, ‘পালাও। মাননীয় সাহিত্যিকারা নীহারিকা দেবীর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসছেন। অন্তত নিজের ছদ্মনাম থেকে পালাও। আত্মরক্ষা করো। নইলে ঘরছাড়া হবে একদিন।’

অর্ধশতকুট একটি বিশেষ হাসি আছে স্ববোধের। সেই নির্লিপ্ত হাসি হেসে স্ববোধ বললে, ‘ঘরছাড়াই হচ্ছে সত্যি। পালাচ্ছি বাংলা দেশ থেকে।’

কোন এক সমুদ্রগামী মাণবাহী জাহাজে ওয়ারলেস-ওয়ার্ডার হয়ে স্ববোধ অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনে। মুক্ত পাখির মতন খুশি। বললে, ‘অফুরন্ত সমুদ্র আর অফুরন্ত সময়। ঠেসে গল্প লেখা যাবে। যখন কিরব দেখা করতে এসো ডকে। অক্স-টাং খুব উপাদেয় জিনিস, খেয়ে দেখতে পারো ইচ্ছে করলে। আর এক-আধ দিন যদি রাত কাটাতে চাও, শুতে পাবে পালকের বালিশে।’

সেই স্ববোধ একদিন হঠাৎ মাত্রাজ থেকে ঘুরে এসে আমাকে বললে, ‘গোকুল নাগের সঙ্গে আলাপ করবে?’

জানতাম কে, তবু বাঁজিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে গোকুল নাগ? ওই লম্বা চুল-ওলা বেহালা-বাজিরের মত যার চেহারা?’

অর্ধকুটশব্দে স্ববোধ হাসল। পরে গভীর হয়ে বলল, “কল্লোলে”র সহসম্পাদক। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তোমার লেখা তাঁকে পড়াব বলে বলেছি। চমৎকার লোক।’

ব্যাপার কি—কৌতুহলী হয়ে তাকলাম স্ববোধের দিকে।

গোকুলের প্রতি, কেন জানি না, মনটা প্রসন্ন ছিল না। যাকেযাকে দেখেছি তাকে ভবানীপুরের বাস্তব, কখনো বা ট্রামে। কেমন ঢেঁল দুই ও দান্তিক মনে হত। মনে হত লম্বা-চালের লোক, ধরাধান্যকে যেন লগ্ন জান

করছে। “প্রবাসী” “ভারতী”তে ছোট খাতিরে প্রেমের গল্প লিখত, যাতে অর্ধেক চাইতে ইঙ্গিত থাকত বেশি, যার মানে, দাঁড়ি-কমার চেয়ে ফুটকিই অধিকতর। সেই ফুটকি-চিহ্নিত হেয়ালির মতই মনে হত তাকে।

দুরের থেকে চোখের দেখা বা কখনো নেণং কান-কথা শুনে এমনি বনগড়া সিদ্ধান্ত করে বসি আমরা। আর সে সিদ্ধান্ত সবসময় এত নিঃসন্দেহ থাকি। সময় কোথায়, সুযোগই বা কোথায়, সে সিদ্ধান্ত যাচাই করি একদিন। বাক্যে কালো বলে জেনেছি সে চিরকাল কালো বলেই আঁকা থাক।

সুবোধ এমন একটা কথা বললে যা কোনো দিন শুনি নি বা শুনব বলে আশা করি নি বাংলাদেশে।

আহাজে বসে এতদিন যত লিখেছে সুবোধ, তারই থেকে একটা গল্প বেছে নিয়ে কী খেরালে সে “কল্লোলে” পাঠিয়ে দিয়েছিল। আরো অনেক কাগজে সে পাঠিয়েছিল সেই সঙ্গে, হয় খবর এসেছে মনোনয়নের, নয় ফেরৎ এসেছে লেখা—সেটা এমন কোনো আশ্চর্যজনক কথা নয়। কিন্তু “কল্লোলে” কী হল? “কল্লোল” তার গল্প অমনোনীত করলে, সম্পাদকীয় লেপাফায় লেখা ফেরৎ গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গেল একটি পোস্টকার্ড। “যদি দয়া করে আমাদের আকস্মিক আসেন একদিন আলাপ করতে!” তার মানে, লেখা অপছন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু লেখক, তুমি অযোগ্য নও, তুমি অপরিভাষ্য। তুমি এসো। আমাদের বন্ধু হও।

ঐ পোস্টকার্ডটিই গোকুল।

ঐ পোস্টকার্ডটিই সমস্ত “কল্লোলে”র স্তর। “কল্লোলের” স্পর্শ। তার নীড়-নির্মাণের মূলমন্ত্র।

খবর শুনে মন নরম হয়ে গেল। আমার লেখা বাতিল হলেও আমার মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল না এত বড় সাহসের কথা কোনো সম্পাদকই এর আগে বলে পাঠায়নি। যা লিখেছি তার চেয়ে যা লিখব তার সম্ভাব্যতারই যে দায় বেশি এই আশ্বাসের ইসারা সেদিন প্রথম পেলাম সেট গোকুলের চিঠিতে।

সুবোধ বললে, ‘তোমার খাতা বের করো।’

তখন আমি আর আমার বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র মোটা-মোটা ধাঁধানো খাতার গল্প-কবিতা লিখি। লিখি কাউন্টেন পেনে নয়—হায়, কাউন্টেন পেনে কেনবার শব্দ আমাদের তখন পছন্দ কোথায়—লিখি বাংলা কলমে, লক্‌জি-মার্কি নিয়ে।

অক্ষর কত ছোট করা যায় চলে তার অলঙ্কার প্রতিযোগিতা। লেখার মাথায় ও নিচে চলে নানারকম ছবির কেরামতি।

তারিখটা আমার তারিখিতে লেখা আছে—৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল। সম্মেলনে স্ববোধের সঙ্গে চললাম নিউ মার্কেটের দিকে। সেখানে কী? সেখানে গোকুল নাগের ফুলের দোকান আছে।

যে দোকান দিয়ে বলেছে সে ব্যবসা করতে বলেনি এমন কথা কে বিশ্বাস করতে পারত? কিন্তু সেদিন একান্তে তার কাছে এসে স্পষ্ট অল্পভব করলাম, চারপাশের এই রানীকৃত ফুলের মাঝখানে তার ক্ষয়ও একটি ফুল, আর সেই ফুলটিও সে অকাতরে বিনামূল্যে বেকার হাতে দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

স্ববোধের হাত থেকে আমার খাতাটা সে ব্যগ্র উৎসাহে কেড়ে নিল। একটিও পৃষ্ঠা না উলটিয়ে কাগজে মূড়ে রেখে দিলে সন্তর্পণে। যেন নীরব নিভৃত্তিতে অনেক যত্ন-সহকারে লেখাগুলো পড়তে হবে এমনি ভাব। হাটের মাঝে পড়বার জিনিস তারা নয়—অনেক সদ্যাবহার ও অনেক সদ্যবিবেচনা পাবার তারা যোগ্য। লেখক নতুন হোক, তবু সে মর্যাদার অধিকারী।

এমনি ছোটখাটো ঘটনায় বোঝা যায় চরিত্রের বিশালতা।

বুঝলাম কত বড় শিল্পীমন গোকুলের। অহুসন্ধিংহু চোখে আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখছে। চোখে সেই যে সন্ধানের আলো তাতে তেল জোগাচ্ছে শ্বেহ।

যখন চলে আসি, আমাকে একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স উপহার দিলে। বললে, ‘কাল সকালে আপনি আর স্ববোধ আমার বাড়ি যাবেন, চা খাবেন।’

‘আপনার বাড়ি—’

‘আমার বাড়ি চেনেন না? আমার বাড়ি কোথায় চেহারা দেখে ঠাণ্ডা করতে পারেন না?’

‘কি করে বলব?’

‘কি করে বলবেন! আমার বাড়ি জু-তে, চিড়িয়াখানায়। আমার বাড়ি মানে আমার বাড়ি। কোন ভয় নেই। যাবেন অচ্ছন্দে।’

পরদিন খুব সকালে স্ববোধকে নিয়ে গেলাম চিড়িয়াখানায়। দেখলাম শিশির-ভেজা গাছ-সবুজ ঘাসের উপর গোকুল হাঁটছে খালি পায়ে। বোধহয় আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। তার সেদিনের সেই বিশেষ চেহারাটি বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে আজো আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। যেস কিলের কথা দেখছে সে, তার ভেত্রে লগ্ন্যাব করছে প্রাপণ, প্রতীক্ষা করছে পিপাসিতের মত।

অঞ্চল সংগ্রাসের মধ্যে খেঁকও সে নির্লিপ্ত, নিরাকাজ্ঞ। অন্তর মধ্যে খেঁকও সে নিঃসঙ্গ, অনন্তলহায।

তার ঘরে নিয়ে গেল আশাদের। চা খেলায়। সিগারেট খেলায়। নিজের অজানতেই তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠল। বললে, ‘আপনার “গুমোট” গল্পটি ভালো লেগেছে। ওটি ছাপব আশাচ্ছি।’

“কল্লোলে”র তখন দ্বিতীয় বর্ষ। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৩০। সম্পাদক শ্রীদীনেশব্রজ দাশ; সহ সম্পাদক শ্রী:গোকুলচন্দ্র নাগ। প্রতি সংখ্যা চার আনা। আট পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজে ছাপা, প্রায় বারো কর্মীর কাছাকাছি।

নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে এত অনিচ্ছুক ছিল গোকুল। পরের কথা ভিজালা করে, প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তবু যেটুকু খবর জানলাম মুখ হয়ে গেল।

গোকুল হালে সাহিত্য করছে বটে, কিন্তু আসলে সে চিত্রকর। আর্ট ইন্সল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে সে। অয়েল পেন্টিং তার পাকা হাত। তারপর তার লম্বা চুল দেখে যে সন্দেহ করেছিলাম, সে সত্যিই সত্যিই বেহালা বাজায়। আর, আরো আশ্চর্য, পান পায়। শুধু তাই? “সোল অফ এ রেড” বা “বাহীর প্রাণ” কল্পে সে অভিনয়ও করেছে অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। শিল্প-পরিচালকও ছিল সে-ই।

গোকুল ও তার বন্ধুদের “কোর আর্টস ক্লাব” নামে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। বন্ধুদের মধ্যে ছিল দীনেশব্রজ দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু আর স্থনীতি দেবী। এরা চারজনে মিলে একটা গল্পের বইও বের করেছিল, নাম “ঝড়ের দোলা।” প্রত্যেকের একটি করে গল্প। মাসিক পত্রিকা বের করবারও পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার আগে ক্লাব উঠে গেল।

‘আমার ব্যাগে দেড় টাকা আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই—ঠিক করলুম “কল্লোল” বের করব।’ দ্বিধা উদ্বেজনায় উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে গোকুল তাকিয়ে রইল বাইরের বোধের দিকে। বললে, ‘সেই টাকার কাগজ কিনে ছাণ্ডবিল ছাপালাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাত্তার বেজার ভিড়, জেলপাড়ার লং দেখতে বেরিয়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যে ছ’জনে আমরা ছাণ্ডবিল বিলোতে লাগলাম।’ পরমুহূর্তেই আবার তার শাস্ত অরে ঔদাস্তের ছোয়া লাগল। বলল, ‘তবু “কোর আর্টস ক্লাব”টা উঠে গেল, মনে কষ্ট হয়।’

বললাম, ‘আপনিই তো একাধারে কোর আর্টস। চিত্র, কবীত, সাহিত্য, অভিনয়।’

নব্বত্যর বিবর্ষ হয়ে হাসল গোকুল। বললে, ‘আমুন আপনারা সবাই “কল্লোল”ে। “কল্লোল”কে আমরা বড় করি। হীনেশ এখন দার্জিলিঙে। সে কিরে আসুক। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে মিলুক আমাদের কর্মের সাধনা।’

যখন চলে আসি, গোকুল হাত বাড়িয়ে আমার হাত স্পর্শ করল। সে স্পর্শ হামুলি শিষ্টাচার নয়, তার অনেক বেশি। একটি উত্তপ্ত স্নেহ, হয়তো বা অস্বুট আশীর্বাদ।

তারপর একদিন “কল্লোল” আফিস এসে উপস্থিত হলাম। ১০।২ পটুয়াটোলা লেন। মিজাপুর স্ট্রীট ধরে গিয়ে বাঁ-হাতি।

“কল্লোল”-আফিস।

চেহারা দেখে প্রথমে দমে গিয়েছিলাম কি সেদিন? ছোট্ট দোতলা বাড়ি — একতলায় রাস্তার দিকে ছোট্ট বৈঠকখানায় “কল্লোল”-আফিস। বাঁয়ে বেকে ছুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাত-দুই চওড়া ছোট একটু রোয়াক ডিঙিয়ে ঘর। বরের মধ্যে উত্তরের দেয়াল ঘেঁবে নিচু একজনের শোয়ার মত ছোট এককালি তক্তাপোশ, শতরঞ্চির উপর চাদর দিয়ে ঢাকা। পশ্চিম দিকের দেয়ালের আধখানা জুড়ে একটি আলমারি, বাকি আধখানায় আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছন দিকে ভিতরে বাবার দরজা, পর্দা ঝুলছে কি ঝুলছে না, জানতে চাওয়া অনাবশ্যক। ফাঁকা জায়গাটুকুতে খান দুই চেয়ার, আর একটি ক্যানভাসের ডেক-চেয়ার। ঐ ডেক-চেয়ারটিই সমস্ত “কল্লোল”-আফিসের আভিভ্যাস। প্রধান বিলাসিতা।

সম্পাদকী টেবিলে গোকুল নাগ বসে আছে, আমাদের দেখে সন্মিত ‘ভাগ্যমন’ জানালে। তক্তাপোশের উপর একটি প্রিয়দর্শন যুবক, নাম ভূপতি চৌধুরী, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে, বাড়ির ঠিকানা ৫৭ আমহাস্ট স্ট্রীট। আরো একটি ভক্তলোক ব’লে, ছিমছাম ফিটফাট চেহারা, একটু বা গভীর ধরনের। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লতীপ্রসাদ সেন, “কল্লোলের” গোরাবাবু। দেখতে প্রথমটা একটু গভীর, কিন্তু অপেক্ষা করো, পাবে তার অস্তরের যথুতর পরিচয়।

ভূপতির সঙ্গে একবাক্যেই তাব হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চলে এল নৃপেন্দ্রকঙ্ক চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু প্রথম দিন সব চেয়ে যা মন ভোলাল তা হচ্ছে ঠিক লাফেচারটের সময়

বাড়ির ভিতর হতে আসা প্লেট-ভরা এক গোছা কুটি আর বাটিতে করে তরকারি। আর মাখা-গুনতি চায়ের কাপ।

তাবল্যাম, প্রেমেনকে বলতে হবে। প্রেমেন আমার ইস্কুলের সঙ্গী। ম্যাট্রিক পাশ করেছি এক বছর।

দুই

সাউথ সুবার্বন ইস্কুলে সার্ট' ক্লাসে উঠে প্রেমেনকে ধরি। সে-সব দিনে যোলো বছর না পুরলে ম্যাট্রিক দেওয়া যেত না। প্রেমেনের এক বছর ঘাটতি পড়েছে। তার মানে বোল কলার এক কলা তখনো বাকি।

ধরে ফেললাম। লক্ষ্য করলাম সমস্ত ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে অসাধারণ ঐ একটিমাত্র ছাত্র—প্রেমেন্দ্র মিত্র। এক মাথা ঘন কৌকড়ানো চুল, সামনের দিকটা একটু আঁচড়ে বাকিটা এক কথায় অগ্রাহ্য করে দেওয়া—সুগঠিত দাঁতে সুখস্পর্শ হাসি, আর চোখের দৃষ্টিতে দূরভঙ্গী বুদ্ধির প্রাণবর্তা। একঘর ছেলের মধ্যে ঠিক চোখে পড়ার মত। চোখের বাইরে একলা ঘরে হয়তো বা কোনো-কোনো দিন মনে পড়ার মত।

এক সেকশনে পড়েছি বটে কিন্তু কোনো দিন এক বেঞ্চিতে বসিনি। যে কথা-বলার জগ্রে বেকির উপর উঠে দাঁড়াতে হয়, তেমন কোনো দিন কথা হয়নি পাশাপাশি বসে। তবু দূর থেকেই পরস্পরকে আবিষ্কার করলাম।

কিংবা, আদত কথা বলতে গেলে, আমাদের আবিষ্কার করলেন আমাদের বাংলার পণ্ডিত মশাই—নাম রণেন্দ্র গুপ্ত। ইস্কুলের ছাত্রদের মুখ-চলতি নাম রাখেন পণ্ডিত।

গায়ের চাকর ভান হাতের বগলের নিচে দ্বিয়ে চালান করে বা কাঁধের উপর ফেলে পাইচারি করে-করে পড়াতেন পণ্ডিত মশাই। অজুত তাঁর পড়বার ধরন, আশ্চর্য তাঁর বলবার কায়দা। থমথমে ভারী গলার মিষ্টি আওয়াজ এখনো যেন স্ননে পাচ্ছি।

নিচের দিকে সংকুত পড়াতেন। পড়াতেন ছড়া তৈরি করে। একটা আমার এখনো মনে আছে। ব্যাকরণের স্বরূপ শেখাবার জগ্রে সে ছড়া, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তার জায়গা পাওয়া উচিত।

ব্যাধ্-যজ্-এদের য-কার গেল
 তার বদলে ই,
 ই-কার উ-কার দীর্ঘ হল
 স্বকারান্ত রি ।
 শাস্-এর হল শিব-দেওয়া রোগ
 অস্-এর হল ভু,
 বপ সাহেবের হুপ এসেছে
 হের সাহেবের হু ।
 বহরমপুরের বাদীরাই সব
 বদম্বায়েসী ছেড়ে
 চন্দ্র পরান দয়াল হরি
 সবাই হল উড়ে ।

একটু ব্যাখ্যা করা দরকার । ব্যাচ্যাস্তর শেখাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই—কতৃ'বাচ্য থেকে কর্মবাচ্য । তখন সংকৃত ধাতুগুলো কে কি রকম চেহারা নেবে তারই একটা সরল নির্ধষ্ট । তার মানে ব্যাধ্-আর যজ্-ধাতু য কলা বর্জন করে হয়ে দাঁড়াবে বিধ্যতে আর ইজ্যতে । কৃষতে-মৃষতে না হয়ে হবে ক্লিষতে-ম্লিষতে । তেমনি শিষ্যতে, ভূষ্যতে, হুপ্যতে, হৃষ্যতে । বহরমপুরের বাদীরাই সব চেয়ে মজার । তারা সংখ্যায় চারজন—বচ, বপ, বদ আর বহ । কর্মবাচ্যে গেলে আর বদম্বায়েসি থাকবে না, সবাই উড়ে হয়ে যাবে । তার মানে, ব উ হয়ে যাবে । তার মানে উচ্যতে, উপ্যতে, উগ্যতে, উহ্যতে । তেমনি ভাববাচ্যে উক্ত, উপ্ত, উদ্বিত, উচ । ছিল বক হয়ে দাঁড়াল উচ্চিংড়ে ।

বাংলার রচনা-ক্লাসে তিনি অনায়াসে চিহ্নিত করলেন আমাদের ছ'জনকে । যা লিখে আনি তাই উচ্ছৃমিত প্রশংসা করেন ও আরো লেখবার অন্তে প্রবল প্ররোচনা দেন । একদিন দুঃসাহসে ভর করে তাঁর হাতে আমার কবিতার খাতা তুলে দিলাম । তখনকার দিনে যেসেদের গান গাওয়া বরদাস্ত হলেও নৃত্য করা গর্হিত ছিল, তেমনি ছাত্রদের বেলায় গল্পরচনা সহ্য হলেও কবিতা ছিল চরিত্রহানিকর । তা ছাড়া কবিতার বিষয়গুলিও খুব স্বর্গীয় ছিল না, বন্ধিও একটা কবিতা “স্বর্গীয় প্রেম” নিয়ে লিখেছিলাম । কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের কি আশ্চর্য ঐর্ষ্য ! পছন্দ, অপছন্দের বিষয়, সংকুচিত কল্পনা—তবু যা একটু পড়েন, তাই বলেন চমৎকার । বলেন, ‘লিখে যাও, খেয়ো না, নিশ্চিন্তরূপে

অবস্থান করো। যা নিশ্চিতরূপে অবস্থান তারই নাম নির্ভা। আর, শোনো—’
কাছে ভেঁকে নিলেন। হিঁতৈবী আশ্রয়নের মত বললেন, ‘কিন্তু পরীক্ষা কাছে
ভুলো না—’

ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগ্রি আর প্রেমেন ছ’জনেই মান রেখেছিলাম পণ্ডিত
মশায়ের। ছ’জনেই ‘ভি’ পেয়েছিলাম।

রাস্তায় একদিন দেখা পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। কাঁধ চাপড়ে বললেন,
‘আমার মান কিন্তু আরো উচু। নি-পূর্বক স্থা ধাতু অ—কতৃ’বাচ্যে। মনে
মনে থাকে যেন।’

তায় কথাটা মনে রেখেছি কিনা আমাদের অগোচরে তিনি লক্ষ্য করে
এসেছেন বরাবর। শুনেছি পরবর্তীকালে প্রতি বৎসর নবাগত ছাত্রদের উদ্দেশ্য
করে মেহ-গঙ্গদ কঠে বলেছেন—এইখানে বলত প্রেমেন আর ঐখানে অচিন্ত্য!

ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেমেন চলে গেল কলকাতায় প্রভুতে, আমি ভর্তি হলাম
ভবানীপুরে। সে সব দিনে ধর্মতলা পেরিয়ে উত্তরে গেলেই ‘ভবানীপুরের
লোকেরা তাকে কলকাতায় যাওয়া বলত। হয়তো ঘুরে এলাম বামাপুতুর বা
বাহুড়বাগান থেকে, কেউ জিগগেস করলে বলতাম কলকাতায় গিয়েছিলাম।

নন-কোঅপারেশনের বান-ভাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার
বারান্দা থেকে দেশবন্ধুর বাড়ির আঙিনা দেখা যায়—শুধু এক দেয়ালের ব্যবধান।
বহাওয়া আছেন, মহম্মদ আলি আছেন, বিপিন পালও আছেন বোধহয়—তরঙ্গ-
ভাঙনে কলেজ প্রায় টলোমলো। কি ধরে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে,
ভনলাম প্রেমেন তেনে পড়েছে।

ডাঙা পেল প্রায় এক বছর মাটি করে। এবার ভালো ছেলের মত
কলকাতায় না গিয়ে ঢুকল পাড়ার কলেজে। সকাল-বিকেলের সন্ধ্যাকে ছুপুবেও
পেলাম এবার কাছাকাছি। কিন্তু পরীক্ষার কাছাকাছি হতেই বললে, ‘কী হবে
পরীক্ষা দিয়ে। ঢাকায় যাব।’

১৯২২-সালে পুরী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠি :

“ছুংখের তপস্তায় সবই অমৃত, পথেও অমৃত, শেষেও অমৃত। সকল হও
ভালই, না হও ভালই। আসল কথা সকল হওয়া নাহওয়া নেই—তপস্তা আছে
কিনা সেইটেই আসল কথা। সৃষ্টি তো স্থিতির খেলালে তৈরি নয়, গতির
খেলালে। যা পেলুম তার অহরহ সাধনা দিয়ে রাখতে হয়, নইলে কেসে যেতে
হয়। এখানে কেউ পায় না, পেতে থাকে—সেই পেতে-থাকার অবিরাম তপস্তা

করছি কিনা তাই নিয়ে কথা। যাকে পেতে থাকি না সে নেই।...যা পাই তাও কেলে যাই, গাছ যেই ফুল পায় অমনি কেলে দিয়ে যায়, তেমনি আমার কল কেলে দিয়ে যায় পাওয়া হলেই।...যারা পায় তাদের মতো হতভাগা আর নেই। হৃৎকের ভয়ে যারা কঠিন তপস্যা থেকে বিরত হয়ে সহজ পথ খোঁজে আত্মার, তাদের আরামই জোটে, আনন্দ নয়।...

আমি পড়াশুনা একদিনও করিনি—পারা যায় না। আমার মত লোকের পক্ষে পড়ব বললেই পড়া অসম্ভব। হৃৎক এবার একজামিন দেওয়া হবে না।

তোর প্রেমের মিত্র”

পুরী থেকে লেখা আরেকটা চিঠির টুকরো—সেই ১৯২২-এ :

“সমুদ্রে খুব নাইছি। মাঝে-মাঝে এই প্রাচীন পুরাতন বৃদ্ধ সমুদ্র আমাদের অর্বাচীনতায় চটে গিয়ে একটু-আধটু ঝাঁকানি কানমলা দিয়ে দেন—নইলে বেশ নিরীহ দাঙ্গামশাইয়ের মত আনমনা।

ঝিঝু কুড়োচ্ছি। পড়াশোনা মোটেই হচ্ছে না—তা কি হয়?”

সে-সব দিনে হৃৎক লেখক আমাদের অভিভূত করেছিল—গল্পেউপন্যাসে মণীন্দ্রলাল বসু আর কবিতায় স্বধীরকুমার চৌধুরী। কাউকে তখনো চোখে দেখিনি, এবং এঁদেরকে সত্যি-সত্যি চোখে দেখা যায় এও যেন প্রায় অবিস্মৃত ছিল। কলেজের এক ছাত্র—নাম হয়তো উষারঞ্জন রায়—আমাদের হঠাৎ একদিন বিষম চমকে দিলে। বলে কিনা, সে স্বধীর চৌধুরীর বাড়িতে থাকে, আর, শুধু এক বাড়িতেই নয়, একই ঘরে, পাশাপাশি তক্তাপোশে! যদি বাই তো দুপুরবেলা সেই ঘরে ঢুকে বাস্তু ঘেঁটে স্বধীর চৌধুরীর কবিতার খাতা আমরা দেখে আসতে পারি।

বিনাবাক্যব্যয়ে হৃৎকনে রঙনা হলান দুপুরবেলা। স্বধীর চৌধুরী তখন রমেশ মিত্র রোডে একতলা এক বাড়িতে থাকেন—তখন হয়তো রাস্তার নাম পাকাপাকি রমেশ মিত্র রোড হয়নি—আমরা তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর ডাল-খোলা বাস্তু হাঁটকে কবিতার খাতা বার করলাম। ছাপার অক্ষরে যার কবিতা পড়ি স্বহস্তাক্ষরে তাঁর কবিতা দেখব তার স্বাদটা শুধু ভীতভয় নয়, মহন্তর মনে হল। হাতাহাতি করে অনেকগুলি খাতা থেকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেললাম হৃৎকনে। একটা কবিতা ছিল “বিক্রোহী” বলে। বোধহয় নজরুল ইসলামের পাণ্ডা জবাব। একটা লাইন এখনও মনে আছে—“আমার বিক্রোহ হবে

প্রার্থকের মত।” গভীর উপলব্ধি ও নিঃশেষ আত্মনিবেদনের মধ্যেও যে বিরোধ থাকতে পারে—তারই শাস্ত্রস্বীকৃতির মত কথাটা।

কবিতার চেয়েও বেশি মৃদু করল কবিতার খাতাগুলির চেহারা। বোলপেজী ডবল ডিহাই সাইজের বইয়ের মত দেখতে। মনে আছে পরদিনই দুইজনে ঐ আকৃতির খাতা কিসে ফেললাম।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে বটভাঙ্গা বাড়ি, পাথরচাপতি, মধুপুর থেকে প্রেমেন আমাকে যে চিঠি লেখে তা এই :

“অচিন, তবু মনে হয় ‘আনন্দাচ্ছ্যেব ধর্ম্মিয়ানি সূতানি জায়ন্তে।’ তারা মিথ্যা বলেনি সেই সত্যের সাধকেরা, স্বপ্নিরা। আনন্দে পৃথিবীর গারে প্রাণের রোমাঞ্চ হচ্ছে, আনন্দে মৃত্যু হচ্ছে, আনন্দে কারা আনন্দে আঘাত সহিছে নিখিলভুবন। নিখিলের সত্য হচ্ছে চলা, প্রাণ হচ্ছে দ্রুত নদী—সে অস্থির, সে আপনার আনন্দের বেগে অস্থির। আনন্দভরে সে আর স্থির থাকতে পারে না—প্রথম প্রেষের স্বাদপাওয়া কিশোরী। সে আঘাত যেচে খেয়ে নিজের আনন্দকে অম্লভব করে। ভগবানও ওই আনন্দভরে স্থির থাকতে পারেননি, তাই সেই বিরাট আনন্দময় নিখিলভুবনে নেচে কুঁদে খেলায় যেতেছেন। সে কি দ্রুতপনা! অব্যাহত শিশুর দ্রুতপনার তারই আভাস।

কিন্তু মানুষ যে বড় বড়, সে যে ধারণাতীত—সে যে স্থায়ী চৌধুরী বা বলতে গিয়ে বলতে না পেরে বলে ফেললে—‘ভয়ংকর’—তাই। তাই তার সব ভয়ংকর, তার আনন্দ ভয়ংকর, তার দুঃখ ভয়ংকর, তার ত্যাগ ভয়ংকর, তার অহংকার ভয়ংকর, তার স্বপ্ন ভয়ংকর, তার সাধনা ভয়ংকর। তাই একবার বিশ্বস্তে হতভম্ব হয়ে যাই যখন তার সাধনার দিকে তাকাই, তার আনন্দের দিকে তাকাই। আবার ভয়ে বুক দমে-যায় যখন তার দুঃখের দিকে তাকাই, তার স্বপ্নের দিকে তাকাই। আর শেষকালে কিছু বুঝতে না পেরে বলি—ধস্ত ধস্ত ধস্ত।

কাল এখানে চমৎকার জ্যোৎস্নারাত ছিল। সে বর্ণনা করা যায় না। মনের মধ্যে সে একটা অহুত্বুতি শুধু। ভগবানের বীণায় নব নব সুর বাজছে—কালকের জ্যোৎস্নারাতের সুর বাজছিল আমাদের প্রাণের তারে, তার সাড়া পাচ্ছিলুম। তারাগুলো আকাশে ঠিক মনে হচ্ছিল সুরের কিনকি আর পথটা তজ্জা, পাতলা তজ্জা, আকাশটা স্বপ্ন। এক মুহূর্তে মনের ভিতর দিয়ে সুরের ঝিলিক হেনে দিয়ে গেল, বুঝলুম, ভয় মিথ্যা হাতাশা মিথ্যা মৃত্যু-মিথ্যা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে আমার জীবন দিয়ে। বলেছিলাম

প্রিয়া অচেনা, আজ দেখছি আমি যে আমার অচেনা। প্রিয়া যে আমিই। এক অচেনা দেহে, আর এক অচেনা দেহের বাইরে। স্কুল জগতে একদিন আদিগ্রাণ—protoplasm—নিজেকে ছুঁতগ করেছিল। সেই ছুঁতগই যে আমরা। আমরা কি ভিন্ন? আমি পৃথিবী, প্রিয়া আকাশ—আমরা যে এক। এই এককে আমার চিনতে হবে আমার নিজের মাঝে আর তার মাঝে। এই চেনার সাধনা অন্তহীন তপস্কা হচ্ছে মানুষের। সেই চেনার কি আর শেষ আছে? একদিন জানতুম আমি রক্তমাংসের মানুষ, ক্ষুধাতৃষ্ণাতর্য আর প্রিয়া দেহস্থলের উপাদান—তারপর চিনছি আর চিনছি। আজ চিনতে চিনতে কোথায় এসে পৌঁছেছি, তবু কি আনন্দের শেষ আছে! আমার আমি কি অপরূপ, কি বিস্ময়কর! এই চেনার পথে কত রৌদ্র কত ছায়া কত বড় কত বৃষ্টি কত সমুদ্র কত নদী কত পর্বত কত অরণ্য কত বাধা কত বিয় কত বিপদ কত অপথ।

খামিসনি কোনদিন খামিসনি। খামব না আমরা কিছুতেই না। তবু মানে খামা হতাশা মানে খামা অবিশ্বাস মানে খামা ক্ষুদ্র বিশ্বাস মানেও খামা। দেহের ডিঙা ঘড়ি তুকানে ভেঙে যায় গুঁড়িয়ে যায়, গেল তো গেল—‘হালের কাছে মাঝি আছে।’ ঘোঁবনটা হচ্ছে রাত্রি, তখন আমার পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়, শুধু থাকে প্রিয়ার আকাশ—ঘেটুকু আলো পড়ে, কখনো তারার কখনো জ্যোৎস্নার, আমার পৃথিবীর ওপর শুধু সেইটুকু। তোর সেই জীবনের রাত্রি এসেছে, কিন্তু এসেছে ঘোর ঘনঘটা করে, নিবিড় করে—তা হোক, বিচিন্ন পৃথিবী। বিচিন্ন জীবনের কাহিনী। শুধু মনের মধ্যে ময় হোক—‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।’ যদি কেউ ঐশ্বর্য নিয়ে জুখী হয় হোক, ক্ষুদ্র শাস্তি নিয়ে জুখী হয় হতে দাও, আমরা জানি ‘ভূমৈব স্বথং নান্নে স্বথমস্তি।’ অতএব ‘ভূমৈব জিজ্ঞাসিতব্য।’ সেই ভূমার খোঁজে যেন আমরা না নিরন্ত হই। আর ঘোঁবনকে বলি ‘বয়সের এই স্বাভাবিকালের বাধনখানা তোরে হবে খণ্ডিতে।’

এর ক’দিন পরেই আরেকটা চিঠি এল প্রেমেনের সেই মধুপুর থেকে :

“হ্যা, আরেকটা খবর আছে। এখানে এসে একটা কবিতার শেষ পূরণ করেছি আর চারটে নতুন কবিতা লিখেছি। তোকে দেখাতে ইচ্ছে করছে। শেষেরটার আরম্ভ হচ্ছে ‘নমো নমো নমো।’ মনের মধ্যে একটা বিরাট জ্বাবের উদয় হয়েছিল, কিন্তু লব তাবা ওই গুরুপদীর ‘নমো নমো নমো’-র মধ্যে এমন

একাকার হয়ে গেল যে কবিতাটা বাড়াতেই পেল না। কবিতার নবম কথা শুই
‘নমো নমো নমো’র মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে রইল। কি রকম কবিতা লিখছিল?”

ভিল

ডেরো-শ একত্রিশ সালের পরমা জ্যৈষ্ঠ আমি প্রোমেন আর আমাদের দু’টি
সাহিত্যিক বন্ধু মিলে একটা লংঘ প্রতিষ্ঠা করলাম। তার নাম হল “আত্মদায়িক”।
আর বন্ধু দু’টির নাম শিশিরচন্দ্র বসু আর বিনয় চক্রবর্তী।

যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে। অভিভাবক ছাড়া আলাদা একটা ধরে
জন কয়েক বন্ধু মিলে মনের স্বথে সাহিত্যিকগিরির আখড়াই দেওয়া। সেই
গল্প-কবিতা পড়া, সেই পরস্পরের পিঠ চুলকানো। সেই চা, সিগারেট, আর
সর্বশেষে একটা মাসিক পত্রিকা ছাপাবার রঙিন জল্পনাকল্পনা। আর, সেই
মাসিক পত্রিকা যে কী নিদারুণ বেগে চলবে মুখে মুখে তার নিভুল হিসেব করে
কেলা। অর্থাৎ ছুয়ে-ছুয়ে চার না করে বাইশ করে কেলা।

তখনকার দিনে আমাদের এই চারজনের বন্ধুত্ব একটা দেখবার মত জিনিস
ছিল। রোজ সন্ধ্যায় একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা
উডবার্ন পার্কে, নয়তো স্কিন্টো স্কোয়ারে মালীকে চার আনা পরমা দিয়ে নৌকো
বাইতাম। কোন দিন বা চলে যেতাম প্রিন্সেপ ষাট, নয়তো ইডেন গার্ডেন।
একবার মনে আছে, স্কিমায়ে করে রায়গঞ্জে গিয়ে, সেখান থেকে আন্দুল পর্বত
পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা করেছিলাম চারজন। আমাদের দলে তখন মাঝে-মাঝে
আরো একটি ছেলে আসত। তার নাম রমেশচন্দ্র দাস। কালে ভদ্রে আরো
একজন। তার নাম সুনির্মল বসু। “বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি
মাইকেল, যেওনা যেওনা সেখা যেখা চলে মাইকেল।” মনোহরণ শিশু-কবিতা
লিখে এর মধ্যে সে বনেদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

শিশির আর বিনয়ের সাহিত্যে বিশেষ প্রতিশ্রুতি ছিল। বিনয়ের ক’টি
ছোট গল্প বেরিয়েছিল “ভারতী”তে, তাতে দৃষ্টবশত ভালো লেখকের স্বাক্ষর
আকা। শিশির বেশির ভাগ লিখত “মৌচাক,” তাতেও ছিল নতুন কোণ
থেকে লেখবার উদ্ভিষ্ট। আমরা চারজন মিলে একটা নতুন উদ্যোগ
আরম্ভ করেছিলাম। নাম হয়েছিল “চতুষ্কোণ”। অবিভক্ত বেটা শেষ হয় নি,

শিশির আর বিনয় কখন কোন ফাঁকে-কেটে পড়ল কে জানে। বেই একই উপভাস লেখার পন্থিকল্পনাটা আমি আর প্রেমেন পরে সম্পূর্ণ করলাম আমাদের প্রথম বই “বাঁকালেখা”য়। জীবনের লেখা যে লেখে সে লোভা লিখতে শেখেনি এই ছিল সেই বইয়ের মূল কথা।

“আত্মদয়িক” বৈঠক বসত রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ভালো ঘর পাইনি কিন্তু ভালো সঙ্গ পেয়েছি এতেই সকল অভাব পুষিয়ে যেত।’ আড্ডায় প্রথম চিড় খেল প্রেমেন ঢাকায় চলে গেলে। সেখানে গিয়ে সে “আত্মদয়িক”র শাখা খুললে, শুভেচ্ছা পাঠাল এখানকার আত্মদয়িকদিগের :

“আত্মদয়িকগণ, আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ঢাকায় এসেও আপনাদের ভুলতে পারছি না। আজ বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যায় সেই ছোট ঘরটিতে যখন জলপা জমে উঠবে তখন আমি এখানে বসে দীর্ঘনিশ্বাস কেনব বই আর কি করব? ঢাকার আকাশ আজকাল সর্বদাই মেঘে ঢাকা, তবু কবিতার কলাপ বিকশিত হয়ে উঠছে না। আপনাদের আকাশের রূপ এখন কেমন? কোন কবির হৃদয় আজ উতলা হয়ে উঠেছে আপনাদের স্বাক্ষে, প্রথম শ্রাবণের কাজল-পিচ্চল (দোহাই তোমার অচিন্ত্য, চুরিটা মাক কোরো) চোখের কটাক্ষে? কার “বান্ধব-প্রিয়া” এল মেঘলা আকাশের আড়াল দিয়ে হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে, গোপন অভিসারে?

এখানে কিন্তু “এ ভরা বাদর, মাহ—ভাদর নয়, শাউন, শূন্ত মন্দির মোর।” কেউ আপনারা পারেন না কি মন্দাক্রান্ত। ছন্দে ছলিয়ে এই শ্রাবণ-আকাশের পথে মেঘদূত পাঠাতে? কিন্তু ভুলে যাবেন না যেন যে আমি যক্ষপ্রিয়া নই।

দূর থেকে এই আত্মদয়িকের নমস্কার গ্রহণ করুন। আর একবার বলি সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের স্মরে—“সংগচ্ছন্সংবধন্সংবো মনাংসি জানতাম্—”

আমারা যে যেখানেই থাকি না, আমরা আত্মদয়িক।”

এই সময়কার প্রেমেনের ভিনখানা চিঠি—ঢাকা থেকে লেখা;

“অচিন,

আজকালকার প্রেমের একটা গল্প শোন।

সে ছিল একটি মেয়ে, কিশোরী—তাহু তার তত্বলতা, চোখের কোণে চকলতাও ছিল, আর তাদের বাড়ির ছিল দোতলা কিংবা তেতলায় একটা ছাদ। অবশ্য লাগাও আর একটা ছাদও ছিল। মেয়েটির নাম অস্তি মিস্ট্রি কিছু ঠাউরে নে—জন্মবার বললে তার স্বার্থুই মই হয়ে যাবে। কৈশোরের স্বপ্ন তার সমস্ত

তত্ত্ববল্লরীকে জড়িয়ে আছে, কুটম্ব হাসনাহানার চাঁদের আলোর মত। সে কাজ করে না, কিছু করে না—শুধু তার পিরাসী আঁধি কোন স্বপ্নে কি স্বপ্নে বেড়ায়। একদিন ঠিক দুপুর বেলা, রোদ চড়চড় করছে অর্থাৎ কত্থের অগ্নিনেত্রের দৃষ্টির তলে পৃথিবী মুচ্ছিত হয়ে আছে—সে ভুল করে তার নীলাধরী শাড়ীখানি শুকোতে দিতে ছাদে উঠেছিল। হঠাৎ তার দূরগত-পথ-চাওয়া আঁখির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ওগো অম্ম-অম্মাস্তরের স্বপ্নদেবতা, তোমার পলকের দৃষ্টিতেই চিনেছি—এইরকম একটা ভাব। স্বপ্নদেবতাও তখন লম্বা চুলের টেড়ি কাটছিলেন, সামনেই দেখলেন তীব্র জ্বালাময় আকাশের নিচে স্নিগ্ধ আবাড়ের পথহারা মেঘের মত কিশোরীটিকে। আঁখির রোদ ঘুরিয়ে ফেললেন তার মুখে তৎক্ষণাৎ। “ওগো আলোকের দূত এলো তোমার স্বপ্ন হতে আমার স্বপ্নে।” মেয়েটি একটু হাসলে যেন দূর মেঘের কোলে একটু শীর্ণ চিকুর খেলে গেল। প্রেম হল। কিন্তু পালা এইখানেই সাক্ষ হল না। আলোকের দূত যাতায়াত করতে লাগল। মোট্রুবাহন লিপিকা তারপর। একদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট স্বপ্নদেবতার স্থল দেহের কপাল নামক অংশবিশেষকে আঘাত করে রক্ত বার করে দিলে ও কালশিরে পড়িয়ে দিলে। স্বপ্নদেবতা লিখলেন, ‘তোমার কাছ থেকে এ দান আমার চরম পুরস্কার। এই কালো দাগ আমার প্রিয়র হাতের স্পর্শ, এ আমার জীবন পথের পাথর। তোমার হাতে যা পাই তাইতেই আমার আনন্দ।’ অবশ্য প্রিয়র হাতের স্পর্শ ও জীবনপথের পাথরের ওপর টিকচর আরোভিন লাগাতে কোনো দোষ নেই। জীবনদেবতা তাই লাগাতেন। এবং বাড়ির লোক কারণ জিজ্ঞাসা করলে একটা অতি কাব্যগন্ধহীন ফুল বিল্লী মিথ্যা বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি, যথা—‘খেলতে গিয়ে হটে আছাড় খেয়েছি।’

ওই পর্বস্ত লিখে নাইতে খেতে গেছলুম। আবার লিখছি। এখানে সাহিত্য অঙ্গতের সঙ্গে বিশেষ বনিষ্ঠতা রাখবার স্বেযোগ নেই। লেখা তো একেবারেই বন্ধ। My Muse is mute কোনকালে আর সে মুখ খুলবে কিনা জানি না। মাথাটার এখন ভারী গোলমাল। মাথা স্থির না হলে ভালো আর্ট বেরোয় না, কিন্তু আমার মাথায় ঘূর্ণি চলেছে। শরীর ভালো নয়। বিনয় আর রমেশের ঠিকানা জানি না, পাঠিয়ে দিস।

ধানিক আগে ক’টা প্রজ্ঞাপতি খেলছিল নিচের বালক-অমিটুকুর ওপর। আমার মনে হল পৃথিবীতে বা সৌন্দর্য প্রতি পলকে আগছে, এ পর্বস্ত বত কবি ভাবার হোলনা হোললে তারা তার সামান্যই ধরতে পেয়েছে—অমৃত-সাগরের

এক অঞ্জলি জল, কেউ বা এক কোঁটা। আমরা সাধারণ মানুষ এই সৌন্দর্যের পাশ দিয়ে চলাচল করি, আর কেউ বা দাঁড়িয়ে এক অঞ্জলি তুলে নেয়। কিন্তু কিছুই হয়নি এখন। হয়ত এমন কাল আসছে যার কাব্যের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা এই মাটির গানই গাইবে, এই সবুজ বাগের এই যেখানো দিনের কিংবা এই বড়ের রাতের—কিন্তু হৃদয়ভর হৃদয় যে পরম ব্যক্তা আমরা ধরতেও পারি নি তারা তাকেই মৃত্ত করবে। আমি তাতে চেষ্টা করছি তখন নারীর ভেতর মানুষ কি খুঁজে পাবে। মানুষ যেহেতু আনন্দ নারীর ভেতর খুঁজতে খুঁজতে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সেদিন যেখানে গিয়ে পৌঁছাবে তার আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আছে সৃষ্টির অন্তরে অনন্ত অবূতের পথ—তার কোথায় আজ আমরা? চাই অবূতের জন্তে তপস্বী। মানুষ ড্রেডনটাই তৈরি করুক আর ওয়ারলেসই চালাক এ শুধু বাইরের—ভেতরের সাধনা তার অবূতের জন্তে।”

“কিন্তু আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না—সত্যি ভালো লাগে না।...বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিধে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ। কিন্তু একদিন বোধহয় পৃথিবীর আনন্দসভায় আমার আসন ছিল—অদ্ভুতের রাজ্যে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশের পানে চাইলে মনে হত, সমস্ত দেহ-মন যেন নক্ষত্রলোকের অভিনন্দন পান করছে—অপরূপ তার ভাষা। বুঝতে পারতুম আমার দেহের মধ্যে অমনি অপূর্ব রহস্য অনন্ত আকাশের ভাষায় সাড়া দিচ্ছে। আজকাল মাঝে মাঝে জোর করেই সেই আসনটুকু অধিকার করতে যাই কিন্তু বুঝাই। ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। আশ্চর্য হয়েই ভাবি এই দেহটার মালমশলা সবই প্রায় তেমনি আছে। জুপিও তেমনি নাচছে, শিরায়ে শিরায়ে রক্ত ছুটছে, ফুগফুগ থেকে নিংড়ে নিংড়ে রক্ত বেরুচ্ছে। খাড়া হয়ে হাঁটি, গলা থেকে তেমনি স্বর বেরোয়। এই সেই দেবতার দেহটা এমন হল কেন? আর সে বাজে না। নিখিল-দেবতার এই যে দেহ সে নিখিল-দেবতাকেই এমন করে ব্যঙ্গ করে কেন?...এখানে ধারা-প্রাণ কিন্তু প্রাণপন-গহন মোহে কাকর গোপন চরণ-ফেলা টের পাই না। বুঝিতে দেশ ভেসে গেল কিন্তু আমার প্রাণে তার দৃষ্টি পড়ল না। কেবল তখনো তুমুল মাটি—নিশ্চয় নির্জীব। বর্ষাক

নৃত্যলভায় গান শোনবার জন্তে দেখছি মাটি পাথর বক খুঁড়ে কোণে-কোণে
 আনাচে-কানাচে পৃথিবীর স্থানে-অস্থানে নব নব প্রাণ মাথা তুলে উঠি মারছে,
 কিন্তু আমার জীবনের নবায়নের ঢাকিয়ে মরে আছে। আমার মাটি লরস হক
 না। সেদিন রাত্রে প্রাণের সারঙে একটা স্বপ্ন বাজছিল, স্বপ্নটা আমার
 বহুদিনকার পরিচিত। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম, আশা হচ্ছিল
 হয়তো পুরোনো বর্ষারাজির আনন্দকে ফিরে পাব। কিন্তু হায়, বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি,
 অন্ধকার আকাশ—শুধু অন্ধকার আকাশ। এই বৃষ্টি পড়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি,
 অনুভব করতে পারি ইন্দ্রিয় দিয়ে; কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি না।
 তাই মেঘের জল শুধু স্বপ্নে লাগল, আমার জ্বর সাড়া দিলে না।

সত্যি নিজেকে আর চিনতে পারি না। তোদের যে প্রেমে নবু ছিল
 তাকে আমার মধ্যে খুঁজে খুঁজে পাই না। মনে হয় গাছের যে ডালপালা
 একদিন ছুঁহা মেলি আকাশ আর আলোর জন্তে তপস্তা করত, যার লোভ ছিল
 আকাশের নক্ষত্র, সে ডালপালা আজ যেন কে কেটেছোট ছায়ায় করে দিয়েছে।
 শুধু অন্ধকার। মাটির জীবন্ত গাছের মূলগুলো হাতড়ে-হাতড়ে অন্বেষণ করছে
 শুধু খাবার, মাটি আর কাঁদা, শুধু বেঁচে থাকা—কৈচোর মত বেঁচে থাকা। এ
 প্রেমে তোদের বন্ধ ছিল না বোধহয়।

বাতি নিবে গেছে। জ্বরের বিবাক্তবাতাসে সে কতক্ষণ বাঁচতে পারে?
 'বে প্রদীপ আলো দেয় তাহে কেল হাস।'

মাহুকের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিক
 পাশব ক্ষুধা—হিংসা, বিব, আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতরন দিয়ে শুধু দেখতে
 পাই হুলস্থল মাহুকের অন্তরে আদিক পশু ওং পেতে আছে। যে চোখ দিয়ে
 মাহুকের মাঝে দেবতাকে দেখতুম সেটা আজ অন্ধপ্রায়। আমার যেন আজকাল
 ধারণা হয়েছে এই যে, লোকে বন্ধুকে ভালবাসে এটা নেহাৎ মিথ্যা—মাহুক
 নিজেকেই ভালবাসে। যে বন্ধুর কাছে অর্থাৎ যে মাহুকের কাছে সেই নিজেকে
 ভালবাসার অহংকারটা চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ যার কাছ থেকে সে নিজের
 আত্মসন্তোষের খোরাক পায় তাকেই সে ভালবাসে মনে করে। স্বপ্নের মাহুকে
 শুধু নিজেকে, শুধু নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে অহংকার চরিতার্থ করতে
 চায়। বন্ধু হচ্ছে মাত্র সেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবার আশি। ওই জন্তেই তাকে
 ভালবাসা। যে আশি থেকে নিজেকে সব চেয়ে ভাল দেখায় তাকেই বন্ধু
 'সব চেয়ে বড় বন্ধু। বন্ধুর জন্তে বন্ধুকে মাহুক ভালবাসে না—ওটা মিথ্যা।

কথা—সাহস নিজের জন্তে বন্ধকে ভালবাসে। ‘তু খু বার্থ, তু খু বার্থ।’ তাই নয় কি ?

আচ্ছা অচিন্ত্য, পড়েছিল তো, ‘এতদিনে জানলেম যে কীভাবে কীভাবে সে কাহার জন্ত ?’ পেরেছিল কি জানতে ? সে কি শ্রিয়া ? সে শ্রিয়াকে শাব কি ঘেরেবাহবের মধ্যে ? কিন্তু কই ? যার জন্তে জীবনভরা এই বিরাট ব্যাকুলতা সে কি ওইটুকু ? দিনরাত্রি আকাশ-পৃথিবী ছাড়িয়ে গেল যার বিরহের কান্নায় সে কি ওই চপল স্ত্রী কুখার ভরা প্রাণীটা ? যাকে নিঃশেষ করে জীবন বিনিময়ে দিতে চাই, যার জন্তে এই জীবনের সুখ-বেদনা-দুঃখ-ভয়-সকল পথ বেয়ে চলেছি, সে শ্রিয়াকে নারীর ভেতর পাই কই তাই ! কার জন্তে কান্না জানি না বটে, কিন্তু কেন তা তো জানি—এ কথা তো জানি যে এটা দিতে চাওয়ার অশ্রান্ত কান্না। দেব, দেব—স্বপ্নের স্তন যেমন দেবার কান্নায় ব্যাথাভরা আমন্দে টলমল করে ওঠে, আমাদের সমস্ত জীবন যে তেমনি ব্যাথার কাঁপছে। কিন্তু কে নেবে তাই ? কে নেবে তাই নিঃশেষ করে আমাদের, শিশির প্রভাতের আকাশের মত নিঃশব্দ, রিক্ত শূন্য করে, বাশির বেধুর মত নিঃশব্দ করে—কে সে অচিন ?”

“কি কথা বলতে চাই বলতে পারছি না। বুকের ভেতর কি কথার ভিড় বন্ধ ঘরে যুগনাতির তীব্র দ্বাপের মত নিবিড় হয়ে উঠেছে, তবু বলতে পারছি না। কত রকমের কত কথা—তার না পাই খেই না পাই ফাঁক। হাম্মাহানার বন্ধ কুঁড়ির মত টনটন করছে সমস্ত প্রাণ—কিন্তু পারছি না বলতে। কাল থেকে কতবার ছন্দে ছুলিয়ে দিতে চাইলুম, পারলুম না। ছন্দ ঘোলে না আর। বোবা বাশি যেন আমি, ব্যাকুল স্ত্রীর নিখাস শুধু দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—বাক্যতে পারছি না। কত কথা তাই—যদি বলতে পারতুম।

গলসওয়ার্দির Apple Tree পড়ছিলাম—না, পড়ে কলেছি আজ দুপুরে। সেই না-জানা আপেল-রক্তারীত সুবাস বুঝি এমন উদাস করেছে। তুই যেখানে পাস খুঁজে গলসওয়ার্দির Apple Tree গল্পটা পড়িস। Pan ছাড়া এ রকম Love story পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।

না, শুধু Apple Tree নয় তাই, এই নতুন শব্দ আমার মনে কি যেন এক নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। . মরতে চাই না, কিন্তু মরতে আর ভয়ও পাই না বোধ হয়। যে একদিন অস্বাচিত জীবন দিয়েছিল সেই আবার কেড়ে নেবে তাতে আর ভয় কিসের তাই। তবে একটু সকাল-সকাল এই বা। তাতে দুঃখ

আছে, তবুও কিছু দেখি না। আর পর্বত তো জাই কোটি-কোটি বাহুব এমনি করে চলে গেছে—এমনি করে নীল আকাশ, শিউলি মেঘ, সবুজ ঘাস, বহুব ভালবাসা ছেড়ে—নিফল প্রতিবাহে। তবে—এ জীবন কেন পেরেছিলার তা যখন জানি না, জানি না যখন কোন পুণ্যে, তখন হারাবার সময় কৈকিছুং চাইবার কি অধিকার আছে তাই? খোঁড়া হয়ে জন্মাই নি, অন্ধ হয়ে জন্মাই নি, বিকৃত হয়ে জন্মাই নি—যার কোল পেলাম, বহুব বুক পেলাম, নারীর হৃদয় পেলাম, তা যতটুকু কালের জন্মেই হোক না—আকাশ দেখেছি, সাগরের সংগীত শুনেছি, আমার চোখের সামনে ক্ষুর মিছিল গেছে বার বার, অন্ধকারে তারা ফুটেছে, ঝড় হেঁকে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে, চিকুর খেলেছে—কত লীলা, কত রহস্য, কত বিস্ময়! তবে জীবনধেবতাকে কেন না প্রণাম করব তাই! কেন না বলব যত আবি—নমো নমো হে জীবনধেবতা!

যা পেরেছি তার মান কি রাখতে পেরেছি তাই? কত অবহেলা কত অপচয় কত অপমান না করলুম। এখনো হয়তো করছি! তাই তো কেড়ে নেবে বলে জোর করে তাকে তৎসনা করতে পারি না। জানি তুলনা করে তাকে ঘোষ দিয়েছি কতবার, কিন্তু কি সে বে তুল তাই—তার খুশির মান তাতে আমার কি বলবার আছে? কাকুর গলার হয়তো সে বেশি গান মিলে, কাউকে প্রাণ বেশি, কাউকে সে সাজিয়ে পাঠালে, কাউকে না—আমারও তো সে রিক্ত করে পাঠায় নি।

তাই ভাবি যখন ঘাব তখন ভর কেন? এখনও শিরায় জোরার ভাঁটা চলছে, স্নায়ুতে লাড়া আছে, তবে চোখ বুজে মাথা গুঁজে পড়ব কেন? যেমন অজান্তে এসেছিলার তেরনি অজান্তে চলে যাব—হয়ত শুধু একটু ব্যথা একটু অন্ধকার একটু যন্ত্রণা। তা হোক। এখন এই নীলাত নিখর রাজি, এই কোবল জ্যোৎস্না, তন্মালস পৃথিবীর গুহম—সবস্ত প্রাণ দিয়ে পান করি না কেন—এই বাতাসের কীণ শীতল ছোঁয়া—এই সব।

এমনি হৃদয় শরতের প্রভাতে নিফল নিশিরের মত না একদিন এসেছিলার অপরাধ এই নিখিলে। কত বিস্ময় সে সাজিয়েছে, কত আরোহণ কত প্রাচীর। কত আনন্দই না দেখলাম। হ্যাঁ, দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি বটে কর্ণভা। যার চোখের জল দেখেছি, গলিত হুঁট দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের তীকতা, লালসার অন্ধ বীভৎসতা, নারীর ব্যতিচার, বাহুবের হিংসা, কহাকার অহংকার, উন্মাদ, বিকলাক, কথ—গলিত সব। তবু—। তবু তুলনা হয় না বুঝি!

এই যে আপনার এতগুলো প্রশ্ন নিয়ে একটা অল্প শক্তি নির্ব্ব খেলাটা খেললে—এ দেখেও, আমার যখন শান্ত সন্ধ্যা আপনা নদীর গুণ্য দিয়ে বহর না-
 যানি যেতে দেখি যথের রক্ত পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোল পর্ব্বত তরুণ
 নির্ভয়ে ঘালের রক্তি এগিয়ে এসেছে, হৃণুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে
 শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয় না আমার মত না নিয়ে আমার এই
 কুখ্যতরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।

একটা ছোট্ট, অতি ছোট্ট পোকা—একটা পাইকা অক্ষরের চেয়ে বড় হবে
 না—আমার বইয়ের পাতার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে পাখা ছুঁটি ছড়িয়ে—কি,
 আশ্চর্য নয়? এইবারের পৃথিবীতে এই জীবনের পরিচিতদের মধ্যে ও-ও
 একজন! ওকেও যেতে হবে। আমাকেও।

কিন্তু এমন অপক্লপ জীবন কেনই বা সে দেয়, কেনই বা কেড়ে নেয় কিছু
 বুঝতে পারি না—শুধু এইটুকুই বিরাট সংশয় রয়ে গেল। যদি এমন নিশেষ
 করে নিশ্চিহ্ন করে মুছেই দেবে তবে এমন অপক্লপ করে বিশ্বস্তেরও অতীত করে
 দিলে কেন? কেন কে বলতে পারে? এত আশা এত বিশ্বাস এত সৌন্দর্য—
 আমার জগতের চিহ্ন পর্ব্বত থাকবে না—কোনো অনাগত কালের তৃণের রস
 জোগাবে হরত আমার দেহের মাটি—অনাগত মানুষের নীলাকাশতলে তাদের
 রোজে তাদের বাতাসে তাদের ঝড়ে তাদের বর্ষায় থাকবে ধুলো হয়ে বাষ্প হয়ে।

প্রীতি-বিনিময় তোর সাথে আমার, ছদ্মবনের জীবনবৃক্ষের সঙ্গে ছদ্মবনের
 জীবনবৃক্ষের। তবু জয়তু জীবন জয়, জয় জয় হাটি—”

কুন্তি করে সারা গারে মাথার ধুলো মাটি মাখা—কাপড়ের খুঁটটা শুধু গায়ের
 উপর মেলে দেওয়া—সকালবেলা ভবানীপুরের নির্জন রাস্তা ধরে বাণেশ আড়বাশি
 বাজিরে ঘুরে বেড়াত কে একজন। কোন নিপুণ ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি তার শরীর,
 সরল, স্থাণ, স্থতস্থ। বলশালিতা ও লাবণ্যের আশ্চর্য সমন্বয়। সে দেবীপ্রসাদ
 রায়চৌধুরী। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হবে, যৌবনের
 প্রায়ভেই তার নিজের দেহে তার নিতুল আভাস এনেছে। ব্যায়ামে বল-সাধনে
 নিজের দেহকে নির্মাণ করেছে গঠনগৌরবদৃষ্ট, সর্বসঙ্গত করে।

ইন্সুলে যে-বছর প্রেনেক গিয়ে ধবি সেই বছরই দেবীপ্রসাদ বেরিয়ে গেছে
 চৌকাট ডিড়িয়ে। কিন্তু ভবানীপুরের রাস্তায় ধরতে তাকে দেখি হল না।
 শঙ্কুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট ও চৌরঙ্গীর মোড়ের জায়গাটাতে তখন একটা একজিবিশন

হচ্ছে। আরগ্যটার হাতখনো নাম পোড়াবাজার। নামের সঙ্গেই একজিবিশনটা শেব পর্বত পুড়ে গিয়েছিল কিনা কে বলবে। একদিন সেই একজিবিশনে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা—একটি হুবেশ ছন্দর ভক্তলোকের সঙ্গে কথা কইছে। ভক্তলোক চলে গেলে জিগগেস করলাম, কে ইনি? দেবীপ্রসাদ বললে, মণীন্দ্রলাল বসু।

এই সেই? ভিড়ের মধ্যে ভক্ত-ভক্ত করে ছুঁজতে লাগলাম। কোথাও দেখা পেলাম না। এর কত বছর পর মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা। “কল্লোল” যখন খুব জমজমাট তখন তিনি ইউরোপে। তারপর “কল্লোল” বার হবার বছর পাঁচেক পরে “বিচিত্রা”র যখন সাব-এডিটরি করি তখন ভিয়েনা থেকে লেখা তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর প্রক দেখেছি।

“আত্মদায়িক” উঠে গেল। তার সব চেয়ে বড় কারণ হাতের কাছে “কল্লোল” পেন্দে গেলাম। বা চেয়েছিলাম হয়তো, তৈরি কাগজ আর জমকালো আড্ডা। সে সব কথা পরে আসছে।

একদিন ছুঁজনে, আমি আর প্রেমন, সকালবেলা হরিশ মুখার্জি রোড ধরে বাচ্ছি, দেখি কয়েক রশি সামনে গোকুল নাগ যাচ্ছে, সঙ্গে ছন্দ ভক্তলোক। লম্বা চুল ও হাতে লাঠি গোকুল চিনতে দেরি হয় না কখনো।

বললাম, ‘ঐ গোকুল নাগ। ভাকি।’

‘না, না, দরকার দেই।’ প্রেমন বারণ করতে লাগল।

কে ধার ধারে ভক্ততার! “গোকুলবাবু” “গোকুলবাবু” বলে রাস্তার মাঝেই উচ্চসরে ডেকে উঠলাম। কিবল গোকুল আর তার দুই সঙ্গী।

প্রেমেনের তখন দুটি গল্প বেরিয়ে গেছে “প্রবাসী”তে—“শুধু কেরাগী” আর “শোপনচারিণী”। আর, সেই গল্প দুটি বাংলা সাহিত্যের গুমোটে সজীব বসন্তের হাওয়া এনে দিয়েছে। এক গল্পেই প্রেমনকে তখন একবাক্যে চিনে ফেলার মত।

পরম্পরের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু গোকুলের সঙ্গে ঐ ছন্দ হুচলদর্শন ভক্তলোক কে?

একজন ধীরাজ ভট্টাচার্য।

আরেকজন?

ইনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সানন্দবিশ্বের তাকালার ভক্তলোকের দিকে। বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই করলাকুটির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? বাংলা

সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন জাতি নতুন ভাষা এসেছেন ? বাস্তব দাঁতের
 মিনারিকুল ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন বুলিয়ান যুক্তিকার লম্বকলে ?

বিষয় মরতায় চোখের দৃষ্টিটা কোয়ল। তখনো শৈলজা 'আমক' হয়নি,
 কিন্তু আবারের বেধে তার চোখ আনন্দে জলে ঊঠল। যেন এই প্রথম আলাপ
 হল না, আবার যেন কতকালের পবিত্রিত বন্ধু।

‘কোথায় বাজেন ?’ জিগসেস করলার গোকুলকে।

‘এই রূপনন্দন না বসনন্দন মুখার্জী লেন। মুরলীবাবু বাড়ি। মুরলীবাবু
 মানে ‘সংহতি’ পত্রিকার মুরলীধর বহু।’

মনে আছে বাড়িতে মুরলীবাবু নেই—কি করা—গোকুলের লাঠির ডগা দিয়ে
 বাড়ির সামনের কার কাঁচা মাটিতে সবাই নিজের-নিজের সংক্ষিপ্ত নাম লিখে
 এল। মনে আছে গোকুল লিখেছিল G. C.—তার নামের ইংরিজি
 আড্ডাকর। সেই নজিরে বীণেশ্বরজনও ছিলেন D. R.। কিন্তু গোকুলকে
 সবাই গোকুলই বলত, G. C. নয় অথচ বীণেশ্বরজনকে সবাই ডাকত, D. R.।
 এ শুধু নামের ইংরিজি আড্ডাকর নয়, এ একটি সম্পূর্ণ অর্থাবহিত শব্দ। এর মানে
 সকলের প্রিয়, সকলের স্নেহ, সকলের আত্মীয় বীণেশ্বরজন।

চার

কাঁচা মাটিতে নামের দাগ কতক্ষণ বেঁচে থাকবে ?

গোকুলের পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বেরল। কিন্তু তার পৃষ্ঠে লগাটে
 নিজের নাম লিখি কি দিয়ে ? কলম ? কাকরই কলম নেই ! পেন্সিল ?
 দাঁড়াও, বাড়ির ভিতর থেকে জোগাড় করছি একটা।

পেন্সিল দিয়ে সবাই সেই ভিজিটিং কার্ডের গায়ে নিজের-নিজের নাম লিখে
 দিল। সেই ভিজিটিং কার্ডটি মুরলীধর কাছে এখনো নিটুট আছে।

মুরলীধর বহু ভবানীপুর যিৎ ইনস্টিটিউশনের একজন সাহাযিদে সাধারণ
 ইকুল মাস্টার। নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিয়গত। এরমিতে উচ্চকিত-
 উৎসাহিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কাছে এসে একটা মহৎ ঔপলব্ধির আবাদ
 পেলাম। অদম্য কব্ব বা উত্তম চিন্তার শুধু নয়—আছে সুদূরবিলাসী বন্ধু।
 বীণেশ্বরজনের মত মুরলীধরও অগ্নবর্ষ। তাই একজন D. R. আরেকজন মুরলীধর।

একদিকে “কল্লোল”, আরেক দিকে “সংহতি”।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, দুটি মাসিক পত্রই একই বছরে একই মাসে এক সঙ্গে জন্ম নিয়েছে। ১৩৩০, বৈশাখ। “কল্লোল” চলে প্রায় সাত বছর, আর “সংহতি” উঠে যায় দু’বছর না পূরতেই।

“কল্লোল” বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ভত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাঁধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, হৃবির সমাজের পটভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। কিন্তু “সংহতি” কি? সংহতি তো শিলীভূত শক্তি। সংঘ, সমূহ, গণগোষ্ঠী। যে গুণের জন্তে সমগ্রী পরমাণুসমূহ জমাট বাঁধে, তাই তো সংহতি। আশ্চর্য নাম। আশ্চর্য সেই নামের তাৎপর্য।

একদিকে বেগ, আরেক দিকে বল। একদিকে ভাঙন, আরেক দিকে সংগঠন, একীকরণ।

আজকের দিনে অনেকেই হয়তো জানেন না, সেই “সংহতি”ই বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথমতম মূখপত্র, প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। সেই কীণকার স্বল্পায়ু কাগজটিই গণকল্পবাজার প্রথম মশালদার। “লাভল”, “গণবাণী” ও “গণশক্তি”—এরা এসেছিল অনেক পরে। “সংহতি”ই অগ্রদূত।

এই কাগজের পিছনে এমন একজনের পটভূমিকা ছিল যার নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তিনি জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আসলে তিনি এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা। অমৃতবাজার পত্রিকার ছাপাখানার কাজ করেন। ঢোকেন ছেলেবয়সে, বেরিয়ে আসেন পঞ্চাশ না পেরোতেই, অরাজক্যের মেহ নিয়ে। দীর্ঘকাল বিযাক্ত চাইপ আর কদম্ব কালি ঘেঁটে ঘেঁটে কঠিন ব্যাধির কবলে পড়েন। কিন্তু তাতেও হাল পড়েনি তাঁর উত্তম-উৎসাহে, মুছে যায়নি তাঁর ভাবীকালের স্বপ্নদৃষ্টি।

একদিন চলে আসেন বিপিন পালের বাড়িতে। তাঁর ছেলে জানাঞ্জন পালের সঙ্গে পরিচয়ের হতো ধরে।

বিপিন পাল বললেন, ‘কি চাই?’

‘শ্রমজীবীদের জন্তে বাংলার একটা মাসিক পত্র বের করতে চাই।’

এমন প্রস্তাব শুনেই বিপিনচন্দ্র যেন প্রত্যাহা করেন নি। তিনি যেতে উঠলেন। এর কিছুকাল আগে থেকেই তিনি ধনিক-শ্রমিক সমতা নিয়ে লেখা আর বলা শুরু করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ-এর ম্যানিফেস্টোর (পৃথিবীর অন্তান্ত মনীষীদের সঙ্গে ববীজনাথ ও রোঁলান্ড দত্তখৎ আছে) ব্যাখ্যা করেছেন

তার “World Situation and Ourselves” বক্তৃতায়; ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখেছেন রাষ্ট্রের বাঁচার অধিকার—“Right to Live” নিয়ে। তিনি বলে উঠলেন : ‘নিশ্চয়ই। এই দণ্ডে বের করুন, আর কাগজের নাম দিন “সংহতি”।’

কিন্তু কাগজ কি চলবে ?

কেন চলবে না ? জিভেনবাবু কলকাতার প্রেস-কর্মচারী সমিতির উদ্যোক্তা, সেই সম্পর্কে তাঁর সহকর্মী আর সহ-সম্পাদক তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, কাগজ বের হওয়া মাত্রই বেশ কিছু গ্রাহক আর বিজ্ঞাপন জুটিয়ে আনবে। সকলে মিলে রথের রশিতে টান দেব, ঠিক চলে যাবে।

কিন্তু সম্পাদক হবে কে ?

সম্পাদক হবে জানাঞ্জন পাল আর তার বন্ধু মুরলীধর বসু।

আর আফিস ?

‘আফিস হবে ১ নম্বর শ্রীকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার।’ কুণ্ঠিত মুখে হাসলেন জিভেনবাবু।

‘সেটা কি ?’

‘সেটা আমারই বাসা। একতলার দেড়খানা ঘরের একখানি।’

সেই একতলার দেড়খানা ঘরের একখানিতে “সংহতি”র আফিস বসল। স্বক্ৰিয়তা গলি বাস্তার দিকে উত্তরমুখে লম্বাটে বয়। আলো-বাতাসের স্বচ্ছন্দ নেই। একপাশে একটি ভাঙা আলমারি, আরেক পাশে একখানি ছাড়া তক্তাপোশ। টেবিল চেয়ার তো দূরের কথা, তক্তাপোশের উপর একখানা মাদুর পুঙ্খ নেই। শুধু কি দরিদ্রতা ? সেই সঙ্গে আছে কালান্তক ব্যাধি। তার উপর সন্তান হারিয়েছেন। তবু পিছু হটবার লোক নন জিভেনবাবু। ঐ ছাড়া তক্তাপোশের উপর রাজে ছেলেকে নিয়ে শোন, আর দিনের বেলা কাশি ও হাঁপানির ফাঁকে “সংহতি”র স্বপ্ন দেখেন।

সম্পাদকের সঙ্গে রোজ তাঁর দেখাও হয় না। তাঁরা লেখার জোটপাট করেন ভবানীপুরে বসে, প্রুফ দেখেন ছাপাখানায় গিয়ে। কিন্তু ছুটির দিন অফিসে এসে হাজিরা দেন। সেদিন জিভেনবাবু অসুস্থ করেন তাঁর রথের রশিতে টান আছে। মূঠো থেকে থমে পড়েনি আলগা হয়ে। অস্বাস্থ্যকে অস্বীকার করেই আনন্দে ও আতিথেয়তায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন। আসে চা, আসে পরোটা, আসে জলখাবার। আপত্তি শোনবার লোক নন জিভেনবাবু।

‘কাগজ তো বেরলো, কিন্তু লেখক কই ?’

প্রথম সংখ্যার প্রথমই কারিনী দায়ের কবিতা—“নিজিত দেবতা জাগো।” সেই সঙ্গে বিপিন পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। জানাঞ্জন লিখলেন “সংহতি”র আদর্শ নিয়ে। তারই ছাপানো নকল আঙুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল ব্রজেন শীল আর রবীন্দ্রনাথকে। আচার্য ব্রজেননাথ টেলিগ্রামে আশীর্বাণী পাঠালেন, তার বাংলা অহুবাধ ছাপা হলো পত্রিকার প্রচ্ছদে। আর রবীন্দ্রনাথ? এক পরমার্শ্ব সঙ্ঘ্যার পরম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর এক অপূর্ব প্রবন্ধ এসে পৌঁছল। সেই প্রবন্ধ ছাপা হল জ্যেষ্ঠের সংখ্যাতে।

কিন্তু তারপর? গল্প কই?

বাংলাসাহিত্যের বীণায় যে নতুন তার বোজন করা হল সে স্বরের লেখক কই? সে অতুভূতির স্বর কই? কই সেই ভাবের সূত্রধর?

বিপিনচন্দ্র বললেন, ‘নারান ভট্টাচার্যকে লেখ। টাকা চায় ডি-পি করে যেন পাঠায়।’

নারায়ণ ভট্টাচার্য গল্প পাঠালেন, “দিন মজুর”।

একবার শরৎচন্দ্রের কাছে গেলে হয় না? শোষিত মানবতার নামে কিছু খুঁটুড়া মিলবে না তাঁর কাছে?

কে জানে! তবু দুই বছর জানাঞ্জন আর মৃণালীধর একদিন রওনা হলেন শিবপুরের দিকে।

বাড়ির মধ্যে আর ঢুকতে পাননি। শরৎচন্দ্রের কুহুর ভেলির তাড়া খেয়েই ছোরগোড়া থেকে কিয়ে এলেন দুই বছর।

এমন সময় শৈলজার লেখা গল্প “করলাকুঠি” নজরে পড়ল।

কে এই নবাগত? মাটির উপরকার শোভনশ্রামল আন্তর্য্য ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখান থেকে করলার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?

ঠিকানা জানা হল—রূপসীপুর, জেলা বীরভূম। চিঠি পাঠানো হল গল্প চেয়ে। শৈলজা তার সুক্তোর অক্ষর সাজিয়ে লিখে পাঠাল গল্প। নাম “ধুনিয়ারা”।

এ গল্প “সংহতি”র তারে ঠিক স্থর তুলল না। মৃণালীধর শৈলজার সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে লাগলেন।

শৈলজা লিখে পাঠাল: ‘নতুন উপস্থানে হাত দিয়েছি। কারখানার সিটি বেজেছে আর আমার আখ্যানও শুরু হল।’

মুরলীধর জবাব দিলেন : ‘ছুটির নিষ্টি বাতাব্যর আগেই লেখাটা পাঠিয়ে
দিন । সন্তত প্রথম কিষ্টি । পত্রপাঠ ?’

“নাফালী আইরা” নাম বিয়ে শৈলজার সেই উপস্তান বেহতে লাগল,
“সংহতি”তে ; পরে লেটা “স্বাষ্টির ধর” নামে পুস্তকাকৃত হয়েছো ।

শৈলজা তো হল । তারপর ? আর কোনো লেখক নেই ? বুজের আর
কোনো পুরোছা ?

“তধু কেরানী” আর “গোপনচাষ্টিগী” তখন প্রেমেনকে অতিস্বাষ্টিয় চিষ্টিত
করেছো । মুরলীধর তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন । বীরেন্দ্র গকোপাধ্যায়
নামে কলেজের এক ছাত্র (বর্তমান িল্লীতে অধ্যাপক) “সংহতি”র দলের
লোক । ইতুলে আমা্দের তিনি অগ্রজ, চিনতেন প্রেমেনকে । বললেন, ‘আরে
প্রেমেন তো এ পাড়ারই বাসিন্দে, কোথায় খুঁজছেন তাকে ঝকঃখলে ? আর এ
তধু হাতের কাছের লোক নয়, তার লেখাও মনের কাছেকার । সস্ত্রতি সে
বস্তিজীবন নিয়ে উপস্তান লিখে—নাম “পাক” ।’

মুরলীধর লাঙ্কিয়ে উঠলেন । কোথায় ধরা যায় প্রেমেনকে ?

এদিকে মুরলীধর প্রেমেনকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর প্রেমেন তাঁর বাড়ির
ধরজা থেকে নিরাশ মুখে ফিরে যাচ্ছে ।

কিস্ত ফিরবে কোথায় ? গোকুল আর ধীরাজ চলে গেল যে ঝার দিকে, কিস্ত
আমা্দের তিনজনের পথ যেন সেদিন আর শেষ হতে চায় না । একবার
শৈলজার মেল পাখারীপাড়া রোড, পরে প্রেমেনের মেল গোবিন্দ ঘোষাল লেন,
শেষে আমার বাসা বেলতলা রোড—বারে-বারে ঘোরাকিরা করতে লাগলাম ।
বেন এক দেশ থেকে তিন পথিক একই ভীর্থে এসে মিলেছি ।

বিকলে আবার দেখা । বিকলে আর আমরা “আপনি” নেই, “তুমি”
হয়ে গিয়েছি । শৈলজা তার গল্প বলা শুরু করল :

‘আমার আসল নাম কি জানো ? আসল নাম শ্রায়লানন্দ । ডাক-নাম শৈল ।
কুলে সবাই ডাকড শৈল বলে । সেই থেকে কি করে যে শৈলজা হয়ে গেলাম—’
প্রায় নীহারিকার অবস্থা !

‘বাড়ি রূপলীপুর, জয়স্থান অঞ্চাল মামাবাড়ি, আর—বিয়ে করেছি ইকড়া—
বীরভূম জেলায়—’

বিয়ে করেছ এরি মধ্যে ? কত বয়স ? এই তেইশ-চব্বিশ । জগেছি
১৩০৭ লালে । তোমা্দের চেয়ে তিন চার বছরের বড় ছব ।

‘বারা ধরকীয়ে দুখোপাখ্যার। লাগ বরেন, ব্যাজিক দেখান—’

তাকালার শৈলজার হাতের দিকে। তাইতেই তার হাতের এই ওস্তাদি।
এই ইন্তজাল।

‘বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না জীবনে। বাকে হারিয়েছি যখন তিন বছর বয়স। বড় হয়েছি বারার বাড়িতে। দাদামশায় আমার মত লোক। জীবয়েল বারলাহেব।’

তার নাতির এই দীনদশা! আছে এই একটা খুখুরো ভাতা মেসে! হাটতে-চলতে মনে হয় এই বুকি পড়ল হড়মড় করে। দোতলা বাড়ি, পূব পশ্চিমে লখা, দোতলার স্তম্ভের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া এককালি বারান্দা, প্রায় পড়ো-পড়ো, জায়গায়-জায়গায় রেলিং আলগা হয়ে বুলে পড়েছে। উপরতলার বেল, নিচে লাড়ে বজ্রিশ ভাজার বাসিন্দে। হিন্দুহানী ধোপা, করলা-কাঠের জিপো, বেগুনি-কুলুরির দোকান, চীনেবাদামগুয়লা কুলপিবরক-গুয়লার আস্তানা। বিচিঞ্জ রাজ্য। সংহতির সংকেত!

‘দাদামশায় তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। “বীশরীতে” গল্প লিখেছিলাম “আত্মবাতীর ডায়রী” বলে। গল্প কি কখনো আত্মকাহিনী হতে পারে? তবু ভুল বুঝলেন দাদামশায়, বললেন, পথ দেখ।’

মেসের সেই বরের চারপাশে তাকালাম আশ্চর্য হয়ে। শৈলজার মত আরো অনেকে মেসের উপর বিছানা মেলে বসেছে। চারদ্বারে জিনিসপত্রের হাবজা-গোবজা। কার বা ঠিক শিরবে দেয়ালে-বঁধা পেরেকের উপর জুতো ঝোলানো। পাশ-বালিশের জায়গায় বাস-প্যাটর। পোড়াবিড়ির জগন্নাথকেন্দ্র। দেখলেই মনে হয় কতগুলি যাজী ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্যাটকর্মে বসে আছে। কোথাকার যাজী? “সংসপথের যাজী এরা।”

নিজেরা যদিও অভাবে তলিয়ে আছি, তবু শৈলজার দুঃস্বতায় মন নড়ে উঠল। কী উপায় আছে, সাহায্য করতে পারি বন্ধুকে?

বললাম, ‘কি করে তবে চালাবে? লম্বল কি তোমার?’

‘লম্বল?’ শৈলজা হাসল: ‘লম্বলের মধ্যে লেখনী, অপার সহিষ্ণুতা আর ভগবানে বিশ্বাস।’

তারপর গলা নামাল: ‘আর দ্বীপ কিছু অলংকার, আর “হাসি” আর “লক্ষী” নামে দু’খানা উপভাস বিক্রির তুচ্ছ ক’টা টাকা।’

‘কিন্তু “কল্লোলে” এলে কি করে?’

‘‘কল্লোলে’’ আসব না?’ শৈলজার দৃষ্টি উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল :
 ‘‘কল্লোলে’’ না এসে পারি? আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে শুদ্ধ হয়ে,
 সবায়ের ভাবাই ঐ-‘‘কল্লোল’’। সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল।
 বিধাতার আশীর্বাদে তাই সবাই একত্র হয়েছি। মিলেছি এক মানসতীর্থে।
 শুধু আমরা ক’জন নয়, আরো অনেক তীর্থঙ্কর।’’

শোনো, কেমন করে এলাম। হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রশ্ন করল শৈলজা :
 ‘‘পবিত্রকে চেন? পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়?’’

‘‘চিনি না, আলাপ নেই। অহংবাদ করেন, দেখেছি মাসিকপত্রে।’’

চিনবে শিগগির। বিশ্বজনের বন্ধু এই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বৃদ্ধো হোক,
 কচি হোক, বনেদী হোক, নির্বনেদ হোক, সকল সাহিত্যিকের সে স্বজন-বান্ধব।
 শুধু মনে মনে নয়, পরিচয়ের অন্তরঙ্গ নিবিড়তার। শুধু উপর-উপর মুখ চেনাচেনি
 নয়, একেবারে হাঁড়ির ভিতরের খবর নিয়ে সে হাঁড়ির মুখের সর হাসি হয়ে বসবে।
 একেবারে ভিতরের লোক, আপনার জন। বিশ্বাসে অনড়, বন্ধুত্বের নির্ভেজাল।
 এদল-ওদল নেই, সব দলেই সহান মান। পূর্ববঙ্গে বর্ষার সময় পথ-ঘাট খেত-
 ঝাঠ উঠান-আড়িনা সব ডুবে যায়, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে বেতে হলে নৌকো
 লাগে। পবিত্র হচ্ছে সেই নৌকো। নানারকম ব্যবধানে সাহিত্যিকরা যখন
 বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এক সাহিত্যিকের ঘর থেকে আরেক সাহিত্যিকের ঘরে
 একমাত্র এই একজনই অবোধে বাওয়া-আসা করতে পারে। এই একজনই সকল
 বন্ধুত্বের সদাগর!

আসল কথা কি জানো? লেশমাত্র অভিমান নেই, অহংকার নেই। নিষ্ঠুর
 দারিদ্র্যে নিম্বেষিত হয়ে যাচ্ছে, তবু সব সময়ে পাবে নির্বারিত হাসি। আর,
 এমন মজার, ওর হাত-পা চোখ-মুখ সব আছে, কিন্তু ওর বয়েস নেই। ভগবান
 ওকে বয়েস দেননি। দিন যায়, মাহু বড় হয়, কিন্তু পবিত্র যে-পবিত্র সেই
 পবিত্র। নটনড়নচড়ন। আজ যেমন ওকে দেখছি, পঁচিশ বছর পরেও ওকে
 তেমনি দেখব। অন্তরে কী সম্পদ, কী স্বাস্থ্য থাকলে এই বয়সের তার তুচ্ছ
 করা যায় ভেবে দেখো।

‘‘নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।’’

‘‘রহস্যের মধ্যে আমার যেমন বিড়ি ওর তেমনি খইনি। আর তো কিছুই
 দেখতে পাচ্ছি না।’’

সবাই হেসে উঠলাম।

সেই পবিত্র “প্রবাসীতে” কাজ করে। “প্রবাসী” চেন তো ?

“প্রবাসী” চিনি না ? বাংলা দেশের পর্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রিকা।

‘কিন্তু নজরুল বলে, প্রকৃষ্টরূপে বাসি—প্রবাসী।’

চার বন্দোপাধ্যায় “প্রবাসী”র তখন প্রধান কর্ণধার, এদিকে-ওদিকে আরো আছেন ক’জন মাঝিমাঝি। আমার গল্প পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। থাকি বাহুড়বাগান রো-র এক মেসে, চললাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট। সাধারণ ব্রাহ্মমন্দিরের পাশের গলিতে “প্রবাসী”-আপিস, গলির মাঝখানে খুলছে কাঠের চাউস সাইনবোর্ড। সেখান থেকে যাব ব্রিটিশ কলেজ স্ট্রিটের দোতলার, “মোসলেম-ভারত” আপিসে, নজরুলের কাছে। সঙ্গে সর্বপ্রিয় পবিত্র। আশহাট স্ট্রিটে পড়েছি অমনি পবিত্র সামনে কাকে দেখে “গোকুল” “গোকুল” বলে চৈচিয়ে উঠল। আর, মাই কোথা, ধরা পড়ে গেলাম। কথা কম বলে বটে কিন্তু অদম্য তার আকর্ষণ। যেন মন্ত্রবলে টেনে নিয়ে গেল অ্যামাকে “কল্লোল” আপিসে, সেই “এক মুঠো” ঘরে। “কল্লোল” সবে সেই প্রথম বেকবে, আদ্যেক প্রেসে, আদ্যেক কল্লোয়। সাহিত্যের জগতের এক আগন্তুক পত্রিকার জগতের এক আগন্তকের ছুরারে এসে দাঁড়ালাম। আজ তারিখ কত ?

বাইশে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, বৃহস্পতিবার।

সেদিনটা চৈত্রের মাঝামাঝি, ১৩২৯ সাল। এক বছরের কিছু বেশি হল। ঘরে ঢুকে দেখি একটি ভদ্রলোক কোণের টেবিলের কাছে বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। পরিচয় হতে জানলাম ও-ই দীনেশরঞ্জন। বললে, “কল্লোল” আপনার পত্রিকা, যে আসবে এ-ঘরে তারই পত্রিকা। লিখুন—লেখা দিন।’ এমন প্রশস্তচিত্ততার সঙ্গে সংবর্ধিত হব তাবতেও পারিনি। “প্রবাসী”র জন্তে লুকিয়ে পকেটে করে একটি গল্প নিয়ে চলেছিলাম। স্বিকৃতি না করে সেটি পৌছে দিলাম দীনেশের হাতে। দীনেশ একটি লাইনও না পড়ে লেখাটা রেখে দিলে তার দেয়ালের মধ্যে। বললে, লেখা পেলাম বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস পেলাম। পেলাম লেখককে। “কল্লোলের” বন্ধুকে। “কল্লোলের” সেই প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প আমার “মা”। আমি আছি সেই প্রথম থেকে।

বললাম, ‘“প্রবাসী” আপিসে গেলে না আর সেদিন ?’

কোথায় “প্রবাসী” আপিস। নজরুলও বুঝি খারিজ হবার জোগাড়। চারজন তখন আড্ডায় একেবারে বিতোর। তারপরে, সোনায় সোহাগার মত, এসে পড়ল রুটি, আলুর দম আর চা। এমন আড্ডার জরজরকার।

পবিত্র বললে, 'এই শুভসংযোগ নিত্যকাণ্ডের ঘটনা। বীনেরের এই মুক্ত-
বার আর মেজবোঝির এক মুক্ত হৃদয়।'

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে তবু থেকে থাকিল। বললাম, 'নজরুলের সঙ্গে
তোমার সম্পর্ক কি? ওকে কি করে চিনলে?'

'বা রে, ও যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর সবাই ভাকবে আমাকে
শৈলজা বলে, ও ভাকবে শৈল বলে। পাশাপাশি দুই ইঞ্চুলে একই ক্লাসে পড়েছি
আমরা। আমি রানিগঞ্জে, নজরুল শিরাডুলোয় রাজার ইঞ্চুলে। মাইল
দুয়েকের ছাড়াছাড়ি। খার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দু'জনে, আমি হিন্দু ও
মুসলমান, আমি লিখি কবিতা—আশ্চর্য হচ্ছে—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম
দু'জনে। সেই টানে মিললাম, যে টানে ধর্মধর্ম নেই, বর্ণবর্ণ নেই—হাটির টান,
সাহিত্যের টান। দুইজনে রোজ একসঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনো
দিন বা ইঞ্চুল পালাই। গ্র্যাণ্ড ট্রাক রোড ধরি, ধরি ই-আই-আরের লাইন,
কোনোদিন বা চলে যাই শিল্প-শালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম
লড়াই লেগেছে। আমরা দু'জনে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে প্রি-টেন্ট দিচ্ছি। শহরে-
গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্তজোগাড়ের তোড়জোড়। হাতে-গরম মুখে-গরম বক্তৃতা।
সবাই এগিয়ে গেল বীরত্বের ঘোড়দৌড়ে, বাঙালি হিন্দু মুসলমানই শুধু শিছিয়ে
থাকবে? বলা, বীর, চির-উন্নত মম শির! বলা বলে মাতঙ্গম।

দুই বন্ধু খেপে উঠলাম। পরীক্ষা দিয়েই দু'জনে চুপিচুপি পালিয়ে গেলাম
আলানসোল। সেখান থেকে এস-ডি-ওয়ার চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা।
আলানসোলে এক বছর সঙ্গে দেখা—তার কাছে কিছু বাহাদুরি করতে
দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই—সে-ই বাড়ি দিয়ে গিয়ে সব তুল করে দিলে।
ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টে চোকার সব ঠিকঠাক, ডাক্তার হললে, তোমার
দৈর্ঘ-প্রস্থ আরেকবার মাপতে হবে। দ্বিতীয়বারের মাপজোকে নামকূর হয়ে
গেলাম। কেন যে নামকূর হলার জানলেন শুধু তগবান আর সেই রায়সাহেব
বাদামশার। নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে সাথীদারা হয়ে দিয়ে এলাম গৃহকোণে—

তারপর কলেজে ঢুকলাম, অর্থাভাবে কলেজ ছাড়লাম। শিখলাম শর্টক্লাণ্ড
টাইপরাইটিং। চাকরি নিলাম করলাহুতিতে। পোখাল না। শেষে এই সাহিত্য।

পাশা উলটো পড়েছিল ভাগ্যিন। তাই নজরুল কবি, তুমি হলে
গল্পলেখক।

এমন সময় মূলীধার আবির্ভাব।

‘প্রথম আলোপ-পরিচয়ের উদ্ভাঙ্গ চেউটা কেটে বাবার পর মুরলীদা বললে,
‘আসছে রবিবার, পড়িশে জ্যেষ্ঠ কাজীর ওখানে আমাদের সবায়ের নেমস্তম্—’

‘আমাদের সবাইকার।’ আমি আর প্রেয়েন একটু জ্যাবাচাকা খেয়ে
গেলাম। তার সঙ্গে আলোপ নেই, তার ওখানে নেমস্তম্ কি করে হতে পারে।

‘হ্যাঁ, সবাইকার।’ বললে মুরলীদা। ‘সমস্ত “কল্লোলে”র নেমস্তম্।’

তা হলে তো আমাদেরও নেমস্তম্। নিঃসংশয়রূপে নিশ্চিত হলাম।
‘কল্লোলে’ তখনও লেখা এক আখটা ছাপা না হোক, তবু আমরা মনে-প্রাণে
‘কল্লোলে’র।

বললাম, ‘কোথায় যেতে হবে?’

‘হুগলিতে। হুগলিতেই কাজী নজরুলের বাসা।’

এই হুগলির বাসা উপলক্ষ্য করেই বুঝি কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছিল :

‘কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম
ভায়া লাক দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত
প্রাণে ফুড়ির চেউ বর
ধরায় পর তার কেউ নয়।’

এয় পাণ্টা-জবাবে নজরুল কি বলেছিল জানো ?

‘গোলাম মোস্তফা
দিলাম ইস্তফা।’

পাঁচ

কলিৎ কান্তা—বিরহগুরুণা—স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

শাপেনান্তঃ—পমিতমহিমা—বর্বতোগ্যোন ভর্তৃঃ—

ললিতগঙ্গীর স্রমধুর কণ্ঠে একটু বা টেনে-টেনে আবৃত্তি করতে-করতে যে
যুবকটি “কল্লোলে”-আকিমে প্রবেশ করল প্রথম দর্শনেই তাকে জালোবেনে

ফেললাম। ভালোবাসতে বাধ্য হলার বলা উচিত। এমন স্বদর্শনীর তার ব্যক্তিত্ব। মাথাভরা দীর্ঘ উলকো-খুলকো চুল, পারিশাট্টাহীন বেশবাস। এক চোখে গাঢ় ভাবুকতা, অল্প চোখে আদর্শবাদের আভাস। এই আমাদের নৃপেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু দেখব কি তাকে! কয়েক চরণ বাদ দিয়ে পূর্বমেষ থেকে সে আবার আবৃত্তি শুরু করেছে তার অন্তর্ভাবী মনোহরণ কণ্ঠ :

আবাচুত—প্রথমদিবসে—মেঘমান্নিষ্টসাহুং,
বপ্রজীড়া—পরিণতগজ—প্রেক্ষণীয়ঃ দদর্শ ॥

কতক্ষণ তুমুল আড্ডা জমাবার পর আবার সে হঠাৎ উদাস হয়ে পড়ল, চলে গেল আবার ভাববাজ্যে। পূর্বমেষ থেকে উত্তরমেষে। আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে চুলের ঘূর্ণলি তৈরি করেছে আর আবৃত্তি করেছে তন্ময়ের মত :

হস্তে লীলা—কমলমলকে—বালকুন্ডাহুবিম্বং,
নীতা লোভ্র—প্রসবরজসা—পাতুতামাননেত্রীঃ ।
চূড়াপাশে—নবকুবকং—চাকু কণ্ঠে শিরোম্বং,
গীমন্তেচ—স্বহৃৎপগমজং—যজ্ঞ নীপং বধুনাং ॥

আবার কতক্ষণ হলোড়, তর্কাতর্কি, আবার সেই ভাবুকের নির্লিপ্ততা। নৃপেন এতক্ষণ হয়তো দেয়ালে পিঠ রেখে তক্তাপোশের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল, এবার উঠে পড়ল। বলা-কওয়া নেই, সমুদ্র পেয়িয়ে চলে গেল ইংরিজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে, শেলির গুড টু ওয়েলস্ট উইণ্ডে স্বয়ং মেলাল :

Make me Thy lyre ! even as the forest is,
What if my thoughts are falling like its own,
The tumult of Thy mighty harmonies
Will take from both a deep autumnal tone
Sweet though in sadness—

জিগগেস করলাম, ‘হৃগলি যাবে না ? নজরুল ইসলামের বাড়ি ?’
‘নিশ্চয়ই যাবে।’ বলে নৃপেন নজরুলকে নিয়ে পড়ল :

জাভা-গন্ধা খেলি যে তার কিসের ভবে ভর ?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

এই তো যে তার আবার সময় ঐ রথ-বর্ষর—

শোনা যাব ঐ রথ-বর্ষর !

বধূ! প্রদীপ তুলে পর !

ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে স্বন্দর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

বললাম, 'কি করে চিনিলে নজরুলকে ?'

নূপেন তখন সিটি কলেজে আই-এ পড়ে ও আরগুলি লেনের এক বাড়িতে ছাত্র পড়ায়। ছু-ভিনখানা বাড়ির পরেই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চির বাড়ি। সে সব দিনে—তখন সেটা ১৩১৮ সাল—বাগ্‌চি-কবির বৈঠকখানায় কলকাতার একটা সেরা সাক্ষ্য মজলিস বলত। বহু গুণী—গায়ক ও সাহিত্যিক—সে-মজলিসে জমায়ত হতেন। বাংলা দেশের সব জ্যোতির্ময় নক্ষত্র—গ্রহপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন। যতীন্দ্রমোহনের অতিথিবাৎসল্য নগরবিক্রান্ত। কোথায় কোন ভাড়া দেয়ালের আড়ালে 'নূতনের কেতন উড়ছে', কোথায় কার মাঝে বৃহত্তম সম্ভাবনা, কণিতক প্রতিশ্রুতি—সব সময়ে তাঁর চোখ-কান খোলা ছিল। আভাস একবার পেলেই উবেল স্বপ্নে আহ্বান করে আনতেন। তাঁর বাড়ির দরজার বে হাসনাহেনার গুচ্ছ ছিল তার গন্ধ প্রীতিপূর্ণ স্বপ্নের গন্ধ। নূপেন ছু-ছুবার সে বাড়ির স্বমুখ দিয়ে হেঁটে যাব, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে তার কি কোনোদিন প্রবেশের অধিকার হবে ? আদর্শভাঙিত যুবক, সাংসারিক দায়িত্বের চাপে সামান্য টিউশনি করতে হচ্ছে, 'বাগ্‌চি-কবি কি করে জানবেন তার অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অহুয়াগ, তার নির্জনলালিত বিজ্রোহের ব্যাকুলতা ? নূপেন যাব আর আসে, আর ভাবে, ঐ স্বর্গরাজ্যে কে তাকে ডাক দেবে, কবে, কার কণ্ঠস্বরে ?

একদিন তার ছাত্র নূপেনকে বললে, 'জানেন মাষ্টার মশাই, আজ বাগ্‌চি-বাড়িতে 'বিজ্রোহী'র কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন।' 'বিজ্রোহী'র কবি ! "আমি ইম্রাজী-স্বত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য ; মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে বণতুর্ধ !" "আমি বিজ্রোহী তুণ্ড, ভগবান-বুকে একে দিই পদ-চিহ্ন ; আমি খেয়ালী বিবিধ বন্ধ করিব ভিন্ন।" সেই 'বিজ্রোহী'র কবি ?

কেমন না জানি দেখতে ! রাস্তার উপরে উৎসব জনতা জড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ নাইছে তার ঘরে । সম্ভব কি, শুধু ‘বিরোধী’র কবি নয়, কবি-বিরোধী । তার কর্তব্যে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উদ্ভাবনা । গ্রীষ্মের রক্ত আকাশে যেন মনোহর রক্ত হঠাৎ ছুটি পেরেছে । কর্কশের মাঝে মধুরের অবতারণা । নিজেরো অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নূপেন । লম্বা কুঠার কালিকা নজরুলের গানে মুছে গেছে । শুধু কি তাই ? গানের শেষে অন্তর্কিতে সাহিত্যালোচনার যোগ দিয়ে বসেছে নূপেন । কখা হচ্ছিল রূপ সাহিত্য নিয়ে, সব স্বপ্নহীন পূর্ব-স্মৃতির সাহিত্য— পুশকিন, টলস্টয়, গোগল, ডস্টয়ভস্কি । নূপেন রূপ সাহিত্যে মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে । তা ছাড়া সেই তরুণ বয়সে সব সময় নিজেকে জাহির করার উত্তেজনা তো আছেই । কে যেন ডস্টয়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নামে ভুল করেছে, নূপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করলে । সঙ্গে-সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি । সকলের বিম্বিত চোখ পড়ল নূপেনের উপর । নজরুলের চোখ পড়ল নবীন বকুতার ।

ঘর থেকে নেমে এসেছে পথে, পিছন থেকে কে ডাকল নূপেনকে । কি আশ্চর্য ! বিরোধী কবি স্বয়ং, আর তার সঙ্গে তার বন্ধু আকজলউল হক— “মোসলেম ভারতে”র কর্ণধার । যানে, যে কাগজে ‘বিরোধী’ ছাপা হয়েছে সেই কাগজের । স্মরণ নূপেনের চোখে আকজলও প্রকাণ্ড কীর্তমান । আর, “প্রবাসী”র যেমন ববীন্দ্রনাথ, “মোসলেম ভারতে”র তেমনি নজরুল ।

নজরুল বললে, ‘আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই ।’

‘তা হলে আসুন, হাটি ।’

নূপেন তখন থাকে চিংড়িঘাটায়, কলকাতার পূর্ব উপাঞ্চে । নজরুল আর আকজল চলে এল নূপেনের বাড়ি পর্যন্ত । নূপেন বললে, আপনারা পথ চিনে কিরতে পারবেন না, চলুন এগিয়ে দিই । এগিয়ে দিতে দিতে চলে এল কলেজ স্ট্রিট, নজরুলের আস্তানা । এবার কিরি, বললে নূপেন । নজরুল বললে, চলুন ফের এগিয়ে দিই আপনাকে । সে কি কথা ? নজরুল বললে, পথ তো চিনে ফেলেছি ইতিমধ্যে ।

রাত গভীর হয়ে এল, সঙ্গে-সঙ্গে গভীর হয়ে, এল ঘরের কুঁচুখিতা । দুটো করে বাধা হয়ে পেল গ্রন্থি ।

নজরুল বললে, “দুয়কেতু” নামে এক সাপ্তাহিক বেত্র করছি । আপনি আসুন

আয়ার সঙ্গে। আরি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপুনি জিশুল। আহ্নন, দেশের
ধুম ভাঙাই, তর ভাঙাই—

নুপেন উৎসাহে ফুটতে লাগল। বললে, এমন শুভকাজে দেবতার কাছে
আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল
শেষমুহুর্তে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখ্যান
করেছেন? তা ছাড়া, এ নজরুল, যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি শুণ্ড প্রাণের
নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন “ধুমকেতু”র
মর্মকথা কি। মৌবনকে “চিরজীবী” আখ্যা দিয়ে “বলাকা”র তিনি আধ-মরাদের
যা মেঝে বাঁচাতে বলেছিলেন, সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু, এবার
“ধুমকেতু”কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের
সংকেত।

আয় চলে আয় রে ধুমকেতু
আধারে বাধ অগ্নিসেতু,
হুদিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোয় বিজয়কেতন,
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেঝে
আছে যারা অর্ধচেতন।

সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজের গলি থেকে বেরুল “ধুমকেতু”। ফুলদাপ সাইজ,
চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধহয় দু পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠায়ই সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা রক করে কবিতাটি
ছাপানো।

নুপেনের মত আরিও ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরো
অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে
“ধুমকেতু”র বাঙাল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের
জন্মে। কালির বহলে বক্কে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।
সঙ্গে “জিশুলের” আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের “সন্ধ্যা”তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি
তাবাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু

একজনকে পড়িয়ে শাস্ত করবার রক্ত সে দেখা নয়। যেমন গুপ্ত ভেমনি কবিতা।
সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মকলাচরণ।

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে গোপাট
রক্ত-জমাট, শিকলপূজার পাবানবেদী।

ওরে ও তরুণ ঈশান। বাজা তোম প্রলয়-বিধাণ
ধ্বংস-নিশান উদ্ভুক প্রাচীর-প্রাচীর ভেদি।

গাছনের বাজনা বাজা। কে মালিক কে সে রাজা ?
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?

হাহা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে কিসি
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় ধোলা,
গায়কগুলা জোরসে ধ'রে হেঁচকা টানে।

মার হাঁক হায়দরী হাঁক, কাঁধে নে হুন্ডুভি-ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবনপানে।

নাচে ঐ কালবোশেখী, কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।

লাথি মার ভাঙ রে তাল। যত সব বন্দিশালা।
আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি ॥

“ধুমকেতু”র সের্ব-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলাসাহিত্যের
একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত সাক্ষ্য থাকত বাঙলা গল্প কথটা কাব্যগুণাধিত
হতে পারে, “প্রসন্নগজ্জীরপদা সরস্বতী” কি করে “বিনিজ্জাতাসিধারিণী” সংহারকর্ত্রী
মহাকালী হতে পারে। প্রসাদরম্য ললিত ভাষায় কি করে উৎসারিত হতে পারে
অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার। একটা প্রবন্ধের কথা এখনো মনে আছে—নাম, “ম্যার তুখা
ই”। মহাকালী স্বর্ধাত হরে নরমুণ্ডের লোভে শ্মশানে বেরিয়েছেন তারই একটা
ঘোরদর্শন বর্ণনা। বোধহয় সে-সংখ্যাটা কালীপূজার সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল।
কালীপূজার দিন সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে যে মামুলি প্রবন্ধ
বেরোয়—মুখস্তকরা কড়কগুলো সমাসবদ্ধ কথা—এ সে জাতের লেখা নয়।
দীপাবর্তির রাজির পরেই এ-দীপ নিবে যায় না। বাঙলাদেশের চিরকালীন
যৌবনের রক্তে এর ছাতি জ্বলতে থাকে।

“কুয়েকু”তে একটা কবিতা পাহিরে দিলাম। অর্থাৎ একটা গাঁকো কেলান নজরুলকে গিয়ে ধরবার জন্তে। সেই কবিতাটা ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় বেরল না। অল্পসাহিত্য হবার কথা, কিন্তু আমার স্পর্ধা হলো নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে মুখোমুখি জবাবদিহি নিতে হবে। গেলাম তাই একদিন দুপুরবেলা। রডিন লুজি পরনে, গারে আট গেলি—অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তক্তপোশে—চারদিকে একটা অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া ছড়িয়ে। ‘অগ্নিবীণা’র প্রথম সংস্করণে নজরুলের একটা কোটো ছাপা হয়েছিল, সেটার বড়-বেশি কবি-কবি ভাব—এখন চোখের সামনে একটা শাস্ত্র দেখলাম, স্পষ্ট, সন্তোষ প্রাপ্ত পূর্ব। বললাম—আমার কবিতার কি হল? নজরুল চোখ তুলে চাইল : কোন কবিতা? বললাম—আপনার কবিতা যখন ‘বিদ্রোহী’, আমার কবিতা ‘উচ্ছ্বল’। হাহাহা করে নজরুল হেসে উঠল। বললে—আপনি মনোনীত হয়েছেন।

কবিতাটা ছাপা হয়েছিল কিনা-জানি না। হয়তো হয়েছিল, কিংবা হয়তো তার পরেই নজরুলকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। কিন্তু তার সেই কথাটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে রইল : আপনি মনোনীত হয়েছেন।

‘নজরুলকে কিসের জন্তে ধরলে জানো?’ জিজ্ঞেস করলে নূপেন।

‘কিসের জন্তে?’

‘আগে লিখেছিল—“রক্তাধর পর্ মা এবার জলে পুড়ে যাক খেতবসন। দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে ভরবারি বনন বন।” এবারে লিখলে—“আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল!” এই লেখার জন্তে নজরুলের এক বছর জেল হয়ে গেল। সে বা জবানবন্দি দিলে তা শুধু সত্য নয়, সাহিত্য।’

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বসে ছিল একপাশে। বললে, ‘তার জেলের কাহিনীটা আমার কাছ থেকে শোনো।’

‘তোমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ হল কবে?’

‘নজরুল যখন করাচিতে, যখন ও শুধু-কবি নয়, হাবিলদার কবি। পন্টনে লেকট-রাইট করতে হত তাকে। পন্টনও এমন পন্টন, লেকট-রাইট বোঝে না। তখন এক পায়ে ঘাস ও অল্প পায়ে বিচালি বেঁধে দিয়ে বলতে হত, ঘাস-বিচালি-ঘাস। সেই সময়কার থেকে চেনা। আছি তখন “স্বল্পপত্র”—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক চিঠি আসে করাচি থেকে, সঙ্গে ছোট একটি কবিতা। লেখক.উনপকাশ

নব্ব্ব বাঙালি পটনের একজন হাবিলদার, নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাটি বড় রবীন্দ্রনাথ-ধেঁবা। স্বকীয়তা খুঁজে পেলেন না বলে চৌধুরী মশারের পছন্দ হল না। আমার কিন্তু ভাল লেগেছিল। কবিতাটি নিয়ে গেলাম “প্রবাসী”র চারুবারুর কাছে। চারুবারু খুশি হয়ে ছাপলেন সে-কবিতা। বললেন, আরো চাই। এক জায়গায় পাঠানো কবিতা অন্য জায়গায় চালিয়ে দিয়েছি লেখকের সম্মতি না নিয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে চিঠি লিখলাম নজরুলকে। “দে গরুর গা ধুইয়ে”—নজরুল তা খোড়াই কেয়ার করে। প্রশস্ত সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে আমাকে, এতটুকু তুল বুঝলে না। নবীন আগন্তুককে প্রবেশ-পথে যে সামান্য সাহায্য করেছি এতেই তার বদ্ধতা যেন সে কায়েম করলে। তারপর পটন ভেঙে দেবার নয় যখন সে কলকাতায় ফিরল, ফিরেই ছুটল “সবুজপত্র” আমাকে খোঁজ করতে—

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল—রবীন্দ্রনাথ পবিত্রকে ডেকেছেন। কি ব্যাপার? ব্যাপার রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বসন্ত”-নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছেন। এখন একথানা বই ওকে জেলখানায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। পারবে নাকি পবিত্র?

নিশ্চয়ই পারব। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম লিখে দিলেন। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল, ‘শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু।’ তার নিচে তাঁর কাঁচা কালির স্বাক্ষর বসল। শুনেছি তাঁর আশেপাশে যে সব উন্নাসিক ভক্তের দল বিরাজ করত তারা কবির এই বদান্ধতায় সেদিন বিশেষ খুশি হতে পারেনি। কিন্তু তিনি নিজে তো জানতেন কাজী নজরুল তাঁরই পরেকার যুগে প্রথম স্বতন্ত্র কবি, স্বীকার করতে হবে তার এই শক্তিদীপ্ত বিশিষ্টতাকে। তাই তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতি জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। “শ্রীমান” ও “কবি” এই কথা দুটির মধ্যে তাঁর সেই গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা অক্ষয় করে রাখলেন।

নজরুল মিঠে পান ও জর্দা ভালোবাসে, আর ভালোবাসে হেজলিন স্ত্রী। এই সব ও আরো কটা কি বরাতি জিনিস নিয়ে পবিত্র একদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দুয়ারে হাজির, নজরুলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। লোহার বেড়ার ওপার থেকে নজরুল চোঁচিয়ে জিগগেস করলে—সব এনেছিস তো? পবিত্র হাসল। কী জানে নজরুল, কী জিনিস পবিত্র আজ নিয়ে আসছে তার জন্তে। কী ‘দেবতা-চুল্লভ উপহার! কী এনেছিস? চোঁচিয়ে উঠল নজরুল। পবিত্র

বললে, তাঁর জন্মে কবিকণ্ঠের স্বামী এনেছি। বলে, “বসন্ত” বইখানা তাকে দেখাল। নজরুল তাঁর বলে, রবীন্দ্রনাথের “বসন্ত” কাব্যনাট্যখানা নিয়েই পবিত্র বুকি একটু কবিরানা করছে। এটো তথ্য। উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা পবিত্র খুলে ধরল তার চোখের সামনে। আর কী চাস! সব চেয়ে বড় ভক্তি আজ তুই পেয়ে গেলি। তার চেয়েও হয়তো বড় জিনিস। রবীন্দ্রনাথের মেহ।

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে দেশের ও সাহিত্যের একটা দায়ী সম্পদ বলে মনে করতেন তার আর একটা প্রমাণ আছে। নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশন করছে তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—Give up hunger strike, our literature claims you. টেলিগ্রাম করেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেই টেলিগ্রাম ফিরে এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কর্তৃপক্ষ লিখে পাঠাল : Addressee not found.

‘এই সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পবিত্র তা চেপে যাচ্ছে।’ বললেন নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের নলিনীদা। কৃষ্ণের যেমন বলরাম, নজরুলের তেমন নলিনীদা। হাসির গানের তানসেন। নজরুল গায় আর হাসে, নলিনীদা গান আর হাসান। নজরুলের পার্থক্য বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নলিনীদার কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হবে, নলিনীদাকে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করতে হবে, ধরো নলিনীদাকে। নজরুল সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল।

শোনো সে মজার কথা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে নজরুল তখন বদলি হয়েছে হুগলি জেলে। হুগলি জেলে এসে নজরুল জেলের শৃঙ্খলা ভাঙতে শুরু করল, জেলও চাইল তার পায়ে ভালো করে শৃঙ্খলা পরাতে। লেগে গেল সংঘাত। শেষকালে নজরুল হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে। আটাশ দিনের দিন সবাই আমাকে ধরলে জেলে গিয়ে নজরুলকে ঘেন খাইয়ে আনি। জানতাম নজরুল মচকাবার ছেলে নয়, তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। গেলাম হুগলি জেলের ফটকে। আমি আর সঙ্গে, সকল অগতির গতি, এই পবিত্র। জেলে ঢুকতে পারলাম না, অহমতি দিলে না কর্তারা। হতাশ মনে ফিরে এলাম হুগলি স্টেশনে। হঠাৎ নজরে পড়ল, প্র্যাটকর্মের গা ধোঁবেই জেলের পাঁচিল উঠে গেছে। মনে হল জেলের পাঁচিলটা একবার কোনোরকমে ভিঙোতে পারলেই নজরুলের সামনে সটান চলে যেতে পারব। আর এভাবে জেলের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে

লক্ষ্যে যে যেমনো চলেবে না তা এই দিনের সন্ধ্যায় ঘাই পাই। অল্প বিলম্বটা চেষ্টা করে দেখবার মত। পবিত্রকে বললাম, তুমি আসে উল্লু হয়ে বোসো, আমি তোমার হুকুমের উপর হুঁ পা রেখে দাঁড়াই যেমত হবে। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। তোমার কাঁধের থেকে যদি একবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে পারি, তবে তুমি আর এখানে থেকে না। শ্রেক হাওয়া হয়ে যেয়ো। বাড়তি আরেক মনের জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

বেলা তখন প্রায় ছটো, প্র্যাটফর্মে রাজ্যীয় আনাগোনা কম। ‘র‍্যাকর্ডিং টু গ্লান’ কাজ চল। পবিত্রের কাঁধের থেকে পাঁচিলের মাথায় কারক্লেপে প্রমোশন পেলাম। প্রমোশন পেয়েই চম্ চড়কগাছ! ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড ধাদ—খাই প্রায় অন্তত চল্লিশ হাত। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পবিত্রের নামগন্ধ নেই। যা হবার তা হবে, হুঁদিকে হুঁ ঠ্যাং ঝুলিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম পাঁচিলের উপর বোড়লওয়ারের মত। যে দিকে নামাও সেই দিকেই রাজি আছি—এখন নামতে পারাটাই কাম্যকর্ম। কিন্তু কই জেলখানার ভিতরের মাঠে লোক কই? খানিকপর সামধ্যায়ী মশাইকে দেখলাম—মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী। বেড়াতে বেড়াতে একটু কাছে আসতেই চিৎকার করে বললাম, নজরুলকে ডেকে দিন। নজরুলকে।

সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বসে আছি পাঁচিলের উপর। জেলখানার কর্ত্তার দলে-দলে এসে মাঠে জুটতে লাগল বিনা টিকিটে সে সার্কাস দেখবার জন্তে। ছ’টি বন্দী যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে নজরুলও এগিয়ে আসতে লাগল। বেশি দূর এগুতে পারল না, বসে পড়ল। গলার স্বর অন্তর্দূরে পৌঁছুবে না, তাই জোড়হাত করে ইঙ্গিতে অহুরোধ করলাম যেন সে থায়। প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হাত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল এ অহুরোধ অপাল্য।

এ তো জানা কথা। এখন আমি কি করে? পবিত্র যে ঠিক “ধরো লক্ষণের” মতই অবিকল ব্যবহার করবে এ যেন আশা করেও আশা করিনি। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার চেয়ে পাঁচিলে তুলে কাঁধ সরিয়ে নেওয়া ঢের বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু ভয় নেই। স্টেশনের বাবুয়া ভিড় করে লাড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের—আজ কি করে বলি—শেব প্রাক্ক করছেন। ধরনী, সিধা হও, বলে পাঁচিল থেকে পড়লাম লাফ দিয়ে। স্টেশনের মধ্যে

আর্যকে ধরে নিয়ে গেল, পুষ্টিপেশ হাড়ে দেয় আর কি। অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমি সন্ন্যাসবাদীদের কেউ নই। ছাড়া পেয়ে গেলাম। অবিশি তার পরে পবিত্র আর কাছছাড়া হল না—’

‘তারপরে নজরুল অনশন তাড়ল তো?’

তাড়ল চল্লিশ দিনের দিন। আর তা শুধু তার মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর মেহাজুরোধে।

নজরুলের বিব্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মতোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম। তারপরে স্বাধ পাব তার দারিদ্র্যজয়ী মুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দারিদ্র্যহীন বোহিমিয়ানিজম! সবই সেই কলোয়গের লক্ষণ।

কিন্তু তোমরা কে কি করে এলে “কলোলে”?

নূপেন হঠাৎ একদিন একটা দীর্ঘ প্রেমপত্র পাঠ—তুমি এসো, আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাও। এ প্রেমপত্র তাকে কোনো তরুণী লেখনি, লিখেছে “কলোলের” পরিকল্পক স্বয়ং দীনেশরঞ্জন। “ধূমকেতু”তে “ত্রিশূলের” লেখার আকৃষ্ট হয়েই দীনেশরঞ্জন নূপেনকে সম্ভাষণ করেন—আর, শুধু একটা লেখার জন্তে অহুরোধ নয়, গোটা লোকটাকেই নিমন্ত্রণ করে বসলেন। ভোজ্য সাজাতে, পরিবেশন করতে। নূপেন চলে এল সেই ডাকে। মুখে সেই মধুর মন্দাক্রান্তা ছন্দ—

ছরোপান্তঃ—পরিণতফল—জ্যোতিভিঃ কাননাত্রৈ-

স্বধ্যারুঢ়ে—শিখরমচলঃ—নিখবৌসবর্ণে।

নূনং যান্ত—তামবমিথুন—শ্রেষ্ঠনীল্যামবহাং

মধ্যে শ্রামঃ—স্তন ইষ ভুবঃ—শেষবিস্তারপাণ্ডঃ ॥

আর, পবিত্র একদিন ফোর আর্টস বা চতুর্কলা ক্লাবে এসে পড়েছিল ওস্বরধৈর্য্যামের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। পুরোনো ঘর ভেঙে যখন ফের নতুন ঘর বাঁধা হল, ছোট করে, বন্ধুত্ব ঘন ও দৃঢ় করে, তখনও পবিত্রর ডাক পড়ল। ঘর ছোট কিন্তু টুই খুব উঁচু। সে চুড়া উঁচু আদর্শবাদের।

কান্তিচন্দ্র ঘোষকে দূর থেকে মনে হত স্বকৃত্রিম আভিজাত্যের প্রতীক। এক কথায় স্বব। তিনিও নিজেকে dilettante বলতেন। “বিচিত্রা”র খাকা কালে তাঁর সংস্পর্শে আসি। তখন বুঝতে পারি কত বড় রসিক কত বড় বিদ্বৎ মন তাঁর। তিনি “সবুজপত্রের” লোক। তাই সাহিত্যে সব সময়

নব্যপন্থী, অচলারতনী নন। রসবোধের গভীরতা থেকে মনে যে বিক
প্রশান্তি আসে তা তাঁর ছিল—সে শান্তির স্বাদ পেয়েছে তাঁর নিকটবর্তীরা।

কিন্তু নজরুল এল কি করে ?

পবিত্র যখন জেলে নজরুলকে “বসন্ত” দিতে যার তখনই নজরুল কথা
দেয় নতুন কবিতা লিখবে পবিত্রের ফরমানে। “কল্লোলের” জন্তে কবিতা।
লাল কালিতে লেখা কবিতা। জেল থেকে এল একদিন সেই কবিতা—
সত্যিসত্যিই লাল কালিতে লেখা—“সৃষ্টি স্রুথের উল্লাসে”।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পখলে

বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।

আসল হাসি আসল কাদন, আসল মুক্তি আসল বানধন,

মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে,

রিক্ত বকের দুখ আসে—

আজ সৃষ্টি স্রুথের উল্লাসে ॥

এই কবিতা ছাপা হল “কল্লোলের” প্রথম কি দ্বিতীয় সংখ্যায়। কবিতাটির
জন্ত পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলে সেই টাকা পবিত্র পৌছে
দিরেছিল নজরুলকে।

এমন সময় কল্লোল-আফিসে কে আরেকটি যুবক এসে ঢুকল। ছিপছিপে
ফর্সা চেহারা, খাড়া নাক, বড়-বড় চোখ, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু একটু লক্ষ্য
করলে দেখা যাবে এই বয়সেই কপালের উপর হুঁচরটি রেখা বেশ গভীরভাবে
ফুটে উঠেছে। কে এ ? এ সুকুমার ভাট্টি। একদিন এক গ্রীষ্মের দুপুরে
হঠাৎ অনাহৃত ভাবে কল্লোল-আফিসে চলে আসে। একটা গল্প হয়তো
বেরিয়েছিল “কল্লোলে”—সেই অধিকারে। এসে নিঃসংকোচে দীনেশ ও
গোকুলকে বললে, ‘আমি আপনাদের দেখতে এসেছি।’ আর ঘরের এক
কোণে নিজের জায়গাটি পাকা করে রেখে যাবার সময় বললে, ‘আমি কল্লোলের
জন্তে কাজ করতে চাই।’

আনন্দের খনি এই সুকুমার ভাট্টি। কিন্তু কপালে ঐ হুঁচিক্তার রেখা
কেন ? এমন স্নন্দর স্বাক্ষর চেহারা, এমন স্নিগ্ধ উজ্জল চক্ষু, কিন্তু বিবাদের
প্রলেপ কেন ?

নুপেন বললে, 'এখন এসব থাক । এখন হুগলি চলো ।'

বলে, এখন, একতক্কে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলে :

হে অলম্বী, কককেশী, ভূমি দেবী অচঞ্চলা

তোমার বীতি সরল অতি নাহি জানো ছলাকলা ।

আলাও পেটে অগ্নিকণা, নাইকো তাহে প্রতারণা,

টানো যখন মরণ ফাঁসি বলো নাকো মিষ্টভাব,

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস ।

ছয়

‘আপনি যাবেন না ?’

‘তোমার কি মনে হয় ?’ দুই চোখে কথা-ভরা হাসি নিয়ে তাকালেন দীনেশদা ।

উজ্জল দৃষ্টির মধ্য দিয়ে এমন বহুতাপূর্ণ হাসি—এ আর দেখিনি কোনোদিন । সে হাসিতে কোমল স্নেহের স্পর্শ রাখানো । পূঁজিপাটা তাঁর কিছুই ছিল না— শুধু হৃদয়ভরা নীরবনিবিড় স্নেহ আর দুই চোখের এই মাধুর্যময় মিত্রতা । যেন বা একটি অস্তিত্ব আশ্রয়ের প্রার্থী প্রতিশ্রুতি । সব হারিয়ে-ফুরিয়ে গেলেও আমি আছি এই অভয় ঘোষণা । তাই দীনেশরঞ্জন ছিলেন “কল্লোলে”র সব-পেয়েছির দেশ । সব-হারানোদের মধ্যমণি ।

দেখতে সুপুরুষ ছিলেন । চৌরঙ্গি অঞ্চলে এসু রায়ের খেলার সরঞ্জামের দোকানে যখন চাকরি করতেন, তখন সবাই তাঁকে পাশি বলে ভুল করত । দু-চার কথা আলাপ করেই বোঝা যেত ইনি যে শুধু বাঙালি তা নয়, একেবারে বিশ্বাসী বন্ধুহানীয়া । অল্প একটু হেসে দু’ চারটি মিষ্টি কথার দূরকে নিকট ও পরকে আপন করার আশ্চর্য জাতুমন্ত্র জানতেন । একটি বিস্ময় প্রীতিস্বচ্ছ অন্তরের নিভুল ছায়া এসে সে-চোখে পড়ত বলেই সে-জাতুমন্ত্রের মায়ার মুগ্ধ না হয়ে থাকা যেত না । এসু রায়ের দোকান থেকে চলে আসেন তিনি লিওনে স্ট্রিটে এক ওয়ুথের দোকানে অংশীদার হয়ে । সমবেত রুগীদের এমন ভাবে যত্ন-আত্তি করতেন কে বলবে ইনিই ডাক্তার নয় । বাহুবল অস্তরে প্রবেশ করবার সহজ, লক্ষিণ ও ত্রাণিত যে পথ আছে তিনি ছিলেন সেই পথের পথকার । সে পথের

প্রবেশে স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ হাসি, প্রস্থানে নকশা-আকর্ষিতা। এই সময়ে আরই নিউ মার্কেটে ফুলের গুঁলে বেড়াতে আসতেন। ফুল ভালবাসতেন খুব, কিন্তু ফুলবার মত স্বচ্ছলতা ছিল না। মাসে দু-এক টাকার কিনড়ের বড় ছোঁয়, কিন্তু যখনই দোকানের গলিতে এসে ঢুকতেন দোকানীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত—কে কোন ফুল তাঁকে উপহার দেবে। অগ্নান ফুলের মতই যে এঁর ক্ষয় ফুলের ক্ষয়িরা বুঝতে পারত সহজেই। কথা-ভরা উজ্জল চোখ, হাসি-ভরা মিষ্টি আলাপ আর অনন্ত-সাধারণ সরল সৌন্দর্যবোধ—সকলের থেকেই কিছু না কিছু আহার করে নিত অনায়াসে। শুধু কণজীবনের ফুল নয়, আমার-তোমার ইহজীবনের ভালোবাসা। অজাতশত্রু শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম—জাতমিত্র। এই একজন।

এই ফুলের গুঁলে ঢুকেই গোকুলের কাছাকাছি এসে পড়েন। লক্ষ্য করেন একটি উদাসীন বিমনা যুবক ছিন্নবস্ত্র ফুলগুচ্ছের দিকে করুণ চোখে চেয়ে কি ভাবছে! হয়তো ভাবছে ফুল বেচে জীবিকার্জন করতে হবে এ কি পরিহাস! পরিহাসটা আরো বেশি মর্মান্তিক হয় যখন তা আত্মাণেও লাগে না আত্মদনেও লাগে না। পুরোপুরি অন্তত জীবিকার্জনটাই করো। বীনেশরঙ্গন হাত মেলানেন গোকুলের সঙ্গে। তার বিপণি-বীণি নতুন ছন্দে সাজিয়ে দিলেন, নতুন বাচনে আলাপ করতে লাগলেন হলে-হতে-পারে খন্ডেরদের সঙ্গে। ফুল না নাও অন্তত একটু হাসি একটু সৌজন্ত নিয়ে যাও বিনি-পয়সায়। আর এমন মজা, যেই একটু সেই হাসি দেখেছ বা কথা শুনেছ, নিজেরও অলক্ষিতে কিনে বসেছ ফুল। দেখতে-দেখতে গোকুলের মরা গাঙে ভরা কোর্টালের জোয়ার এল। তবু ঘেন মন ভরে না। এমন কিছু নেই যার সৌরভ অল্পযাত্রী বা অল্পজীবী নয়? যা শুকায় না, বাসী হয় না? আছে, নিশ্চয়ই আছে। তার নাম শিল্প, তার নাম সাহিত্য। চলো আমরা সেই সৌরভের লগুনা করি। হোন তিনি এ সৃষ্টির কারিকর, তবু আমরা পরের জিনিসে কারবার করব কেন? আমরা আমাদের নিজের জিনিস নিজেসাই নির্মাণ করব।

সেই থেকে কোর আর্টস বা চতুষ্কলা ক্লাব। আর সেই চতুষ্কলার কীরবিন্দু “কলোয়াল”।

যুবলীলা, শৈলজা, প্রেমেন, আর আমি চারজন ভাবাবনীপুত্র থেকে এক দলে, আর অল্প দলে ডি-আর, গোকুল, নূপেন, ভূপতি, পবিত্র, সুকুমার—সকলে সমলবলে হগলিতে এসে উপস্থিত হলাম। প্র্যাটকর্মে স্বয়ং নজরুল। “দে গকর

পা বুইয়ে” অভিমতের স্বাক্ষর উঠল। পূর্ব-পরিচয়ের নজির এনে ব্যবধানটা কমাবার চেষ্টা করা যায় কিনা সে-কথা ভেবে নেবার আগেই নজরুল সবল আলিফনে বৃকে টেনে নিলে—শুধু আমাকে নয়, জনে-জনে প্রত্যেককে। তোমরা হেঁটে-হেঁটে একটু-একটু করে কাছে আস আর আমি লাকিরে-ঝাঁপিয়ে পড়ে আপটে ধরি—সীতার জানা থাকতে সীতার কি দরকার।

সেটা বোধহয় নজরুলের বড় ছেলের “আকিকা” উৎসবের নিয়ন্ত্রণ। দিনের বেলায় গানবাজনা, হৈ-হজা, রাতে তুরিভোজ। কিরতি ট্রেন কখন তারপর? “দে পকর পা বুইয়ে।” কিরতি ট্রেনের কথা কিরতি ট্রেনকে জিগগেস করো।

ছপুয়ে নজরুলকে নিয়ে কেউ-কেউ চলে গেলাম নৈহাটি—স্ববোধ দায়ের বাড়ি। স্ববোধ রায় সুবলীদার সহপাঠী, তাছাড়া সেই বছরেই তার আর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এসে গিয়েছে “বিজলী”—রহানিশার অঙ্ককারে সেই বিদ্যাজ্ঞানাময়ী কথা। আর তার সঙ্গে আছে কিশোরকুমার রায় সংক্ষেপে কিসুয়া। ভীষ্মধী স্বজন-রসিক বন্ধু। কিন্তু সে নিজের আত্মপরিচয় দিতে ভালবাসে চিরকালে সাব-এডিটর বলে। বলেই ব্যেং ঝাড়ে : এডিটর মে কাম, এডিটর মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার। আরো একজন আছেন—তিনি শিল্পী—নার অরবিন্দ দত্ত, সংক্ষেপে এ-ডি। নিপুণ রূপদক্ষ। কিন্তু তিনি বলেন, তাঁর শিল্পের আশ্রয় কৃতিত্ব তাঁর রঙে-তুলিতে কাগজে-কলমে ভত নয়, যত তাঁর আননমগ্নত্বে। কেননা উত্তরকালে তিনি বহু সাধনার তাঁর মুখখানাকে চার্চিল সাহেবের মুখ করে তুলেছেন। দাঁতের ফাঁকে একটা মোটা চুরুট শুধু বাকি।

ছোটোখাটো বৈটে মাল্টিবট এই স্ববোধ রায়, অক্ষরন্ত উচ্চহাস্তের ও উচ্চ-বোলের ফোয়ারা। প্রচুর পান খান আর প্রচুর কথা বলেন। আর, উচ্চগ্রামের সেই কথার আর হাসিতে নিজেকে অজস্র ধারার অব্যাহিত করে দেন। আজো, বহু বৎসর অতিক্রম করে এসেও, সেই সরল খুশির সবল উৎসার যেন এখনো সুনতে পাচ্ছি।

আসলে সেই যুগটাই ছিল বঙ্গুতার যুগ, কমরেডশিপ বা সমকর্মিতার যুগ। যে যখন যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আত্মার আত্মজনের মত দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা নেই, পরীক্ষা নেই, ব্যবধান নেই। স্বজন-সমূহের উন্মিল উন্মিলভার এক ঢেউয়ের গারে আরেক ঢেউ—ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সব এক জলের কলোচ্ছ্বাস! বাঁধভাঙা এক বস্তার বল।

কল্লোল-বল্লের আরেক লক্ষণ এই তন্দ্রার সৌহার্দ্য। নিকটনিবৃত্ত আত্মীয়তা। এক জনের জন্তে আরেক জনের মনের টান। এক জনের ডাকে আরেক জনের প্রতিধ্বনি। এক সহযমিতা।

নজরুল বিশ্বের বাঁশি বাজাচ্ছে, আর সে-স্বর সে-কথা সবাইকার যুক্ত বিদ্রোহের দাহ সঞ্চার করছে। গলার শির জোঁকের মত ফুলে উঠেছে, ঝাঁকড়া-চুলো মাথা দোলাচ্ছে অনবরত, আর কখনো-কখনো চড়ার কাছে গিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে ছ' তিন ভাগ হয়ে—সব মিলে হয়ত একটা অশালীন কর্কশতা—কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করে সেই উন্মাদনার মাধুর্য—ইহসংসারে কোথাও তার তুলনা নেই। প্রথরতার মধ্যে সে যে কি প্রবলতা, কার সাধ্য তা প্রতিরোধ করে! কার সাধ্য সে অগ্নিমস্ত্রে না দীক্ষা নেয় মনে-মনে! এ তো শুধু গান নয় এ আহ্বান—বন্ধনবর্জনের আর্তনাদ! কার সাধ্য কান পেতে না শোনে! বুক পেতে না গ্রহণ করে!

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পর্য ছল।

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

তোদের বন্ধ-কাঁয়ার আসা মোদের বন্দী হতে নয়,

ওরে, ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।

এই বাঁধন পরেই বাঁধন তোদের করব মোরা জয়

এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঙ্কনা,

এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা।

এই লাহিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাহনা,

মোদের অস্থি দিয়েই জলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

একবার গান আরম্ভ করলে সহজে ধামতে চায় না নজরুল। আর কার এমন ভাবের অভাব হয়েছে যে নজরুলকে নিবৃত্ত করে। হারমোনিয়মের স্রিতের উপর দিয়ে খটাখট খটাখট করে ক্ষিপ্তবেগে আঙুল চালায় আর দীপ্তস্বরে গান ধরে :

মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বার

জীবন মরণ মোদের অহুচর রে।

দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হালি জোর জয়ের হালি

অ-বিনাশী নাইক মোদের ভয় রে।

যা আছে থাক না ছুলায়, নেমে পড় পথের ধূলায়
 নিশান ছুলায় ঐ প্রাণের স্বপ্ন রে ।
 ধর হাত ওঠে আবার দুর্বোগের রাজি কাবার
 ও হাসে মায় মূর্তি মনোহর রে ॥

জীবনে এমন কয়েকটা দিন আসে যা স্বর্ণাকরে লেখা থাকে স্মৃতিতে—
 অক্ষরও মুছে যায় ক্রমে-ক্রমে কিন্তু সেই স্বর্ণচ্ছটা জেগে থাকে আমরণ ।
 তেমনি সোনার আলোয় আলো করা দিন এ । রেখা মুছে গেছে কিন্তু
 রূপটি আছে অবিনশ্বর হয়ে । ছপুয়ে গন্ধার স্নান, বিকালে গন্ধার নৌকা-
 স্রমণ, রাত্রে আহার—এ একটা অমৃতময় অভিজ্ঞতা । বায়ু, জল, তরু, লতা,
 তারা, আকাশ সব মধুমান হয়ে উঠেছে—মৃত্যুজিৎ যৌবনের আশ্বাদনে । সৃষ্টির
 উল্লাসে বলীয়ান হয়ে উঠেছে ছবার কল্পনা ।

সেই রাত্রে আর গান নেই, শুধু হল কবিতা । প্রেমেন একটা কবিতা
 আবৃত্তি করলে—বোধহয়, “কবি নাস্তিক” । “বুক দিলে যে, ভুখ দিলে যে,
 দুখ দিতে সে ভুলল না, মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পিছে পিছে ।” আমিও
 অহুসরণ করলাম । “দে গরুর গা ধুইয়ে ।” এরা আবার কবিতাও লেখে
 নাকি ? সবাই অভিনন্দন করে উঠল এই প্রথম ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে ।
 বলো, আরো বলো—আরো যটা মুখস্থ আছে ।

কিষ্কতি ট্রেন কখন চলে গিয়েছে । নেমে এসেছে ক্লাস্তিহরণ স্তব্ধতা ।
 কিন্তু নুপেন কাউকে ঘুমুতে দেবে না । যেন একটা ঘরছাড়া অনিয়মের
 জগতে চলে এসেছি সবাই । দেখলাম, বাড়ি ফিরে না গেলেও চলে,
 দিবি না ঘুমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সারারাত । প্রতিবেশী হৃদয়ের উত্তাপের
 পরিমণ্ডলে এসে নবীন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করা যায়, কেননা আমরা ছেনে
 নিষেছি, আমরা সব এক প্রাণে প্রেরিত । এক ভবিষ্যতের দিশারী ।

“বিষের বাশী”র ভূমিকায় নজরুল দীনেশরঞ্জনকে উল্লেখ করেছিল
 “আমার ঝড়ের রাতের বজ্র” বলে । দীনেশরঞ্জন বয়সে আমাদের সকলের
 চেয়ে বড়, কিন্তু আশ্চর্য, বজ্রুতার প্রত্যেকের সমবয়সী, একেবারে নিভৃততম,
 হৃৎসহতম মূহুর্তের লোক । কি আকর্ষণ ছিল তাঁর, তাঁর কাছে প্রত্যেকের
 নিঃসংকোচ ও নিঃসংশয় হবার ব্যাকুলতা জাগত । অথচ এত স্বনিষ্ঠতার
 মাঝেও একদিনের জন্তেও তাঁর জ্যোতিষের সঙ্কম হারাননি । তাঁর দৃঢ়তাকে

উচ্চতাকে অবনমিত করেননি। নিজে আর্টিস্ট ছিলেন, তাই একটি পরিচ্ছন্ন শালীনতা তাঁর চরিত্রে ও ব্যবহারে বিশেষ ছিল। তারই জন্তে এত আস্থা হত তাঁর উপর। মনে হত, নিজে নিঃসবল হলেও নিঃসবলদের ঠিক তিনি নিয়ে যাবেন পরিপূর্ণতার দেশে। নিজে নিঃসহায় হলেও নিঃসহায়দের উত্তীর্ণ করে দেবেন তিনি বিপদ-বাধার শেষে ভ্রাম্যমাণ সমতলতায়।

দীনেশরঞ্জনের বিদ্রোহ রাজনৈতিক নয়, জীবনবাসের বিদ্রোহ। একটা আদর্শকে সমাজে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে বৈরাগ্যভূষণ সংগ্রাম। সাংসারিক অর্থে সাকল্য খোঁজেন নি, শুধু একটি ভাবকে সব-কিছুর বিনিময়ে কলবান করতে চেয়েছিলেন। সে হচ্ছে সত্যভাবের আলো-কে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অনিবার্ণ করে রাখা। প্রতিদিনকার সাংসারিক তুচ্ছতার ক্ষেত্রে অযোগ্য এই দীনেশরঞ্জন কত বিজ্ঞপ-লাঞ্ছনা সহ করেছেন জীবনে, কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হননি। তাঁর দীপায়নের উৎসবে ডাক দিলে আনলেন যত “হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথার” ঘরছাড়াঘের। বললেন, অন্যতর পুত্রকে কে বলে গৃহহীন? এই ঘরছাড়াঘের নিয়েই ঘর বাঁধব আমি। থাকব সবাই মিলে একটা ব্যারাক বাড়িতে। কেউ বিয়ে করব না। বিভক্ত হব না। থাকব অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায়। সাহিত্যের দ্বায়ে একনিষ্ঠ হব। মৃত্যুর পরে কোনো সহজ স্মরণ পরলোক চাই না, এই জীবনকেই নব-নব সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অর্থ দেব, মূল্য দেব নব-নব পরীক্ষায়।

কিন্তু গোকুলের বিদ্রোহ সাহিত্যিক বিদ্রোহ। গোকুলকে থাকতে হত তার ব্রাহ্ম মামাবাড়িতে নানারকম বিধি-বিধানের বেড়াঝালে। সে বাড়িতে গোকুলকে গলা ছেড়ে কেউ ডাকতে পেত না বাইরে থেকে, কোনো মুহূর্তে জায়া খুলে খালি-গা হতে পারত না গোকুল। এমন যেখানে কড়া শাসন,—সেখান থেকে আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হল। তার অভিভাবকদের ধারণা, আর্টস্কুলে যায় যত বাপে-তাড়ানো মারে-খেদানো ছেলে, এবার আর কি, রাস্তায়-রাস্তায় বিড়ি হুঁকে বেড়াও গে। শুধু আর্টস্কুল নয়, সেই বাড়ি থেকেই সিনেমায় যোগ দিলেন গোকুল। “সোল অফ এ প্লেজ” ছবিতে নামল একটি বিদূষকের পার্টে। সহজেই বুঝতে পারা যায় কত বড় সংঘর্ষ করতে হয়েছিল তাঁর সেদিনকার সেই পরিপার্শ্বের সঙ্গে। নীতি-নীতির কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে। কিছু-কিছু তার ছায়া পড়েছে “পথিকে” :

‘মায়ী উঠিয়া মখ ধুইয়া আসিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে পান
ধরিল—

তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে

এলো—এলো—এলো গো !

বুকের আঁচলখানি I beg your pardon, miss—

স্বখের আঁচলখানি ধুলার পেতে

আঙ্গিনাতে মেল গো—’

নাঃ, আমার মখটা দেখছি সত্যিই খাবাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস
কেউ ছিল না—‘বুকের আঁচল’ বলে কৈলেছিলাম !

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—বাবা ! দিদি, তোকে পারবার যো নেই।

মায়ী। কেন, দোষটা শুধবে নিলাম তাতেও অপরাধ ?

দীপ্তি। ওর নাম দোষ শুধবে নেওয়া ? ও ত চিমটি কাটা।

মায়ী। তা হলে আমার দ্বারা হয়ে উঠল না সত্য হওয়া। তোদের
মত ভাল মেয়ের পাশে থেকে যে একটু-আধটু দেখে শুনেও শিখব, তাও
দিবি না ? আচ্ছা সবাই এত রেগে যায় কেন বলতে পারিস ? সেদিন
বধন কমলা ঐ গানটা গাইছিল, মিসেস ডি এমন কবে তার দিকে তাকালেন
যে বেচারীর বুকের আঁচল বুকেই রইল, তাকে আর ধুলার মেলতে হল না।
মিসেস ডি বলে দিলেন, বই-এ ওটা ছাপাব ভুল কমল, স্বখের আঁচল হবে—

কমলা বলল—কিন্তু রবিবাবুকে আমি ওটা বুকের আঁচল—

মিসেস ডি বলিল—ভর্তুকি কোর না, যা বলছি শোন। আর কমলাটারও
আচ্ছা বুদ্ধি ! না হয় রবিবাবু গেয়েছিলেন বুকের আঁচল—কিন্তু এদিকে
বুকের আঁচলটা ধুলার পাভাতে গেলে যে-ব্যাপারটা হবে তার সম্বন্ধে কবির
অনভিজ্ঞতাকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত ?...

‘বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—আজকের ব্যাপারে হোস্টেস কে ?

দীপ্তি। দিদি।

মায়ী কৌশ করিয়া উঠিল—হাঁ, তা-ত হবেই, ছাই কেলতে এমন ভাঙা
কুলো আর কে আছে বল ?

করুণা হাসিলেন—বগড়াখাঁটির দরকার কি? মেয়েদের মত জোনের
ত আর সঙ্গে নিয়ে এক টেবিলে খেতে হবে না—জোরা খাওয়াবি।

মায়া বলিল—তাও ত বটে।

স্বর্ণ। টেবিলে। তার মানে? ওরা কি কখনো টেবিলে খেয়েছে?
একটা বিদ্যুটে কাণ্ড না করে তোমরা ছাড়বে না দেখছি। চিবোনো
জিনিসগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ফেলবে—মুখে ভাত তোলার সময় সর-সর
শব্দের সঙ্গে বর-বর করবে। হাতটা চটতে চটতে কল্লই পর্যন্ত গিয়ে
ঠেকবে—

মায়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মা, তুমি কি কোনদিন ওদের খেতে দেখেছ?

স্বর্ণ। দেখব আবার কি। মেসে থাকে, এক সঙ্গে পকাশজনে মিলে
বাইরের কলে চান করে আর চোঁচামেচি কাডাকাড়ি করে খায়—আমাদের
কপূরীটোলা লেনের বাড়ির ছাদ থেকে একটা মেস স্পষ্ট দেখতে পাওয়া
যায়, ছেলেগুলো শুধু গায়ে বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে পড়ে, আর পড়ে তো
কত! খাটের ছংরিতে ময়লা গামছা আর ঘরের কোণে গামলার প্যানর
লিক, এ থাকবেই।”

“কল্যাণী বলিল—মনিবাবু, আপনি আমার খুব কাছে কাছে থাকুন ন’—

মনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—জানেন না বুঝি, এই ব্রাহ্মপাড়া। চারপাশের
জানালাগুলোর দিকে একটু ভাল করে চেয়ে দেখুন, দেখবেন, কত ছোট-
বড় কত বকরের সব চোখ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। আধঘন্টার
মধ্যেই গেজেট ছাপা হয়ে যাবে। ঐ যে প্রকাণ্ড হলদে রং-এর বাড়িটা
দেখছেন ওটা হচ্ছে মিসেস ডির বাড়ি, ওঁকে চেনেন না?

মনি ভীতভাবে বলিল—চলুন নীচে যাই, দরকার নেই ওসব গুণগোলে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—এই আপনার সাহস?

মনি বলিল—তলোয়ারের চেয়ে জিভটাকে আমি ভয় করি। চলুন—

কল্যাণী বলিল—It's too late. ঐ দেখুন—

মনি দেখিল প্রায় প্রত্যেক জানালা হইতে মেয়েরা বিশেষ আগ্রহের সহিত
দেখিতেছে।”

“বিল লভিকা চ্যাটার্জি তাহার মাতাকে বলিল—মা, আমি এই গোষ্ঠ-
এ শাড়িটার সঙ্গে বাফ-ব্লাউজটা পরব ?

মিসেস চ্যাটার্জি । ওটা না ভূই মিসেস গুপ্তর পার্টিতে পরে গিয়েছিলি ।

লভিকা । তবে এই সের কলারের শাড়ি আর আমন লিক ব্লাউজটা
পরি, কি বল মা ?

মিসেস চ্যাটার্জি । মরি মরি, যে না রূপের মেয়ে, ঠিক যেন কল্লার বস্তার
আঙুন লেগেছে মনে হবে ।

তাহার পর মাতা এবং কল্লার মধ্যে যে গ্রহসন শুরু হইল তাহার
দর্শক কেহ থাকিলে দেখিত, কাপড় জামা বরষার ছড়াইয়া লভিকা তাহার
উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর স্তায় হাত-পা ছুঁড়িতেছে
এবং তাহার মাথার কাছে বসিয়া মিসেস চ্যাটার্জি তাহাকে কিলাইতেছেন ।”

নজরুলের যেমন ছিল “দে গরুর গা ধুইয়ে”, গোকুলের তেমনি ছিল,
“কানী কুল হাও মা, ছন দিয়ে খাই ।” এমনভে রাস্ত-কঠিন গভীর চেহারা,
কিন্তু শুকনো বালি একটু খুঁড়তে পেলেই মিলে যাবে শীতল স্নিগ্ধ জলম্পর্শ ।
দীনেশ আর গোকুল দু’জনেই সংসার-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, দু’জনেই অবিবাহিত
—দু’জনের মধ্যেই দেখেছি এই স্নেহের জন্তে শিশুর মত কাতরতা । স্নেহ
যে কত প্রবল, স্নেহ যে কত পবিত্র, স্নেহ যে মানুষের কত বড় আশ্রয় তা
দু’জনেই তাঁরা বেশি করে বুঝতেন বলে তাঁরা দু’জনেই স্নেহে এত অসুস্থ
ছিলেন ।

প্রেমেন ঢাকার ফিরে যাবে, আমি আর শৈলজা তাকে শেরালদা স্টেশনে
গিয়ে তুলে দিলাম । প্রেমেন লিখলে ঢাকা থেকে :

অচিন,

এই মাত্র ‘কল্লোল’ অফিস থেকে ‘সংক্রান্তির’ ফাইলের সঙ্গে তোব,
শৈলজার আর দীনেশবাবুর চিঠি পেলুম ।

সাব্যাহিন মনটা খারাপই ছিল । খারাপ থাকবারই কথা । কলেজে
বাই না, এখানেও জীবনটা অপব্যয় করছি । কিন্তু তোদের চিঠি পেয়ে এমন
আনন্দ হল কি বলব ।

ভাই, একটা কথা তোকে আগেও একবার বলেছি, স্কলারও একবার
বলব—না বলে পারছি না । ভাখ ভাই, জীবনে অনেক কিছুই শীইনি, কিন্তু

খা পেয়েছি তার জন্তে একবার কৃতজ্ঞ হয়েছি কি? এই বন্ধুদের ভালবাসা—
এর দাম কি কোনো ভালবাসার চেয়ে কম? এর দাম আমরা সব চুকিয়ে
কি দিতে পেরেছি?

আদম মানুষ অর্ধশয় মানুষ ছিল একক, হিংস্র। সে আরেকটা পুরুষকে
কাছে ধঁষতেও দিত না। (উর্কতনের গোড়ার দিকের কথা বলছি) নারীর
প্রতিও তার কাম তখনও প্রেমে রূপান্তরিত হয়নি। তারপর অনেক
পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু হুইটম্যান যখন sexless love-এর প্রথম প্রচার
করেছিলেন অনেকেই মনে মনে হেসেছিল, এখনও অনেকে হয়ত হাসে।
কিন্তু আমি জানি তাই, মানুষ পশুদের সে-স্তর ছাড়িয়ে এখন যে-স্তরে উঠে
দাঁড়াতে চেষ্টা করছে সেখানে বৌনসম্বন্ধ ছাড়াও আর একটা সম্বন্ধ মানুষের
হওয়া সম্ভব। কথাটা ভাল করে হয়ত বোঝাতে পারলুম না। তবুও তুই
বুঝতে পারবি জানি।

এই যে প্রেম, মানুষের অন্তরের এই যে নতুন এক প্রকাশ এটা এতদিন ছিল
না। বৌনমিলনপিপাসা ও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্তে দরকারী ক্রোধ ও
প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত কবতেই একদিন মানুষের দিন কেটে যেত। নিজের অন্তরের
গভীরতর সত্যকে তুলিয়ে খুঁজে বুঝে দেখবার অবসর তার ছিল না। আজ
কয়েকজনের হয়েছে বা কয়েকজন সে অবসর করে নিয়েছে।

জীবনের চরম সার্থকতা এই প্রেমের জাগরণে। যতদিন না এই প্রেম জাগে
ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায় না সম্পূর্ণ করে। কিন্তু বন্ধুর
মাকে বেই সে আপনাকে প্রসারিত করে দিতে পারে তখনই সে-খণ্ডতার হীনতা
হুখে ও লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে সার্থক হয়। আমি যতদিন বন্ধুকে অন্তর দিয়ে
ভালবাসতে না পারি ততদিন আমার দরজা বন্ধ থাকে। যে পথে আনন্দময়
পৃথিবীর চলাচল সে-পথ আমি পাই না।

কথাটাকে কিছুতেই গুছিয়ে ভাল করে বলতে পারছি না, শুধু অন্তরে অনুভব
করছি এর সত্য। এইটুকু বুঝতে পারছি প্রিয়া আমার জীবনের মতখানি, বন্ধু
তার চেয়ে কম নয়। এই কমরেডশিপের মূল্য হুইটম্যান প্রথম বোঝাতে চেষ্টা
করেন। আমরাও একটু বুঝেছি মনে হয়। এখানে হুইটম্যান থাকলে সেই
আয়গাটা একটু তুলে দিতুম।

বন্ধু কমরেডশিপ ইত্যাদি কথাগুলো সব জাতির ভাষাতেই বহুকাল ধরে
চলে আসছে, কিন্তু এই বন্ধু কথাটার ভেতরকার অর্থের গভীরতা দিন দিন

বাহ্যিক নতুন করে উপলব্ধি করছে। পঞ্চাশ বছর আগে এ কথাটার মানে যা ছিল আজ তা নেই, আকাশের মত এ কথাটার অর্থের আর সীমা, বিশ্বের আর পার নেই।

আমার অন্তরের দেবতা তোর অন্তরের দেবতার মিলন-প্রয়াসী, তাই তো তুই আমার বন্ধু। আমরা নিজেদের অন্তরের দেবতাকে চিনি না ভাল করে, ক্রমাগত চেনবার চেষ্টা করছি মাত্র। বন্ধুর ভেতর দিয়েই তাকে ভালো করে চিনি।

শুধু প্রিয়াকে পেল না বলে যে কাঁদে, সে হয় মূর্খ, নয়, ঘোঁনপিপাসার স্তরে আবদ্ধ অন্ধ। প্রিয়ার মাঝেও যতক্ষণ না এই বন্ধুকে খুঁজি ততক্ষণ প্রিয়াকে পূর্ণ করে পাই না। যে প্রেম বৃহৎ সে প্রেম মহৎ। সে প্রেম প্রিয়ার মাঝে এই বন্ধুকে খোঁজে বলেই বৃহৎ ও মহৎ। প্রিয়ার মাঝে শুধু নারীকে খুঁজত ও খোঁজে পশু।

অনেকক্ষণ বকলুম। তোর ভাল লাগবে কি এই একঘেরে বক্তৃতা? তবু না বলে পারি না, কারণ তুই যে আমার “বন্ধু”।

দিন-দিন নিজের অজ্ঞাতে একটা বিশ্বাস বাড়ছে যে মৃত্যুই চরম কথা নয়। “কিরণ*” অর্থহীন জীবনবৃষ্টি ছিল না—আরো কিছু—কি?

চিঠি দিস, ওখানকার খবর লিখিস। খুব লম্বা চিঠি দিবি। আত্মদয়িকের খবর, ‘কল্লোল’ আফিসের খবর, শৈলজা, মুরলীদা, শিশির, বিনয়ের খবর ইত্যাদি ইত্যাদি সব চাই। পড়াশুনা করছি না মোটে। কি লিখছিস আজকাল? সেদিন যিনি ফল খেতে দিলেন তিনিই কি তোর মা? তোর মাকে আমার প্রণাম দিস।—তোর প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাত

ঘোর বর্ষায় পঞ্চ-ঘাট ডুবে গেলেও আড্ডা জমাতে আসতে হবে তোমাকে কল্লোল-আপিসে—তা তুমি ভবানীপুরেই থাকো বা বেলেঘাটারই থাকো। আর সোমনাথ আসত সেই কুমোরটুলি থেকে। সোমনাথের যেটা বাড়ি তার নিচেটা চালের আড্ডত, সাওবাধা চালের বস্তান্ন ভর্তি। উপরে উঠে গিয়ে চালের গাদি পেরিয়ে সোমনাথের ঘর। একটা অলজ্যান্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ শুধু তার ঘরে

* কিরণ দাশগুপ্ত। আমাদের বন্ধু। আত্মহত্যা করে।

নয়, চেছারায়ও। গহ্বির মালিকদের পরনে আটহাতি ধুতি, পা খালি, গলায় তুলসীর কণ্ঠি। সোমনাথের পরনে চিলেচালা অটেল পাঞ্জাবি, লম্বা লোটানো কোঁচা, অঁতললাহিত চুল কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে ব্যাকব্রাশ করা। সব মিলিয়ে একটা উজ্জ্বল বিব্রোহ সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখতে যেমন সৌম্যদর্শন, শুনতেও তেমনি অভিনয়। মোলায়েম মিষ্টি...হেসে একটু বা চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে, কথায় পরিহাসের রসটাই বেশি। অথচ এদিকে খুব বেশি সিরিয়স—পড়ছে মেডিকেল কলেজে। ডাক্তারি করবে অথচ গল্প লিখে “ভারতী”তে, কাগজ বেয় করেছে “ঋণী” বলে। (একটা স্মরণীয় ঘটনার জন্তে ঔ-কাগজের নাম থাকবে, কেননা ঔ-কাগজে সত্যেন দত্তের “ঋণী” কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।) এ হেন সোমনাথ, হঠাৎ শোনা গেল, ব্রাহ্ম হচ্ছে। শখের ব্রাহ্ম নয়, কেতাভ্রবন্ত ব্রাহ্ম। গোকুলই খবর নিয়ে এল তার দীক্ষার দিন কবে। স্থান ভবানীপুর সম্মিলন সমাজ। গেলাম সবাই মজা দেখতে। গিয়ে দেখি গলায় মোটা ফুলের মালা পরে সোমনাথ ভাবে গদগদ হয়ে বসে আছে আর আচার্য সতীশ চক্রবর্তী ফুল দিয়ে সাজানো বেদী থেকে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়ে তাকে দীক্ষিত করছেন। বহু চেষ্টা করে চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়েও তাকে টলানো গেল না, ধর্মবিশ্বাসে সে এত অবিচল! ব্যাপার কি? মনোবনবিহারিণী কোনো হরিণী আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু, কি পরিহাস, কিছুকাল পরে বিধিমত হিন্দুযতে সমাজমনোনীত একটি পাত্রীয় পাণিগ্রহণ করে বসল। সোমনাথ সাহা কল্লোলযুগের এক ঝলক বাসন্তী হাওয়া।

সমস্ত বিকেলে হৈ-চৈ-হল্লার পর সন্ধ্যোক্তীর্ণ অন্ধকারে গোকুলের সঙ্গে একান্ত হবার চেষ্টা করতাম। কল্লোল-আপিসে একখানি যে চটের ইজিচেয়ার ছিল তা নিয়ে সারাদিন কাড়াকাড়ি গেছে—এখন, নিভৃত তাইতেই গা এলিয়েছে গোকুল। পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে বুঝি? সারাদিন অবোধকে “পথিকে”র প্রতিলিপি দিয়েছে। তারই জন্তে কি এই ক্লান্তি? মনে হত, শুধু শারীরিক অর্থেই যেন এ ক্লান্তির ব্যাখ্যা হবে না। যেন আত্মার কোন গভীর নিঃসঙ্গতা একটি মহান অচরিতার্থতার ছায়া মেলেছে চারপাশে; হয়তো অন্ধকার আর একটু ঘন ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেই তার আত্মার সেই গভীর স্বগতোক্তি শুনতে পাব।

কিন্তু নিজের কথা এতটুকুও বলতে চাইত না গোকুল। বলতে ভালোবাসত ছেলেবেলাকার কথা। সতীশ্রসাদ সেন—আমাদের গোরাবাবু—গোকুলের সতীর্থ, নিত্য বাওয়া-আসা ছিল তার বাড়িতে, রূপানারায়ণ নন্দন লেনে।

গোরাবাবুদের বাড়ির সামনের শীতলাতলায় বৈশাখ মাসে তিন দিন ধরে যাত্রা হুড়, শলমা-চুমকির পোশাক-পরা রাজা-রাণী-সখির দল সরগরম করে রাখত সেই শীতলাতলা। প্রতি বৎসর গোরাবাবুদের বাড়ির ছাদে বসে সারারাত যাত্রা শুনত গোকুল—একবার কেমন বেহালা নিয়ে এসেছিল সখিদের গানগুলো বেহালায় তুলে নেবার জন্তে। কিংবা বলতে চাইত আরো আগের কথা। সেই যখন সাউথ সুবার্বান স্থলে ফিক্‌থ্রাসে এসে ভর্তি হল। অত্যন্ত লাজুক মুখচোরা ছেলে, ক্লাসের লাস্ট বেকিতে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা। আলিপুরে মামার বাড়িতে থাকে, মামা ব্রাহ্ম, তাই তার কথাবার্তায় চালচলনে একটা চকচকে গোছপাছ ভাব সকলের নজরে না পড়ে যেত না। তার উপর মার্বেল, ভাঙাগুলি, চু-কপাটি খেলবে না কোনোদিন। পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আর নাকি খাতার পাতায় ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। রাষ্ট্র হয়ে গেল, ও বেকজানী। সে না জানি কি রকম জীব, ছেলেরা মন খুলে মিশত না, কপট কৌতূহলে উকি-ঝুঁকি মারত। মাস্টার-পণ্ডিতরা ও টিটকিরি দিতে ছাড়তেন না। কোথ ক্লাসে যখন পড়ে তখন ওর খাতায় কবিতা আবিষ্কার করে ওর পাশের এক ছাত্র পণ্ডিতমশায়ের হাতে চালান করে দেয়। পড়ে পণ্ডিতমশায় সরাসরি চটে উঠতে পারেন না, ছন্দে-বন্ধে কবিতাটি হয়তো নিখুঁত ছিল। শুধু নাক সিঁটকে মুখ কুঁচকে বলে উঠেন : ‘এতে যে হোদের রবিঠাকুরের ছায়া পড়েছে।’ কেন, মাইকেল হেম নবীন পড়ে পাবেন না? রবিঠাকুর হল কিনা কবি। তার আবার কবিতা। আহা, লেখার কি নমুন। রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়, রাজার মেয়ে যেত তথা—’ ‘তথা’—কথাটা এমন মুখভঙ্গি কবে ও হাত নেড়ে উচ্চারণ করলেন যে ক্লাসভিত্তি ছেলেরা হেসে উঠল।

মেজবৌদি গোকুলের জন্তে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। কি করে খবর পেয়েছেন তিনি গোকুল আজ সারাদিন ধরে উপবাসী। বাড়িতে ফিরতে তার দেরি হয় বলে সে সাফাই নিয়েছে বাইরে খেয়ে-আসার। তার মানে, প্রায় দিনই একবেলা অভুক্ত থাকবার। কোনো-কোনোদিন আরো নির্জন হবার অভিলাষে সে বলত, চলো, এসপ্ল্যানেন্ড পর্যন্ত হাটি, তার মানে তখনো বুঝতে পারিনি পুরোপুরি। তার মানে, গোকুলের কাছে পুরোপুরি ট্র্যামভাড়া নেই।

অথচ এই গোকুল কোন-কোনদিন নূপেনের পাশ ঘেঁসে বসে অলঙ্ঘ্য তার বুক-পকেটে টাকা ফেলে দিয়েছে যখন বুঝেছে নূপেনের অভাব প্রায় অভাবনীয়।

অবচ যখন কথা বলতে যাও গোবিন্দের মুখে হাসি আর বসিকতা ছাড়া কিছু
পাবে না। হয় করে যখন সে পূর্ববাংলার কবিতা বলত তখন অপরূপ
শোনাতে :

পদ্মা-পাইছা রাইয়তগ লাঠি হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাত মাখেন পাতে ।
মাখা ভাতটি না ফুরাতেই ভাইকা পড়ে ঘর
মানকির ভাত কোছে ভইরা খোজেন আরেক চর ।
টানদেশী গিরন্তগ বাপকালাত্ৰা ঘটি
আটুজলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি ।
আপনি পাও মেইল্যা বইস্তা উকায় মারেন টান,
এক প্রহরের পথ ভাইকা বউ জল আনবার ঘান ।

সাতাল নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে একদা একতুরারী এক চিলতে ঘরে
“কল্লোলে”র পাবলিশিং হাউস খোলা হয়। আপিস থাকে সেই পটুয়াটোলা
লেনেই। তার মানে সন্ধ্যা দিকের তুমুল অডোটা বাড়ির বৈঠকখানায় না
হয়ে হাটের মাঝখানে দোকানঘবেই হওয়া ভালো। সেই চিলতে ঘরে সকলের
বসবার জায়গা তত না, ঘর ছাপিয়ে ফুটপাতে নেমে পড়ত। সেই ঘরকেই
নজরুল বলেছিল “একগাধা প্রাণভরা একমুঠো ঘর।” সেই একমুঠো ঘরেই
একদিন মোহিতলাল এসে আবির্ভূত হলেন। আমরা তখন এক দিকে যেমন
ষতীন সেনগুপ্তের পেসিমিজম-এ মশগুল, তেমনি মোহিতলালের ভাবন
বলিষ্ঠতায় বিমোহিত। মোহিতলালকে আমরা ভুলে নিলাম। তিনি এসেই
কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন, আর দে কি উদাত্তনিশ্বন মধুর আবৃত্তি।
কবিতার গভীর রসে সমস্ত অসুভূতিকে নিষিক্ত করে এমন ভাবব্যাঞ্জক আবৃত্তি
শুনি নি বহুদিন। দেবেন সেনই আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন। আজও তাঁর
সেই ভাবগদগদ কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, দেখছি তাঁর সেই অর্ধমুদ্রিত চক্কর যক্ষ
শুভ্ররেখা।

চাহিনা না আনার যেন অভিমানে ক্রুর
আবক্তিম গণ্ড গুঠ ব্রজসুন্দরীর,
চাহিনাক ‘সেউ’ ঘেন বিরহবিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন রুচির।

একটুকু রসেভরা চাহি না আঙুর
 সলজ্জ চুষন যেন নববধূটির,
 চাহি না 'সন্ধ্যা'র স্বাদ, কঠিনে মধুর
 প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির।

কল্লোল-পাবলিশিং হাউস থেকে প্রথম বই বেরোয় সুবোধ রায়ের
 “নাট্যমন্দির”—তিনটি একাক নাটিকার সংকলন। আর চতুষ্কলা ক্লাবের খানকর
 পুথোনো বই, “ঝড়ের দোলা” বা “রূপরেখা”—তার বিষয়বিত্তব। আর,
 সর্বোপরি, নজরুলের “বিষের বাঁশী” জমায় বেথে হুহ করে যে বেচতে পারছে
 এই তার ভবিষ্যতের ভরসা।

তেরোশ একত্রিশ সালের পূজার ছুটিতে কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাই।
 সেখানে দীনেশদা আমাকে চিঠি লেখেন :

সোমবার

৩রা কাতিক, ১৩৩১

সন্ধ্যা ৭-৩০ টা

পথের ভাই অচিন্ত্য,

কিছুদিন হল তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তোমাকে
 ছাড়া আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু যখন ভাবি হয়ত ওখানে থেকে তোমার
 শরীর একটু ভালো হতে পারে তখন মনের অতখানি কষ্ট থাকে না।

হয়ত এরই মধ্যে পবিত্র ও ভূপতির বড় চিঠি পেয়েছ। কি লিখেছে তারা
 তা জানি না, তবে এটা শুনেছি যে পত্র দু'খানাই খুব বড় করে লিখেছে।

আজ সারাদিন খুব গোলমাল গেল। এই কিছুক্ষণ আগে মানুষের সঙ্গে
 কথাবার্তা আমার শেষ হল। শৈল, মুরলী, গোকুল, নৃপেন, পবিত্র, ভূপতি
 প্রভৃতি কল্লোল আকিস ছেড়ে গেল। আমি স্নান সেরে এসে নিরাসায় তাই
 তোমার কাছে এসেছি। এইটুকু আমার সময়—কিন্তু তাও কেউ কেউ আসেন
 কিংবা মনের ভিতরেই গোলমাল চলতে থাকে।

কাল রবিবার গেল, মুরলীদার বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা জোর আড্ডা বসেছিল।
 চা, পান, গান, যান, অভিমান সবই খুব হল। বীরেনবাবু ও জানাঞ্জন পাল
 মহাশয়রাও ছিলেন।

“রূপরেখা”র বেশ একটা রিভিউ বেরিয়েছে Forward-এ কালকেই।

‘নাট্যমন্দির’ও আজ বেরিয়ে গেল। এবার তোমাদের পালা।’ একখানা কয়ে সবাইকার বের করতেই হবে। কেমন? অন্তত একশটি টাকা আমাকে প্রথম এনে দাও, আর তোমাদের লেখাগুলি, তা হলেই কাজ শুরু করে দিতে পারি।

প্রেমেন এসেছে ফিরে, তাকেও জোর দিয়েছি। সে তো একটু seriously-ই ভাবছে।

শৈলজার “রাঙাশাড়ী” খানা যদি পাওয়া যায়—যেতেও পারে—তা হলে তো কপাই নেই।

তোমার “চাষা-কবি” এখনও পেলাম না কেন? এতই কি কাজ যে কপি করে আজও পাঠাতে পারলে না? তোমার কবিতাটিই যে আগে যাবে, সুতরাং কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিত করবে। এবারে প্রেমেনের “কমলা কেবিন”টা ফিরিয়ে পেলে হয়তো যাবে। তুমি না থাকাতে তার যথেষ্ট একলা লাগছে বুঝতে পারি। সত্যি, বেচারার একটা আন্তানা নেই যে খাবে থাকবে।

কিন্তু এরকমই থাকব সব? না, তা হবে না—এই মাটি খুঁড়ে তা হলে শেষ চেষ্টা করে যাব। আমরা তো সইলাম আর বুঝলাম কিছু-কিছু। কিন্তু যে কষ্ট নিজেরা পেলাম তা কি পরকে জেনে-শুনে দিতে পারি? ঐ সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাগত অযুতসংখ্যক কালকের মানুষ্যের দল, তারা এসেও কি এই ভোগই ভুগবে? আমাদের এই সত্যের নির্বাক যুদ্ধ জয় করে রাখবে বাংলার প্রাণের প্রান্তে-প্রান্তে সবুজ পাতার বাসা। নীডহাবা পথহারা নীল আকাশের রং-লাগানো নীল পাখির দল একেবারে সোজা সবুজ পাতার বাসাঘ গিয়ে আশ্রয় নেবে। পথের বাকের বিরাট আয়ুর্বদ্ধ বটগাছ দেংবে বাংলার প্রান্ত হতে প্রান্তে রুকরুপের বন্ধভেদ করে ফুটে আছে অপরাজিতার দল।

কি জানি কতদূর হবে। যদি না থাকি।

আহা, বাচুক তারা যারা আসছে। বেচারারা কিছু জানে না, বিশ্বাস ভাঙিয়ে লাভা মনের সপ্তদা কিনতে গিয়ে কিনছে কেবল ফুটো আর পচা! তারা যে তখন কাঁদবে। আহা, যদি তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে সে ভেঙ্গে পড়বে, পৃথিবীকে অভিষেক দিয়ে ফেলবে? না, না, তাদের জন্ত কিছু রেখে যেতে পারব না আমরা ক’জনে?

পলিটিক্স বুঝি না, ধর্ম মানি না, সমাজ জানি না—মানুষের মনগুলি যদি লাভা থাকে—বাস, তা হলেই পরমার্থ।

তোমাকে একটা কথা বলছি কানে-কানে। মনটার জন্ত একটা চাবুক কেনো। চাবুক মেরো না বেন কখনও, তা হলে বিগড়ে যাবে। মাঝে মাঝে কেবল সপাং-সপাং করে আঙুরাঙ্গ করবে—মনের ঘরের যে যেখানে ছিল দেখবে সব এসে হাজির। ভয়ও না ভাঙে, ভয়ও না থাকে—এমনি করে রাখতে হবে।

আর একটা কথা—ভালবাসাটাকে খুঁজে বেড়িও না। ওটা ঘোড়ার পায়ের নালও নয় আর মাটির তলায় মোহরের কলসীও নয়। হাতড়ে চললেই হৌচট খাবে। তবে কোথায় আর কবে সত্যিকারের ভালবাসার মত ভালবাসা-টুকুকে পাবে তা জানবার চেষ্টাও করো না। খানেখানে পাওয়া যায়—সবটুকু রসগোল্লার মত একজায়গায় তাল পাকিয়ে রসের গামলায় ভালে না।

ঝড়ের দিনে শিল কুড়োয় না ছেলেমেয়েরা? কুড়োতে-কুড়োতে দু একটা মুখেই দিয়ে ফেলে আর সব জড় করে একটা তাল পাকায়, সেটা আর চোখে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর দেখে। কত রঙের খেলা ঘুরতে থাকে—আর মাঝে-মাঝে ঠাণ্ডা হাত নিজেই কপালে চোখে বুলোয়। কুড়োবার সময়ও ঝড়ের যেমন মাতন, যারা শিল কুড়োয় তাদেরও তেমনি ছুটোছুটি হটগোল! কোনটা ঠকাস করে মাথায় পড়ে, কোনটা পায়ের কাছে ঠিকড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে যায়, কোনটা বা এক ফাঁকে গলার পাশ দিয়ে গলে গিয়ে বৃকের মধ্যে ঢুক পড়ে। কুড়োনো শেষ হলে আর গোল থাকে ন', সব চূপচাপ করে তাল পাকায় আর নিজের সংস্থান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে।

বিয়ে করতে চাও? চাকরি দেখ। অস্ততঃপক্ষে দেড়শ টাকার কম হবেই না। তাও নেহাৎ দরিদ্রমতে—প্রেম করা চলবে না। যদি সমাজকে ভিড়িয়ে যেতে চাও—তাহলে অস্ততঃ দুশো আড়াই শো।

শরীরের খবর দিও। লেখা immediately পাঠাবে। দেয়ি করোই না। ভালবাসা জেনে'।

তোমাদের দীনেশদা

এর দিন কয়েক পরে গোকুলের চিঠি পাই :

‘কল্লোল’

১০-২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

১১ই কাতিক ১৩১

স্নেহাঙ্গদেয়

তোমার চিঠি যখন পাই তখন উত্তর দেবার অবস্থা আমার ছিল না।

অবস্থা বন্ধ করে পেলাম তখন মনে হল—কি লিখব? লেখবার কিছু আছে কি? চোখের সামনে বসে পবিত্র পাতার পর পাতা তোমার লিখেছে দেখেছি, ভূপতি নাকি এক কথ্য ওজনের এক-চিঠি লিখেছে, দীনেশও সম্ভবত তাই। আর কে কি করেছে তা তুমিই জান, কিন্তু আমার বেরাদবি আমার কাছেই অসহ হয়ে উঠছিল। তাই আজ ভোরে উঠেই তোমাকে লিখতে বসেছি। আমার শরীর এখন অনেকটা ভাল। তোমার প্রথমকার লেখা চিঠিগুলো থেকে যেকথা আমার মনে হয়েছিল তোমার পবিত্রকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে ঠিক সেই স্তরটি পেলাম না। কোথায় যেন একটু গোল আছে। প্রথমে পেয়েছিলাম তোমার জীবনের পূর্ণ বিকাশের আভাস, কিন্তু দ্বিতীয়টা অত্যন্ত melodramatic. দেখ অচিন্ত্য, যে বলে ‘দুঃখকে চিনি’, সে ভারী ভুল করে। ‘অনেক দুঃখ পেয়েছি জীবনে’ কথাটার স্তর অত্যন্ত সংকীর্ণ। মনের যে কোন বাসনা ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অভূত থাকলেই যে অশান্তি আমরা ভোগ করি তাকেই বলি ‘দুঃখ’, কিন্তু বাস্তবিক ও দুঃখ নয়। যে বৃকে দুঃখের বাসা সে বৃক পাথরের চেয়েও কঠিন, সে বৃক ভাঙ্গে না টলে না। দুঃখের বিষদাত ভেঙ্গে তাকে নির্বিঘ্ন করে যে বৃকে রাখতে পারে সেই যথার্থ দুঃখী। ভিখারী, প্রতারিত, অবমানিত, ক্ষুধার্ত—এরা কেউই ‘দুঃখী’ নয়। খ্রীষ্ট দুঃখী ছিলেন না, তিনি চিরজীবন চোখের জল ফেলেছেন, নালিশ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, অভিমান করেছেন। গান্ধী যথার্থ দুঃখী। এবার ক্ষুধা, অশান্তি, বাথার প্রত্যেকটি stage-এর সঙ্গে মিলিয়ে নাও, বুঝতে পারবে দুঃখ কত বড়। সবাই যে কবি হতে পারে না তার কারণ এই গোড়ায় গলদ। অত্যন্ত promising হয়েও melodramatic monologue-এর অশান্তির ফর্দ করে যায়, তাই সেটাকে রাখব বলে শখের দুঃখ। যাক বাজে কথা, কতকগুলো খবর দিই।

হঠাৎ কেন জানি না পুলিশের কুপাদৃষ্টি আমাদের উপর পড়েছে, আমাদের আপিস দোকান সব থানাতল্লাস হয়ে গেছে, আমরা সবাই এখন কতকটা নজরবন্দী—1818 Act 3’-তে।

নূপেন বিজলী আপিসে কাজ করছে। শৈলজার ‘বংলার মেয়ে’ বেরিয়েছে, সে এখন ইকড়ায়। মুরলীর জ্বর হয়েছিল। প্রেমেনের ‘অলমাপ্ত’ আমি পড়েছি, সম্ভবত পৌষ থেকে ছাপবে। ভূপতি এখন পুরুলিয়ায় ‘পথিক’ ছাপা আরম্ভ হয়েছে, 1st form-এর অর্ডার দিয়েছি। আমাদের চিঠি না পেলেও মাঝে মাঝে যেখানে হোক লিখো। শুভ ইচ্ছা জেনো ইতি। শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

নজরুলের ‘বিবের বাঁশী’র লক্ষ্যই পুলিশ হানা দিয়েছিল! মনে করেছিল সবাই এরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী। ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি। তখনো আগেননি তারক সাধু।

“কাগজে পড়েচো কলকাতার ধরপাকড়ের ধুম লেগে গেছে।” পবিত্র লিখল : “কাজীর বিবের বাঁশী নিষিদ্ধ হয়েছে। কল্লোলের আগিস ও দোকান থানা-তল্লাসী হয়েছে। সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড আশঙ্কাজীতি এসে গেছে। লি ফ্লাই ডি-র উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। কলকাতা শহরটাই ভোলপাড় হয়ে গেছে। যেখানেই যাও চাপাগলায় এই আলোচনা। যারা ভুলেও কখনও রাজনীতির চিন্তা মনে আনে নাই তাদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে গেছে—”

সেই সাড়াটা “কল্লোলের” লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিকল্পবাদ। নতুন দ্রোহবাণী। সত্যভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ হুবির সমাজের বিপক্ষে।

আট

“কল্লোল”কে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাবারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ “কল্লোলের” বিকল্পতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভক্তি ও স্বাক্ষিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাবকে গতি ও ভাবকে ছাতি দেবার জন্তে ছিল শব্দ-ত্বজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনামূলক বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্কার। যার ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে—আরামরমণীয় পথ—যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু “কল্লোলের” পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।

কেমনা তার সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্ততার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি। যা আছে তার চেয়েও আরো কিছু আছে, বা যা হয়েছে তা এখনো পুরোপুরি হয়নি তারই নিশ্চিত আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের প্রথম সহায় হলেন প্রথম চৌধুরী। সময় কিং লব্ধ ও সজীবের যিনি উৎসাহস্থল। মাঝে-মাঝে সকালবেলা কেউ কেউ যেতাম আমরা তাঁর বাড়িতে, মে-ফেরারে। “কল্লোলের” প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নপ্রসন্ন ছিলেন বলেই যখনই যেতাম সর্বাধিক হতাম। প্রতিভাভাসিত মুখ স্নেহে লুকোমল হয়ে উঠত। বলতেন, প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা—শ্রোত মানাই শক্তি। গোড়ার আবিলতা তো থাকবেই, শ্রোত যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে নিজের গভীরতাকে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, লিখে যাব আমরণ। অমন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বসে অমন প্রতিজ্ঞা করার সাহস আসত।

বলতেন, ‘এমন ভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব।’

‘আমার সামনে আর কেউ বসে নেই?’ চমকে উঠতাম।

‘না’।

‘রবীন্দ্রনাথ?’

‘রবীন্দ্রনাথও না। তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধে প্রত্যেকে তোমরা একা।’

মনে রোমাঞ্চ হত। কথাটার মাঝে একটা আশীর্বাদের স্বাদ পেতাম।

বলেই ফের জের টানতেন : ‘নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।’ এ কথা ভারতচন্দ্র লিখেছিল। চাই সেই শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব, সেই অনন্তপূর্বতা। যদি সর্বক্ষণ মনে কর, সামনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তবে নিজের কথা আর বলবে কি করে? তবে তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই ছায়াস্বরূপ করবে। তুমি ভাববে তোমার পথ মুক্ত, মন মুক্ত, তোমার লেখনী তোমার নিজের আজীবন।’

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এগেছিল “কল্লোল”। সরে এগেছিল অগজাত ও অবজাত সমুদ্রের জনতায়। নিয়গত মধ্যবিত্তদের সংসারে, কল্লোলকূটিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রভাবিত ও পরিভ্রান্তের এলেকায়।

প্রথম চৌধুরী প্রথম এই সরে-আসা মাহুত। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মাহুত নজরুল।

যেমন লেখার তেমনি পোশাকে-আশাকেও ছিল একটা রঙিন উচ্ছ্বলতা।

মনে আছে, অভিনবদের অধীকারে আমাদের কেউ-কেউ তখন কৌচা না বুঝিয়ে কোমরে বাঁধ দিয়ে কাপড় পরতাম—পাড়-হীন ধান ধুতি—আর পোশাকের পুরাতন দাবিডা প্রকট হয়ে থাকলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। নূপেন তো মাঝে মাঝে আলোয়ান পরেই চলে আসত। বস্তুত পোশাকের দীনতাটা উদ্ভিগ্নই উদাহরণ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু নজরুলের ঔদ্ধত্যের মাঝে একটা সমারোহ ছিল, যেন বিহ্বল, বর্ণাঢ্য কবিতা। গায়ে হলদে পাঞ্জাবি, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনি। কিংবা পাঞ্জাবি গেরুয়া উড়ুনি হলদে। বলত, আমার মহাস্ত্র হবার দরকার নেই, আমার বিভ্রান্ত করবার কথা। জমকালে পোশাক না পরলে ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি করে?

মিথ্যে কথা। পোশাকের প্রগলভতার দরকার ছিল না নজরুলের। বিস্তীর্ণ জনতার মাঝেও সহজে চিহ্নিত হত সে, এত প্রচুর তার প্রাণ, এত রোধবদ্ধহীন তার চাঞ্চল্য। সব সময়ে উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের টিচ্ছলতায়। বড়-বড় টানা চোখ, মুখে সরল পৌরুষের সঙ্গে শীতল কমনীয়তা। দূরে থাকলেও মনে করিয়ে দেবে অন্তরের চিরন্তন মাহুত বলে। বড় শুধু পোশাকে কি, বড় তার কথায় তার হাসিতে তার গানের অভ্যস্ততায়।

হরিহর চন্দ্র তখন ‘বিশ্বভারতী’র সহ-সম্পাদক, ‘কর্নওয়ালিশ’ স্ট্রীটে তার আপিসের দোতলায় ফোর আর্টস ক্লাবের বার্ষিক উৎসব হচ্ছে। হরিহর আর “কল্লোল” প্রায় হরিহর আত্মার মত। সুগৌর স্তন্যর চেহারা—পরিহাসচ্ছলে কেউ কেউ বা ডাকত তাকে রাঙাদিদি বলে। তার স্ত্রী অশ্রু দেবী আসলে কিন্তু আনন্দ দেবী। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ‘আনন্দ মেলা’ নিয়ে যেতে থাকত। চোট বড় ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধূলি ও নাচগানের আসরই নামাস্তরে ‘আনন্দ মেলা’। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, রামমোহন লাইব্রেরিতে বা মার্কাস স্কয়ারে এই মেলা বসত, কল্লোলের দল নিমন্ত্রিতদের প্রথম বেকিতে। কেননা হরিহর কল্লোল-দলের প্রথমগতদের একজন, তাই “কল্লোল”—পরম্পরাগত নামধেয়। গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, প্রফ দেখে দিয়ে কত ভাবে দীনেশ-গোকুলকে সাহায্য করত ঠিক-ঠিকানা নেই। ব্যবহারে খ্রীতির প্রলেপ সৌজন্তের স্নিগ্ধতা—একটি শাস্ত্র দৃঢ় স্বস্থ মনের সৌরভ ছড়াত চারদিকে।

সেই হরিহরের ঘরে সভা বসেছে। দীর্ঘদীপিতদেহা কয়েকজন সুন্দরী মহিলা আছেন। গান হচ্ছে মধুকণ্ঠে। এমন সময় আবির্ভাব হল নজরুলের। পরনে সেই বড়ের ঝড়ের পোশাক। আর কথা কি, হার্মোনিয়ম এবার নজরুলের

একচেটে। নজরুল টেনে নিল হার্মোনিয়ম, মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললে,
'কমা করবেন, আপনারা স্বর, আমি অস্বর।'

হেসে উঠল সবাই। অস্বরের স্বরে স্বর ভরে উঠল।

যতদূর মনে পড়ে সেই সভায় উমা গুপ্ত ছিলেন। যেমন মিঠে চেহারা
তেমনি মিঠে হাতে কবিতা লিখতেন তিনি। তিনি আর নেই এই পৃথিবীতে।
জানি না তাঁর কবিতা কটিও বা কোনখানে পড়ে আছে।

এই অস্থির এলোমেলোমি নজরুলের শুধু পোশাকে-আশাকে নয়, তার
লেখায়, তার সমস্ত জীবনযাপনে ছড়িয়ে ছিল। বস্ত্রার তোড়ের মত সে লিখত,
চেয়েও দেখত না সেই বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে। যা মুখে
আসত তাই যেমন বলা তেমনি যা কলমে আসত তাই সে নির্বিবাদে লিখে যেত।
স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার জন্তে বিচার করে দেখত না বর্জন-মার্জনের দরকার
আছে কি না। পুনর্বিবেচনায় সে অভ্যস্ত নয়। যা বেরিয়ে এসেছে তাই
নজরুল, 'কুবলা খান'-এ যেমন কোলরিজ। নিজের মুখে কারণে-অকারণে সে
কো ঘবত খুব, কিন্তু তার কবিতার এতটুকু প্রসাধন করতে চাইত না। বলত,
অনেক ফুলের মধ্যে থাক না কিছু কাঁটা, কটকিত পুষ্পই তো নজরুল
ইসলাম। কিন্তু মোহিতলাল তা মানতে চাইতেন না। নজরুলের গুরু
ছিলেন এই মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান
নজরুলকে। দেখেন উদ্বেলতা যেমন আছে আবিলতাও কম নয়। শ্রোত-
শক্তিকে ফলদায়ী করতে হলে তাঁর বন্ধন আনতে হবে, আনতে হবে সৌন্দর্য
আর সংঘম, জাগ্রত বুদ্ধির বশে আনতে হবে ভাবের উদ্যমতাকে। এই
বুদ্ধির দীপায়নের জন্তে চাই কিছু পড়াশোনা—অনুভূতির সঙ্গে আলোচনার
আগ্রহ। নিজের পরিবেষ্টনের মাঝে নিয়ে এলেন নজরুলকে। বললেন, পড়ো
শেলি-কীটস, পড়ো বায়রন আর ব্রাউনিং। দেখ কে কি লিখেছে, কি ভাবে
লিখেছে, মনে স্বৈর্য আনো, হও নিজে নিজের সমালোচক, কল্পনার সোনার
সঙ্গে চিন্তার সোহাগা মেশাও। “দে গরুর গা ধুইয়ে—” নজরুল ধোড়াই কেয়ার
করে ‘লেখাপড়া’। মনের আনন্দে লিখে যাবে সে অনর্গল, পড়বার বা বিচার
করবার তার সময় কই। খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মনের আনন্দে তৈরি করে ছেড়ে
দিয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রকে, পড়ুয়া জ্যোতিষীরা তার পর্যালোচনা করুক। সেও
সৃষ্টিকর্তা।

ভাবের ঘরে অবনিবনা হয়ে গেল। কোনো বিশেষ এক পাড়া থেকে
নজরুল-নিলা বেরতে লাগল প্রতি সপ্তাহে। ১৩৩১-এর কার্তিকেয় “কল্লোলে”
নজরুল তার উত্তর দিলে কবিতায়। কবিতার নাম “সর্বনাশের ঘণ্টা” :

“রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা,
রুধির-নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব-ধ্রুবা।
হে দ্রোণাচার্য্য ! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দেব-পক্ষিল হিয়া হতে তব খেঁত পঙ্কজ মাগে
শিল্প তোমার ; দাও গুরু দাও তব রূপ-মনী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদম্বতার গ্লানি।...
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা
যে ভোগানন্দ দাসেদের গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদের বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি,
বীদরে তুমি ঘৃণা করে ভালবাসিয়াছ বাদরামি।
হে অঙ্গ-গুরু : আজি মম বুকে বাজে শুধু এই বাথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু হলে কুক্কুদ-কুরুনেতা।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দারী
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্মদৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী !
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,
কোথা সে দীঘির উজ্জল জল কোথা সে কমল বাঙা,
হেরি শুধু কাদা, জকায়েছে জল, সরসীর বীধ ভাঙা।...
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমাতে ফেলেছে নরকে টানি
স্বপ্নার তিলক পরাল তোমাতে স্তাবকের শয়তানী !
যাহারা তোমাতে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি
তাহাদের হানে অতি লজ্জায় বাথা আজ তব স্মৃতি।...
আমায়ে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে,
কালীয়ধমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ তো তোমাতে দহনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জলুনির চোটে। তুমি পাও কোন স্বধ

দক্ষমুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি,
 শিবসুন্দর সত্য তোমার লভিল এ কি এ গতি ?...
 তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে
 শতদলদলে তুমি যে ময়াল খেত সায়রের জলে ।
 ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
 নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন—
 উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাধী,
 ঐ হের শিরে চকর মারে বিপ্লব-বাজপাখী !
 অকু হস্মো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ,
 ধনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ ।
 দোতলায় বসি উতলা হস্মো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী
 এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম হানি ।...
 অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
 শোপীনাথ ম'ল ? সত্য কি ? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি
 বরেন ঘোষের জীপাস্তর আর মিছাপুরের বোমা
 লাগ বাংলার হুমকানী—ছি ছি এত অসত্য ওমা,
 কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল !
 সখী গো আমায় ধর ধর ! মাগো কত জানে এরা ছল ।...
 এষ্ট শয়তানী ক'রে দিনরাত বল আটের জয়,
 আট মানে শুধু বাদরামি আব মুখ-ভ্যাঙচানো নয় ।...
 তোমার আটের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না ওরা
 প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আটের আটশালা হবে নেড়া ।...
 যত বিদ্রপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য বাণী
 কাকুর প চেটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাখি হানি
 কাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত
 ধরা মার বুক আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত ।
 আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
 ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস ।”

মনে আছে এই কবিতা নজরুল কল্লোল-আপিসে বসোলিখেছিল এক বৈঠকে ।
 টিক কল্লোল-আপিসে হয়তো নয়, মণীন্দ্রর ঘরে । মণীন্দ্র চাকী “কল্লোলের” একক

কর্মচারী। নীরব, নিঃসঙ্গ। মুখে একটি হৃৎকর্ষক নির্মল হাসি, অন্তরে ভাবের স্বচ্ছতা। ঠিকমত মাইনে-পত্র পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন অভাবের রুদ্ধ রাজপথ দিয়ে হাঁটছে। অর্ধচ একবিন্দু অভিযোগ নেই, অবাধ্যতা নেই। ভাবখানা এমনি, “কল্লোলের” জ্ঞান সেও তপশ্চারণ করছে, হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে দারিদ্র্যের নির্দয়তাকে। লেখকরা যেমন এক দিকে সেও তেমনি অপরেক দিকে। সে কম কিসে! সে লেখে না বটে কিন্তু কাজ করে, সেবা করে। সেও তো এক নৌকোর সোয়ার।

খোলার চালে ঘুপসি একখানা বিছিন্ন ঘর এই মণীন্দ্রর। কল্লোল-আপিসের সঙ্গে শুধু এককালি ছোট একটা গলির ব্যবধান। মণীন্দ্রর ঘর বটে, কিন্তু যে-কাউকে সে যে-কোনো সময় তা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। নিয়মিত সময়ে নজরুল কবিতা লিখে দিচ্ছে না, বন্ধ করো তাকে সেই ঘরে, কবিতা শেষ হলে তবে খুলে দেওয়া হবে ছিটকিনি। কাশী থেকে দৈবাৎ সুরেশ চক্রবর্তী এসে পড়েছে, থাকবার আরগা নেই, চলে এস মণীন্দ্রর ঘরে। প্রেমেন এসেছে ছুটিতে, মেসের দরজা বন্ধ তো মণীন্দ্রর দরজা খোলা। ছপুরবেলা ত্রে খেলন্তে চাও—সেই কালো বিবিগছান কালান্তক খেলা—চলে যাও মণীন্দ্রর আস্তানায়। চারজনের মামলায় বোলো জন মোক্তারি করে হুল্লোড় বাধাও গে। কখন হঠাৎ ভনতে পাবে তোমার পাশের থেকে আস্ত বোম্ব ল্যাফিয়ে উঠেছে তারখেরে : ‘মাহাহাহা, করস কি, দারর উপর তিরি মারিয়া দে—’

গুপ্ত ফ্রেগুস-এর আস্ত ঘোষ। কি স্ববাদেরে যে “কল্লোলে” এল কে বলবে। কিন্তু তাকে ছাড়া কোনো আড্ডাই যেন দানা বাঁধে না। একটা নতুন স্বাদ নিয়ে আসত, ঝুঁ ও দৃষ্ট একটা কাঠিগের স্বাদ। নিভীক সারল্যের দারুচিনি। আস্তকে কোনদিন পাঞ্জাব গায়ে দিতে দেখছি বলে মনে পড়ে না—শার্ট-কোট তো স্বদরপরাহত। চিরকাল গোজ-গায়েই আনাগোনা করল, খুব বেশি শালীনতার প্রয়োজন বোধ করলে পাঞ্জাবিটা বড়জোর কাঁধের উপর হাঁপন করেছে। আদর্শের কাছে অটলপ্রতিজ্ঞ আস্ত ঘোষ, পোশাকেও দৃঢ়পিনক। অল্পেই সন্তুষ্ট তাই পোশাকেও যথেষ্ট। তার জীতিত উৎসাহই হচ্ছে তিরস্কারে—আর সে কি ক্রমাহীন নির্মম তিরস্কার! কিন্তু এমন আশ্চর্য, তার কশাঘাতকে কশাঘাত মনে হত না, মনে হত বসানঘাত,—যেন বিদ্রোহের চাবুক দিয়ে মেঘ তাড়িয়ে রোদ এনে দিচ্ছে। খাঁটি, শক্ত ও অটুট মানুষ্যের দরকার ছিল “কল্লোলে”। আস্ত ঘোষের গেঞ্জিও যা, দীনেশরজনের ফ্রিল-দেয়া হাভা-ওয়াল পাঞ্জাবিও

তাই। দুইই এক ছুঁনিের নিশানা। আমাদের তখন এমন অবস্থা, একজনকে একা পুরো আন্ত একটা সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কাঁচি, এবং আরো কাঁচি চললে পাসিং শো। সিগারেট বেশির ভাগ জোগাত অজিত সেন, জলধর সেনের ছেলে। “কল্লোলের” একটি নিটুট খুঁটি, তক্তপোশের ঠিক এক আয়গায় গ্যাট-হয়ে-বসা লোক। কথায় নেই হাসিতে আছে, আর আছে সিগারেট-বিতরণে। কুঠা আছে একটু, কিন্তু কুণপতা নেই। সবাই দাদা বলতাম তাকে। আশ্চর্য্য, জলধর সেনকেও দাদা বলতাম। আহ. সি. এসের ছেলে আই. সি. এক হয়েছে একাধিক, কিন্তু দাদার ছেলের দাদা হয়না এই প্রথম। যেমন কুল-গুরু ছেলে কুলগুরু। নিয়ম ছিল সিগারেট টানতে গিয়ে যেই গায়ের লেখার প্রথম অক্ষরটুকু এসে ছোঁবে অমনি আরেকজনকে বাকি অংশ দিয়ে দিতে হবে পরবর্তী লোক জিতল বলে সন্দেহ করার কারণ নেই, কারণ শেষ দিকের খানিকটা কেলা যাবে অনিবার্য। তবে পরবর্তী লোক যদি পিন ফুটিয়ে ধরে টানতে পারে শেষাংশটুকু, তবে তার নির্ঘাৎ জিত।

এ দিনের দৈন্তের উদাহরণস্বরূপ দুটো চিঠির টুকরো তুলে দিচ্ছি। একট’ প্রেমেনের, আমাদের লেখা :

“কিন্তু ছুঁখের বা ছুঁখের বিষয় হোক Test এ পাশ হয়ে গেছি সম্মানে। এখন কি এর টাকা জোগাড় করে উঠতে পারছি না। তাই আজ সকালে তোকে চিঠি লিখতে বসব এমন সময় তোম চিঠি এস। এবার তুই কোন গুরু দেখাতে পার না। যা করে হোক, দশটা টাকা পাঁচ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিবি। আমি পরে কলকাতায় গিয়ে শোধ করব। সত্যি জানিস Test-এর যি দিতে পারছি না। কলকাতায় দ্বাদশমার কাছে একটি পরমা নেই, এখন বুডকে বিভাষিত করতে পার না। এ সম্বন্ধে আর বেশ কিছু লিখলাম না, তোম য’ সাধ্য তা তুহ করাব জানি। তোম ভরসা রইলুম।

Final এ পাশ হবে কিনা জানি না, ছুটি য একেবারে নেব, খাব কি? একট, কথা আমি ভালোরকমেই জানি যে দার্শন্য সমস্ত idealismকে স্তাক্ষে মায়তে পারে। আমি বডলোক হতে মোটেই চাহ না, কিন্তু অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম আর সাহিত্যসৃষ্টি এই দু’কাজ একসঙ্গে করার মত প্রচুর শক্তি আমার নেই। সে আছে যার সেই মহাপুরুষ শৈলজাকে অর্থাৎ মনে-মনে প্রায় প্রণাম করে থাকি।

এবার কলকাতায় গিয়ে যদি গোটা ত্রিশ টাকা মাইনের এমন একটা কাজ

পাই যাতে অতিরিক্ত একঘেয়ে খাটুনি নেই, তা হলে আমি তাতেই লেগে যাব এবং তাহলে আমার একরকম চলে যাবে। কোনো স্কুলের Librarian-মত হতে পারলে মন্দ হয় না। অবশ্য কেরানীগিরি আমার পোষাবে না।

শরীর ভালো নয়। ঢাকার জল হাওয়া মাটি মাহুষ কিছুই ভালো লাগছে না। হয়তো জীবনের উপরই বিতৃষ্ণার এই সূচনা।”

আরেকটা শৈলজার চিঠি, দিনেশরঞ্জনকে লেখা :

বৃহস্পতিবার, বারবেলা

“দাদা দীনেশ,

...হু’দিন আমি পটুয়াটোলার মোড় থেকে ফিরে এসেছি। জানি, এতে আমার নিজের দোষ কিছু নেই, কিন্তু যে পরাজয়ের লজ্জা আমার অষ্টাঙ্গ বেটন করে রয়েছে তার হাত থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাচ্ছি না যে। আমার মত লোকের বই ছাপান যে ততদূর অস্তায় হয়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাই সমস্ত বোঝার তার আপনার ঝাড়ে চড়িয়ে দিয়ে আমি একটুখানি সরে দাঁড়াতে চাই।

এখন কি হয়েছে শুনুন। কাবলিওয়ালার মত তাগাদা দিয়ে বার-লাহেবের কাছে ‘হাসি’ ‘লক্ষ্মীর’ জন্ত ৫০০ পাচ শ’ টাকা আদায় করেছি, তার পরেও শ’ খানেক টাকা বাকি ছিল। এখন তিনি সে টাকা দিতে অস্বীকার করেছেন। কাজেই বোঝা এসে পড়েছে আমার ঝাড়ে। এ নিঃশ্রু ভিখারীর পক্ষে শ’ খানেক টাকার বোঝাও যে ভারী দাদা।...কিন্তু এখন আমি করি কি ? গত ৫ দিন আমি বই লিখে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে উপযাচকের মত একশটি টাকার জন্তে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এ অভাগার দুর্ভাগ্য, কারও কাছ থেকে একটা আশ্বাসের বাণীও আমার ভাণ্ডে জোটেনি। আমি এ অস্বকার আবর্তের মধ্যে পড়ে তাববাব কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার একবার এ সব দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতি দিন। জোটা কতল সতল করে ‘বোম কেদারনাথ’ বলে আমি একবার বেরিয়ে পড়তে চাই। এ সব সর্বনাশা ক’বর্জনার মধ্যে প্রাণ আমার লতাসতাই ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে।...

‘হাসি’ ‘লক্ষ্মীর’ আবেষ্টনের মধ্যে হাত-পা যে বাঁধা হয়ে রয়েছে, তাহ ‘কুছ পরোয়া নেই’ বলতে কেমন যেন সংকোচ হচ্ছে। এ বন্ধন থেকে যদি শনিবার দিন মুক্তি পাই তাহলে বুক ঠুঁকে বলছি—কুছ পরোটা নাই! তাহলে—

সৃষ্টি-স্বপ্নের উল্লাসে।

মুখ হাসে মোর চোখ হাসে আর টগবগিয়ে খুন হাসে।

লিখেছেন,—হাসছ তো শৈলজা? আঃ, কি আর বোলব ভাই, এমন
সাহসনার বাণী অনেকদিন শুনিনি। আজ আমার মনে পড়ছে—সে আজ বহু-
দিনের কথা—আর একজন, তার নিজের বেদনার্ত বন্ধের গাঢ় রক্তাক্ত কতমুখ
ছ’হাত দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে করেছিল—মেরেদের মত তোমার এ কায়-
সাজে না, তুমি কেঁদো না।...

সে কথা হয়ত আজ ভুলে ছিলুম, ভাই আমার ক্ষণে-ক্ষণে মনে হয়—

হাসি? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়,

পুল্পে কীট সম হেথা তুফা জেগে রয়

মর্মমাকো।

আশা করি সকলেই কুশলে আছেন। আমার ভালোবাসা গ্রহণ করুন।
শনিবার দিন রিক্তহস্তে এ দীন দীনেশের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে—তঁায় অন্তরে
বিরাট ক্খা একটুখানি সহানুভূতির নিবিড় করুণা চাওয়ার প্রত্যাশী।”

এই সময় আমি এক টেক্সট-বুক প্রকাশকের নেকনজরে পড়ি। সেই আমার
পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকার। অন্তরোধ হল, নিচু ক্লাসের স্কুলের
ছাত্রদের জন্যে বাঙলায় একখানা রচনা-পুস্তক লিখে দিতে হবে—হাত্তি-ষোড়
উষ্ট্র-ব্যাক্স নিয়ে রচনা। তন্থা পকাশ টাকা। সানন্দচিত্তে রাজি হয়ে গেলাম,
প্রায় একটা দাঁও পাওয়ার মত মনে হল। লেখা শেষ করে দিলার অল্প কয়েক
দিনের মধ্যে—লেখার চেয়েও লেখা শেষ করতে পারাটাই বেশি পছন্দ হল
প্রকাশকের। টাকার জন্যে হাত বাড়ালে প্রকাশক মাত্র একটি টাকা দিয়েই
কান্ড হলেন। বললাম—বাকিটা? আস্তে আস্তে দেব, বললেন প্রকাশক,
একসঙ্গে একমুঠে সব টাকা দিয়ে দিতে হবে পষ্টাপষ্ট এমন কথা হয়নি
ভালোই তো, অনেক দিন ধরে পাবেন। কিন্তু একদিন এই অনেক দিনের
সাহসনাটা মন মেনে নিতে চাইল না। হস্তদস্ত হয়ে দোকানে ঢুকে বললাম,
টাকা দিন। প্রকাশক মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এত হস্তদস্ত হয়ে
চলেছেন কোথায়? বললাম, খেলা দেখতে। খেলা দেখতে? যেন আশঙ্ক
হলেন প্রকাশক। সরবে হিসেব করলেন শুনিয়ে শুনিয়ে গ্যালারি চার
আনা আর ট্রায় ভাড়া দশ পয়সা। সাড়ে ছ আনাতেই হবে, সাড়ে ছ আনাই
নিয়ে যান! বলে সত্যি-সত্যি সাড়ে ছ আনা পয়সাই কুন দিলেন।

বাঙলা দেশের প্রকাশকের পক্ষে তখন এও সম্ভব ছিল!

সান-ইয়াং-সেন আসত “কল্লোলে”। সান-ইয়াং-সেন মানে আষাঢ়ের সনৎ সেন। সনৎ সেনকে আমরা সান-ইয়াং-সেন বলতাম। ‘অর্ধাঙ্গিনী’ নামে একখানা উপন্যাস লিখেছিল বলে মনে পড়ছে। আধপোড়া চুকট মুখে দিয়ে প্রায়ই আসত আড্ডা দিতে, প্রসন্ন চোখে হাসত। দৃষ্টি হয়তো সাহিত্যের দিকে ভর্ত নয় বরং ব্যবসার দিকে। ‘বাণিজ্যে বান্ধালীর স্থান’ বলে কিছু একটা লিখেও ছিল এ বিষয়ে। হঠাৎ একদিন ‘ফাঁসির গোপীনাথ’ বলে বই বের করে কাও বাধালে। কল্লোল-আপিসেই কাণ্ড, কেননা “কল্লোল”ই ছিল ঐ বইয়ের প্রকাশক। একদিন লাঠি ও লাগ লাগড়ির ঘটায় কল্লোল-আপিস সরগরম হয়ে উঠল। জেলে গোপীনাথের বেয়ন ওজন বেড়েছিল বই-এর বিক্রির অঙ্কটা তেরনি ভাবে মোটা হতে পেল না। সরে পড়ল সান-ইয়াং-সেন। পটাপট ব্যবসাতে গিয়েই বালা নিলে।

কিন্তু বিজয় সেনগুপ্তকে আমরা ডাকতাম ‘কবরাজ’ বলে। শুধু বড়ি বলে নয়, তার গায়ের চাদর-অড়ানো বুড়োটে ভারি ক্রিপনা থেকে। এককোণে গা-হাত পা ঢেকে অঙ্কলড় হয়ে বসে থাকতে ভালবাসত, সহজে ধরা দিতে চাইত না। কিন্তু অন্তরে কাঠকাপণ্য নিয়ে “কল্লোলের” ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারো এখন তোমার মাথা কি। আন্তে-আন্তে সে ঢাকা ধুললে, বেরিয়ে এল গাভীর্ষের কোটর থেকে। তার পরিহাস-পরিভাবে সবাই পুঙ্কলশান্দত হয়ে উঠল। একটি পরিশীলিত সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ মনের পরিচয় পেলাম। তার জন্মত বেশি স্কুমার ভাড়াড়ির সঙ্গে। হয়তো হুঁজনেই কৃষ্ণনগরের লোক এই স্ববাদে। বিজয় পড়ছে সিকম্ব ইয়ার ইংরিজি, আর স্কুমার এম. এস-সি. আর ল। হুঁজনেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। কিংবা হয়তো আরও গভীর মিল ছিল যা তাদের বসকৃত আলাপে প্রথমে ধরা পড়ত না। তা হচ্ছে হুঁজনেরই কান্নিক দিনযাপনের আর্থিক কুচ্ছ।

কঠে-কেশে দিন যাচ্ছে, পড়া-থাকার খরচ জোগানো কঠিন, অবস্থা সংসারের নির্দয় কল্কতায় পড়ে-পড়ে বিপন্ন, কিন্তু, সরসবচনে সুখসৃষ্টিতে আপত্তি কি।

বিজয় হয়তো বললে, ‘স্কুমারটা একটা ফল্‌স্‌।’

স্কুমার পালটা জবাব দিলে, ‘বিজয়টা একটা বোগাস্‌।’

হাসির হুল্লোড় পড়ে যেত। এই সামান্য দু'টো কথায় এত হাসবার কি ছিল আজকে তা বোঝানো শক্ত। অবিশিষ্ট উক্তির চেয়ে উচ্চারণের কারুকার্যটাই বেশি হাসাত তাতে সন্দেহ নেই। তবু আজ ভাবতে অবাক লাগে তখনকার 'দনে কত তুচ্ছতম ভঙ্গিতে কত মহত্তম আনন্দলাভের নিশ্চয়তা ছিল। দু'টি শব্দ—'ইয়ে' আর 'উ'হ',—বিজয় এমন অভূতভাবে উচ্চারণ করত যে মনে হত এত সুন্দর রসাত্মক বাক্য বুঝি আর সৃষ্টি হয়নি। নূপেনকে দেখে 'নেপোয় মায়ে দই' কিংবা আফজলকে দেখে কেউ যদি বলত 'ডাবজল,' নামত অমনি হাসির ধারাবর্ষণ। আজকে ভাবতে হাসি পায় যে হাসি নিয়ে জীবনে তখন ভাবনা ছিল না। বুদ্ধি বিবেচনা লাগত না যে হাসিটা সত্যিই বুদ্ধিমানের যোগ্য হচ্ছে কিনা। অকারণ হাসি, অস্বাভাবিক হাসি। কবিতার একটা ভালো মিল দিতে পেরেছি কিংবা মাথায় একটা নতুন গল্পের আইডিয়া এসেছে এই যেন যথেষ্ট সুখ। প্রাণবহনের চেতনায় প্রতিটি মুহূর্ত স্বর্ণমলকিত। কোন দুর্গম গলির দুর্ভেদ্য বাড়িতে নিভৃত মনের বাতায়নে উদাসীনা প্রেরণী স্বপ্নের সময়ে বসে আছেন এই স্বান দিগন্তের দিকে চেয়ে—এই যেন পরম প্রেরণা। আয়োজন নেই, আড়ম্বর নেই, উপচার-উপকরণ নেই—একসঙ্গে এতগুলি প্রাণ যে মিলেছি এক তীর্থসঙ্গে, জীবনের একটা ক্ষুদ্র ক্ষণকালের কাঠায় খুব ঘোঁঘাঘেঁষি করে যে বসতে পেরেছি একসঙ্গে—এক নিমন্ত্রণে—এই আমাদের বিজয়-উৎসব।

সুকুমারের গল্পে নিয়মিত সংসারের সংগ্রামের আভাস ছিল, বিজয়ের গল্পে বিস্তৃত প্রেম নিয়ে। যে প্রেমে আলোর চেয়ে ছায়া, ঘরের চেয়ে বরের কোণটা বেশি স্পষ্ট। যেখানে কথায় চেয়ে স্তব্ধতাটা বেশি মূখর। বেগের চেয়ে বৈশিষ্ট্য বা ব্যাহতি বেশি সক্রিয়। এক কথায় অপ্রকট অথচ অকণ্ট প্রেম। অল্প পরিসরে সংকট কথায় সূক্ষ্ম আঙ্গিকে চনৎকার ফুটিয়ে তুলতে বিজয়। দুটি মনের দুহিকের দুই জানালা। কখন কোন হাওয়ার একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে তার খেয়ালিপনা। দেহ সেখানে অল্পপস্থিত একেবারে অল্পপস্থিত না হলেও নিরুচ্চার। শুধু মনের ঢেউয়ের ঘূর্ণিপাক। একটি ইচ্ছুক মনের অদ্ভুত ঔদাসীন্য, হয়তো বা একটি উত্তম মনের অদ্ভুত অনীহা। তেরোশ তিরিশের প্রায় গোড়া থেকেই বিজয় এসেছে "কল্লোলে", কিন্তু তার হাত খুলেছে তেরোশ একত্রিশ থেকে। তেরোশ একত্রিশ-বত্রিশে কটি অপূর্ব প্রেমের গল্প সে লিখেছিল। যে প্রেম দূরে দূরে সরে থাকে তার স্মৃতিটাই সুন্দর, না, যে প্রেম কাছে এসে

ধরা দেয় তার পূর্ণতাটাই চিরস্থায়ী—এই জিজ্ঞাসায় তার গল্পগুলি প্রাণশক্তি। একটি তরুণ প্রহরকে মনের নানান আঁকা-বাঁকা গলিঘুঁজিতে সে খুঁজে বেড়িয়েছে। আর যতই খুঁজেছে ততই বুঝেছে এ গোলকধাঁধার পথ নেই, এ প্রশ্নের জবাব হয় না।

বিজয় কিন্তু আসে মণীশ ঘটকের সঙ্গে। দু'জনে বন্ধু ছিল কলেজে, সেই দু'সঙ্গে। একটা বড় রকম অমিল থেকেও বোধ হয় বন্ধুত্ব হয়। বিজয় শান্ত, নিরীহ; মণীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম। বিজয় একটু বা কুনো, মণীশ নির্বাক। ছ-দুটের বেশি লম্বা, প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চহাবার। অতখানি দৈর্ঘ্যই তো একটা শক্তি। “কল্লোলে” আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাথের ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন যুবনাথের অর্থ যদি কেউ কবত ‘জোয়ান ঘোড়া’, তাহলে খুব ভুল করত না, তার লেখার ছিল সেই উদ্দীপ্ত সরলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল বা মাদ্রাসার বাপের আমল থেকে চলে এলেও বাংলাদেশের ‘স্বনীতি সংঘের’ মেম্বাররা দেখেও চাখ বুড়ে থাকছেন। এ একেবারে একটা নকুন সংসার, অশস্ত্র ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। ফত বিকৃত জীবনের কারখানা। বলতে গেলে, মণীশই “কল্লোলে”র প্রথম নশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভ্যাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অদ্ভুতপূর্ব। তাদের একমাত্র শরিচয় তাকাত মাহুদ, জীবনের পরবারে একই সই-মোহর-মারী একই সনদের অধিকারী। মাহুদ? না, মাহুদের অপছায়া? কই তাদের হাতে সেই বাদশাহী পাণ্ডার ছাপ-তোলা সনদ? তারা যে সব বিনা-টিকিটের যাত্রী। আর, সত্যি করে বলা, এটা কি দয়বাস, না বেচাকেনার মেদোহাটা? তারা তো সব শস্তায় ‘দুঃস্থ’ হয়ে যাওয়া ভূমিসাল।

যুবনাথের ঐ সব গল্পে হয়তো আধুনিক অর্থে কোনো সক্রিয় সমাজসচেতনতা ছিল না, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ছিল একটা সহজ বশালতাবোধ। যে মহৎ শিল্পী তার কাছে সমাজের চেয়েও জীবনই বেশি অধ্যায়িত। যে জীবন ভগ্ন, রক্ত, পর্ষদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে। তাদের নিজেদের তাবাস বললে তাদের যত দগদগে অভিযোগ, জীবনের এই খলতা এই পঙ্কতার বিরুদ্ধে কশায়িত তিরস্কার। দেখালে তাদের ঘা, তাদের পাপ, তাদের নিলজ্জতা। সমস্ত কিছুই পিছনে দখাছীন দারিদ্র্য। আর সমস্ত কিছু সম্বন্ধে একটি নিষ্কণ্ড ও নীরোগ জীবনের হাতছানি।

ভাবতে অবাক 'নাগে যুবনাথের সেই সব গল্প আজও পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। চব্বিশ বছর আগে বাংলা দেশে এমন প্রকাশক অবিদ্যি ছিল না যে এ গল্পগুলি প্রকাশ করে নিজেকে সম্মানিত মনে করতে পারত। কিন্তু আজকে অনেক দৃষ্টিবদল হলেও এদিকে কার চোখ পড়ল না। ভয় হয়, অগ্রনায়ক হিসেবে যুবনাথের নাম না একদিন সবাই ভুলে যায়। অন্তত এই অগ্রদৌত্যের দিক থেকে এই গল্পগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে গণনীয় হয়ে থাকবে এয়াই বাংলা সাহিত্যে নতুন আবাদের বীজ ছড়ালে। বাস্তবতা সম্বন্ধে সরল নির্ভরতা ও অপকৃত্ত জীবনের প্রতি সজ্ঞ সনাতনভূতি এই দুই মহৎ গুণ তার গল্পে দীপ্তি পাচ্ছে।

'কালনেমি'-র ডাকু জোয়ান মরদ—রেল কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে যায় কোথাও আশ্রয় না পেয়ে স্ত্রী ময়নাকে নিয়ে পটলভাড়ার ভিথিরীপাড়ার এসে আশ্রয় নেয়। ডাকুকে রোজ রাজার ঘোড়ে বসিয়ে দিয়ে ময়না দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে ভিক্টর সম্মানে, ফিরে এসে আবার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় কিন্তু সেই ভিথিরীপাড়ার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব নেই, নিরাম নেই থাকবার। সেখানে প্রতি বছরই ছেলে জন্মায়, কিন্তু বাপ-মা'র ঠিক ঠিকানা জানবার দরকার হয় না। কেউ কার একলাব নয়। ময়না এ অগত্রে একেবারে বিদেশী, কিছুতেই বাপ বাওরিতে পারে না এই বিকৃত পরিবেশের সঙ্গে। তাই একদিন রতনার আক্রমণে সে মরে ওঠে।

স্বামীকে গিয়ে বলে—তু একটা বিহিত করবিনে?

একটু চুপ করে থেকে ডাকু তাকে বুকে সাপটিয়ে ধরে। বলে—ত হোকগে। থাকতেই হবে যখন হেতায় তখন কি হবে আর বাঁটিয়ে? —আর তুই...

ময়না চারদিকে তাকিয়ে আশ্রয় খোঁজে। গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় স্বামীর কবল থেকে।

ডাকু বলে—চললি কোতা?

রতনার কাছে।

কিন্তু ডাকু তাতে দমে না। বলে—দোহাই তোব, আমাকে একেবারে ফাঁকি দিলেন। একটিবার আসিস য়েতে—

'গোম্পদ' গল্পে অল্প রকম সুখ। একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী। খেঁদি-পিসি পটলভাড়ার ভিথিরীপাড়ার মেয়ে-মোড়ল। একদিন পথে ভদ্রঘরের

একটি বিবর্তিত বউকে কুড়িয়ে পায়। তাকে নিয়ে আসে বস্তিতে। প্রথমেই তো সে ভিক্ষুর ছাপ্পপত্র পেতে পারে না, সেই শেষ পরিচ্ছদের এখনো অনেক পৃষ্ঠা বাকি। তাই প্রথমে খেঁদি ধরক দিয়ে উঠল। বললে, আমাদের দলে যাদের দেখলে সবই তো ওই করত এককালে। পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যায়ামে পড়ে পথে বেরিয়েছে। তোমার এই বয়সে এমন চেহারা—তা বাপু, নিজে বোঝ—
মেরেটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিট-খিট করে উঠল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল। হয়তো ভাবল এই অবুঝ মেয়েটাকে বাঁচানো যায় কিনা। যায় না, তবু ষত দিন যায়। তাই সে একটা নিখাস ফেলে বলল—আচ্ছা থাকো। কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কলকাতা হেন জায়গায় কি সামলে থাকতে পারবে? আমার খবরদারিতে ষতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত ভয় নেই কিন্তু সব সময় কি আমি চোখ রাখতে পারব?

না, ভয় নেই। থাকো, কোথায় বাবে এই জঙ্গলে? ষতক্ষণ ঘরে খেঁদি আছে ততক্ষণ, ততটুকু সময় তো মেয়েটি নিরাপদ।

‘বুড়াকর’ প্রেমের গল্প—গোবরগাছার পদ্মকুল। ও-ভাড়াটে চকু সবচেয়ে কাঁচ বহুসাইল, ছবরহীন জানোয়ার। থাকত ক্যান্ডার ঘরে—ক্যান্ড হাচ্ছে খেঁদির ডান হাত। দলের সেরা হাচ্ছে চকু, তাই তার ডেরাও মজবুত—ক্যান্ডার ঘর। এহেন চকু একদিন মরলা, রোগা আর বোবা এক ছুঁড়িকে নিয়ে এসে দলে ভর্তি করে দিলে। কিন্তু সেই থেকে কেন কে জানে, তার আর ভিক্ষুর বেরোতে মন ওঠে না। শুধু তাই নয়, সেদিন সে পটলাকে চড়িয়ে দিয়েছে একটা মেয়ের হাত থেকে বালা ছিনিয়ে নেবার সময় তার আঙুল যুচড়ে ভেঙে দিয়েছে বলে। চকুর এই ব্যাপার দেখে সবাই খান্না হয়ে খেঁদিকে গিয়ে ধরল। বললে—‘এর একটা বিহিত তোকে আজই করতে হবে পিসি। নইলে সব যে যেতে বসেছে। ডাক্তার কি যে হয়েছে ক’দিন থেকে—সাধুগিতি লাতে হুক করেছে মাইরি।’

খেঁদি গিয়ে পড়ল চকুকে নিয়ে। মুখিয়ে উঠল : ‘বল মুখপোড়া, তুই ভেবেছিলি কি? দলের নাম ডোবাতে বসেছিল যে।’

চকু হাঁ-না কোন জবাব দিল না।

একজন বলল, ‘আরে, ও তো এমন ছেলে না। ওই ও’টুকি মাগী এসেই ওকে বিগড়েছে। ওকে না তাড়ালে চকুকে কেবাতে পারবি না—’

খেদি বলল, ‘সত্যি করে বল তুই, ও মাগী তোর কে? আমি কেন, দশজনে দেখছে, ওই তোকে সারছে। ও কে তোর?’

বোবা-মেরেটাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। চকু তার দিকে তাকিয়ে রইল স্পষ্ট করে। বললে, ‘ও আমার বোন।’

বোন? খেদির দলে বোন? মা-বোনের ছোয়াচ ভো চের দিনই সবাই এড়িয়ে এসেছে।

—‘শোন, এই তোকে বলছি’—খেদি খেঁকিয়ে উঠল—‘ও মাগীকে তোর ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল, কাল পে সেইখানে যেনে আসবি, নইলে—’

চকু তাকাল খেদির দিকে।

—‘নইলে দল ছাড়তে হবে তোকে। আগেকার মত যদি হতে পারিস তবেই থাকতে পারবি, নইলে আর নয়। বুঝেচিস?’,

তোর হাতের আবছা আলোর খেদি পিসির আঙানা থেকে বেরিয়ে এল চকু, সেই বোবা মেরেটার হাত-ধরা। অনেকদিন চলে গেল, আর তাদের হচ্ছিল নেই।

রতন টিলনি কাটল—‘বলেছিছ কিনা। শক্ত একটা কিছু বেঁধেছে বাবা। নইলে চকুর মত স্মারনা মাগী—’

তেরোশ বজ্রেশের “কল্লোল” বুনাখ তিনটি গল্প লেখে—‘মহাশেষ’, ‘ভূবা ভগবান’ আর ‘হুধোগ’। এর মধ্যে ‘হুধোগ’ অপকল্প। পটলভাঙার গল্প নয়, পদ্মার উপরে ঝড় উঠেছে—তার মধ্যে রাজীবাহী স্টিমার ‘বাজার্ভে’র গল্প। জোবালো হাতে লেখা। কলর বেন ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

‘পতিক বড় সুবিদার না জোগরাখ, ঝোরি-বিষ্টি আইব মনে লয়। বুচি লো, চুন দে দেহি এটু—’

সতরকির ওপর হুঁকো ও গামছা-বাঁধা জলন্তরঙ্গ টিনের তোরঙে ঠেস দিয়ে আজাহ গোলাপী পাঞ্জাবি ও তুতুপরি নীল স্ট্রাইপ দেওয়া টাইলের গলফ-কোট গায়ে একটি বছর সাতাশ-আটাতের মদনমোহন গুয়েছিলো। বোধ করি তারই নাম জগন্নাথ। সে চট করে কপালের লতায়িত কেশপুচ্ছের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—

‘জাইল! হালার আপনার বড় গাজাখুরি কথা। হুদাহদি ঝরি আইব

ক্যান ? আর আছেই যদি হালার ডর কিসের ? আমরা তো শালার জাইন্য ভিঙিতে যাইত্যাছি না ।’

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, ঝড় আসা বিচিত্র নয় । সমস্ত আকাশে রং পাণ্ডা পিকল, দৈশান কি নৈঋত কি একটা কোণে হিংস্র ঝাপড়ের মত একটা ঘোর কালো মেঘ শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়বার আগের হুহুড়ের মতই ওং পেতে বসেছে । ভীরে গাছের পাতা স্পন্দহীন, কেবল স্টিমারের আশপাশ ঘুরে গাং-চিলের ওড়ার আর বিরাম নেই । চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তরুতা ধমধম করছে ।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লোক আমার পাশ কাটিয়ে ফিমেল-কম্পার্টমেন্টে খারে গিয়ে আপাদগ্রীবীবা সতরফি মুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসল । বসে সন্তর্পণে একবার কপালের কেশ্যারিতে হাত বুলাতেই চিনতে পারলাম সে পূর্বোক্ত শ্রীমান জগন্নাথ । হাবভাবে বুঝলাম, শ্রীমান ভীত হয়েছেন ।

বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ওলটপালট হয়ে গেছে । আকাশ-কোণের ঝাপড়জন্তুটা দেহ বিস্তার করে আকাশের অর্ধেকের বেশি গ্রাস করে ফেলেছে । অঙ্ককারে কিছু চোখে পড়ে না, থেকে-থেকে চারদিক মৃদু আলোককম্পনে চমকে-চমকে উঠছে । সে আলোয় ধূসর বৃষ্টি-ধারা ভেদ বয়ে দৃষ্টি চলে না, একটু গিয়েই প্রতিহত হয়ে কিরে আসে । শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উন্মিগ্ন আনন্দে গোংরাতে থাকে, সমস্ত আকাশ জুড়ে তেমনি শব্দ হচ্ছে—

‘যান যান, আপন আপন জায়গায় যান । গার্দ করবেন না এক মুড়ায়— জাহেন না হালার জা’জ কাইত অইয়া গেছে—’

উপদেশ শোনা শু তদনুসারে কাজ করবার মত স্থান ও কাল সেটা নয়, তাই নিজ-নিজ জায়গার ওপর কারো বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল না ; যিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁরও না ।

বাইরে অষ্ট দিকপালের মাতামাতি সমান চলেছে । অবিরল বৃষ্টি, অশ্রান্ত বিদ্যুৎ, আকাশের অশান্ত সব আফালন, সমস্ত ডুবিয়ে উন্নত বায়ুর অধীর ছহংকার । তারই ভেতর দিয়ে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, ‘বাজার্জ, স্টিমার বায়ুভাঙিত হয়ে কোন এক ঝড়ের পাখির মতই সবগে ছুটে চলেছে ।

হঠাৎ মনে হল কে যেন ডাকছে । কাকে, কে জানে । ও কি,— আমাকেই—

‘ভুলুন একবার এদিকে—’

চেয়ে দেখি মেয়ে-কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ি-বাইশের একটি সাদাসিধে হিন্দু ঘরের মেয়ে। আঁরি এগিয়ে যেতেই তিনি ব্যগ্রভাবে বললেন—‘অবি—অবিনাশবাবুকে ডেকে দেবেন একটু? অবিনাশ বোস। অনেকক্ষণ হল নিচে গেছেন, ফেরেননি। তিনি আমার স্বামী।’

বিধবস্ত জনসংঘের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে অনেক কষ্টে অবিনাশবাবুর সন্ধান পাওয়া গেল। ডেক, সেলুন, হস্পিটাল কোথাও তিনি নেই—জাহাজ ডুবছে—এই মহামারণ দুর্ধোগে তিনি শুটকি মাছের চ্যাঙারির মধ্যে বসে আছেন ‘নিশ্চিন্ত হয়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে? ই্যা, ঘাড় দাবিয়ে উবু হয়ে বসে বিপন্ন অপরিচিতার স্বামী শ্রীঅবিনাশ বোস পাশের একটি অর্ধনগ্ন জোয়ান কুলি-মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাব্যচচ্চা করছেন।’ নিশ্চিন্ততা না, দুর্ধোগ?

মণীশের চেয়েও দীর্ঘকায় আরো একজন সাহিত্যিক ক্ষণকালের জন্তে এসেছিল ‘কল্লোলে’, গল্পলেখার উজ্জল প্রাতিশ্রুতি নিয়ে। নাম দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। কত দিন পরে চলে গেল সার্থক জীবিকার সন্ধানে, আইনের অলি-গলিতে। দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওকালতিতে গেল বটে, কিন্তু টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত, যত দিন ‘কল্লোল’ টিকে ছিল। মণীশের সঙ্গেই সে আসে আর আসে সেই উদ্দাম প্রাণচাকলা নিয়ে। ছাত্র হিসেবে কৃতী, রসবোধের ক্ষেত্রে প্রধী, চেহারায় সুন্দর-সুঠাম—দেবীদাস ‘কল্লোলে’র বাণীর একটি প্রধান ভূমি ছিল। উচ্চ তানের তন্ত্রী সন্দেহ নেই। ঝড়ের বংকার নিয়ে আসত, দুর্নিবাব অমনন্দের ঝড়। নিয়ে আসত অনিয়মের উন্মাদনা। উজরোল, উতরোল, হরোল পড়ে যেত চারদিকে। দেবীদাস কিন্তু রবাহৃত হয়ে আসেনি। এসেছে স্বাধিকার বলে, সাহিত্যিকের ছাড়পত্র নিয়ে। ‘কল্লোলে’ একবার গল্প-প্রাণযোগিতায় দেবীদাসের গল্পই প্রথম পুরস্কার পায়। যতদূর মনে পড়ে, এক কুষ্ঠরোগী নিয়ে সে গল্প। একটা কালো আতঙ্কের ছায়া সমস্ত লেখাটাকে ঢেকে আছে। সন্দেহ নেই, শক্তিধরের লেখনী।

‘কল্লোলে’ ভিড় যত বাড়ছে ততই মেজবোদির কঠির পাজা নীর্ণ হয়ে আসছে—সে জর্জরারণ্যের খাণ্ডবদাহ নিবৃত্ত করবার সাধ্য নেই কোনো গৃহস্থের। চাঁদা দাও, কে-কে অপারগ হাত তোল, চাঁদায় না কুলোয় ধরো কোনো ভারী পকেটের খন্দেরকে। এক পয়সায় একখানা ফুলকো লুচি, মুখভরা সন্দেহ একখানা এক আনা, কাছেই পুঁটিয়ায় মোদকের দোকান, নিয়ে এস চ্যাঙারি

করে। এক চ্যাডারি উড়ে যায় তো আরেক চ্যাডারি। অতটা রাজাহার না জোটে, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের মোড়ে বুড়ো হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে নিয়ে এস ভালপুন্নি। একটু দৃষ্টান্ত্য খাবে নাকি, যাবে নাকি অশান্তের এলাকায়? অশান্তনের দেশে আবার শান্ত কি, শেয়ালদা থেকে নিয়ে এস শিকাবাব। সঙ্গে ছন্দ রেখে মোগলাই পরোটা!

আর, তেমন অশন-আচ্ছাদনের ব্যবস্থা যদি না জোটাতে পারো চলে যাও ফেভারিট কেবিনে, দু'পরসার চায়ের বাটি মুখে করে অফুরন্ত আড্ডা জমাও।

মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ফেভারিট কেবিনে কল্লোলের দল চা খেত। গোল শ্বেত-পাথরের টোবলে ঘন হয়ে বসত সবাই গোল হয়ে। দোকানের মালিক, াটগৈয়ে ভদ্রলোক, নাম যতদূর মনে পড়ে, নতুনবাবু স্বজন স্থলভ স্নিগ্ধতায় আপ্যায়ন করত সবাইকে। সে সংবর্ধনা এত উদার ছিল যে চা বহুকণ শেষ হয়ে গেলেও কোনো সংকেতে সে বাতিচিহ্ন আঁকত না। বতৃক্ষণ খুশি আড্ডা চালিয়ে যাও জোর গলায়। কে জানে হয়তো আড্ডাই আকর্ষণ করে আনবে কোনো কৌতুহলীকে, তুর্বার্তচিত্তকে। পানের অভাব হতে পারে কিন্তু স্থানের অভাব হবে না। এখুনি বাড়ি পালাবে কি, দোকান এখন অনেক পাতলা হয়েছে, এক চেয়ারে গা এলিয়ে আরেক চেয়ারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বোস। শাদা 'সিগারেট নেই একটা? অন্তত একটা থাকি সিগারেট?

বহু তরু ও আশ্ফালন, বহু প্রতিজ্ঞা ও ভাবস্তুচিহ্নন হয়েছে সেই ফেভারিট কেবিনে। “কল্লোল” সম্পূর্ণ হত না যদি না সেদিন ফেভারিট কেবিন থাকত।

এক-একদিন শুকনো চায়ে মন মানত না। ধোঁয়া ও গন্ধ-ওড়ানো তপ্প-পক্ক মাংসের জন্তে লালসা হত। তখন দেলখোস কেবিনের জেল্লাজমক খুব, নাতি-দরে ইণ্ডোবর্মার পরিচ্ছন্ন নতুনত্ব। কিন্তু খুব বিয়ল দিনে খুব সাহস করে সে-সব জায়গায় ঢুকলেও সামান্য চপ কাটলেটের বেশি জায়গা দিতে পকেট কিছুতেই বাজি হত না। পেট ও পকেটের এই অসামঞ্জস্যের জন্তে ললাটকে দায়ী করেই শাস্ত হতাম। কিন্তু সাময়িক শান্তি অর্থ চিরকালের জন্তে ক্ষান্ত হওয়া নয়। অন্তত নৃপেন জানত না-ক্ষান্ত হতে। তার একমুখো মন ঠিক, একটা-না-একটা ব্যবস্থা করে উঠতই :

একদিন হয়তো বললে, ‘চল কিছু খাওয়া থাক পেট ভরে। বাঙালি পাড়ায় নয়, চীনে পাড়ায়।’

উত্তেজিত হয়ে উঠলাম : ‘পরমা?’

‘পরসা যে নেই তুইও জানিস আমিও জানি। ও প্রস্নে করে লাভ নেই।’

‘ভবে?’

‘চল, বেরিয়ে পড়া যাক একসঙ্গে। বেগ-বরো-অর-স্টিল, একটা হিমে নিশ্চয়ই কোথাও হবে। আশা করি চেয়ে-চিন্তে ধারণ্য করেই জুটে যাবে শেষেরটার স্বরকার হবে না।’

হু’জনে হাঁটতে শুরু করলাম, প্রায় বেলতলা থেকে নিমতলা, সাহাপুর থেকে কান্দিপুর। প্রথম প্রথম নূপেন বোল আনা চেনা বাড়িতে ঢুকতে লাগল। শেষকালে হু-আনা এক-আনা চেনায়ও পেছপা হল না। মূখচেনা নামচেন কিছুতেই স্তার উত্তম-ভঙ্গ নেই। আমাদের বাস্তব দাঁড় করিয়ে রেখে একেকটা বাড়িতে গিয়ে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে শূন্য মুখে, বলে, কিছুই হল না, কিংবা বাড়ি নেই কেউ, কিংবা ছোট একটি অভিশপ্ত নিখাস ছেড়ে দ্রুতরণ মেঘদূত আওড়ায়। এমনিতে স্থির হয়ে বসে থাকতে যা হত হাঁটার দরুন খিদেট বহুগুণ চনমনে হয়ে উঠল। যত তীব্র তোমার ক্ষুধা তত দূর তোমার যাত্রা স্তব্ধতাং ধামলে চলবে না, না-ধামাটাই তো তোমার খিদে-পাওয়ার সত্যিকার লাক্ষ্য। কিন্তু রাত সাড়ে আটটা বাজে, ডিনার টাইম প্রায় উল্লীর্ণ হয়ে গেল আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি, এবার ভালো ছেলের মত বাড়ি করে বং প্রাপ্ত তৎ ভক্তিতং কবি গে, হাত ধরে বাধা দিলাম নূপেনকে, বললাম, ‘এ পঞ্চ টিক কত পেয়েছিস বল সত্যি করে?’

হাতের মুঠ খুলে অন্নান মুখে নূপেন বললে, ‘মাইরি বন’ছি, মাত্র দু’টাকা।’

দু’টাকা। দু’টাকায় প্রকাণ্ড খ্যাট হবে। ঈষদূন থাওয়া যাবে আকর্ষণ তবে এখনো চীন দেশে না গিয়ে শ্রামরাজ্যে আছি কেন?

হতাশমুখে নূপেন বললে, ‘এ দু’টাকায় কিছুই হবে না, এ দু’টাকা আমার কালহের বাজার-খরচ।’

এই আমাদের রোমান্টিক নূপেন, একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে ভাবানুগামী ভাগ্যের বসিকতায় নিজেও ভাগ্যের প্রতি পরিহাসপ্রবণ। বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান স্তর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ : দুই বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাত্মীন উদ্যমতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুর্য। আদর্শবাদী যুবক প্রতিবুল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারণিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের স্বরূপ।

বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে

জায়গায় পাচ্ছে তা তার আত্মার আত্মপাতিক নয়—এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতার সে ছিন্নভিন্ন। বাইরে যেখানে বা বাধা নেই সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অতীতকে তেমনি বিফলতার অবলাদ।

যাকে বলে ‘ম্যালাডি অফ দি এজ’ বা যুগের যন্ত্রণা তা “কল্লোলের” মূখে স্পষ্টরেখায় উৎকীর্ণ। আগে এর প্রচ্ছদপটে দেখেছি একটি নিঃস্বপ্ন ভাবুক যুবকের ছবি, সমুদ্রপারে নিঃসঙ্গ ঔদ্যোক্তে বসে আছে—কেন-উদ্ভাল তরঙ্গশৃঙ্গটা তার থেকে অনেক দূরে। তেরোশ একত্রিশের আশ্বিনে সে-সমুদ্র একেবারে তীর গ্রাস করে এগিয়ে এসেছে, তরঙ্গতরল বিশাল উল্লাসে ভেঙে ফেলছে কোনো পুরোনো না পোড়ো মন্দিরের বনিয়াদ। এই দুই ভাবের অভূত সংমিশ্রণ ছিল “কল্লোল”। কখনো উন্নত, কখনো উন্নয়ন। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনবিতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র। ভাবে শেলীয়ান কর্মে হামলেটিশ।

এ সময়টায় আমরা মৃত্যুর প্রেমে পড়েছিলাম। বিপ্লবীর জন্তে সে সময় মৃত্যুটা ঝড়ই রোমাঞ্চিক ছিল—সে বিপ্লব রাজনীতিই হোক বা সাহিত্যনৈতিই হোক। আর, সঙ্গ বা পরিপার্শ্ব অনুসারে রাজনীতি না হয়ে আমাদের ভাগে সাহিত্য। নইলে দুই ক্ষেত্রেই এক বিদ্রোহের আগুন, এক ধ্বংসের অনিবার্যতা। এক কথায়, একই ধূগ-যন্ত্রণা। তাই সেদিন মৃত্যুকে যে প্রেয়সার সুন্দর মুখের চেয়েও সুন্দর মনে হবে তাতে আর বিচিৎর কি।

সেই দিন তাই লিখেছিলাম :

নয়নে কাজল দিয়া

উলু দিও সখি, তব সাথে নয়, মৃত্যুর সাথে বিয়া।

আর প্রেমে লিখেছিল :

আজ আমি চলে যাই

চলে যাই তবে,

পৃথিবীর ভাই বোন মোর

গ্রহতারকার দেশে,

সাক্ষী মোর এই জীবনের

কেহ চেনা কেহ বা অচেনা।

তোমাদের কাছ হতে চলে যাই তবে।

যে কেহ আমার ভাই যে কেহ ভগিনী,
 এই উষ্মি-উষ্মিলিত সাগরের গ্রহে
 অপরূপ প্রভাত-সন্ধ্যার গ্রহে এই
 লহ শেষ শুভ ইচ্ছা মোর,
 বিদায়পরশ, ভালোবাসা ;
 আর তুমি লও মোর প্রিয়া
 অনন্তরহস্তময়ী,
 চিরকৌতূহল-জালা—
 অসমাপ্ত চুম্বনখানিরে
 তৃপ্তিহীন ।...
 যত দুঃখ সহিয়াছি
 বহিয়াছি যত বোঝা, পেয়েছি আঘাত
 কাটায়েছি স্নেহহীন দিন
 হস্ত বা বৃথা,
 আজ কোনো ক্ষোভ নাই তার তরে
 কোনো অন্ততাপ আজ রেখে নাহি যাই—

আর নূপেনের গলায় ববীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি :
 মৃত্যু তোমার হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
 হোক সেট পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে,
 গৃহহীন পথিকেরি,
 নৃত্যচ্ছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী
 অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাসময়র
 বিদেশের বিবাগী নিকর
 বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি,
 যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আকর্ষণ থালি
 চলিয়াছে অনন্তের মন্দিরসঙ্ঘানে,
 পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে
 দুয়ার রহিবে খোলা, ধরিত্রীর সমুদ্রপর্বত
 কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ ।

শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক ।

পথিকেরা সেই ডাক যেন তখন একটু বেশি-বেশি শুনছিল। পথিকদের তার জন্তে খুব দোষ দেয়া যায় না। তাদের পকেট গডের মাঠ, ভবিষ্যৎ অনির্ণয়। অভিভাবক প্রাক্কুল, সমালোচক যমদূতের প্রতিমূর্তি। ঘরে-বাইরে সমান খজা-হস্ততা। এক ভরসাশূল প্রণয়িনী, তা তিনিও পলায়নপর, রামলোচন। আর তাঁর যারা অভিভাবক তারা আকাট গুণ্ডামাকা। এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে কেউ যদি মরণকে “শ্রামসমান” বলে, মিথ্যে বলে না।

দশ

জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতা এই দুই যতির মধ্যে দুলছে তখন ‘কালালের’ ছন্দ। সে সময়কার প্রেমেনের দুটো চিঠি—প্রথমটা এই :

“অচিন, আমি অধঃপাতে চলেছি। তাও যদি ভালো ভাবে যেতে পারতুম! জীবন নিয়ে কি করতে চাই ভালো করে বুঝি না, যা বুঝি তাও করতে পারি না। মাঝে মাঝে ভাবি, বোঝবার দরকার কিছু আছে কি? এই যে দার্শনিক কবি মানবহিতৈষী মহাপুরুষেরা মাথা ঘামিয়ে মরছেন এই ঘর্ম বোধ হয় একেবারেই নিরর্থক। জীবনটাকে যে বৈকিয়ে ছুঁড়ে বিকৃত করে ছেড়ে গেল, আর যে প্রাণপণ শক্তিতে জীবনকে কবিতা করার চেষ্টা করলে, দু’জনেই ব্যজে কাজে হয়রান হল সমানই। তুমি বলবে আনন্দ আর দুঃখ—আমি বলি, তার চেয়ে ছেড়ে দাও তাকে নিজের খেয়ালে। হাসি পেলে হাস, আর যেদিন শ্রাবণের আকাশ অন্ধকারে আর্দ্র হয়ে উঠবে সেদিন জেনো ও মেনো কঁাদতে পাওয়াটাই পরম সৌভাগ্য। কোন দিন যদি খুশি হয়, নিজের সমস্ত সত্যকে মিথ্যার খোলসে ঢেকে নিজের সঙ্গে খুব বড় একটা পরিহাস করো, কোন ক্ষতি হবে না।

আমরা ছোট মানুষ, কুয়ের ব্যাঙ, কিছু জানি না, তাই ভাবি আমরা মস্ত একটা কিছু। নিজেদের জগতে চলাফেরা করি, ছোট্ট চেতনার আলোকে নিজের ঘরে সস্তার প্রকাণ্ড ছায়াটা দেখি আর মনে-মনে ‘বড়-বড়’ খেলা করি। কিন্তু ভাই আজ যদি এই পৃথিবীর গায়ের চুলকানির কীটের মত এই সমস্ত

মানুষ জাতটার সবাই মিলে পণ করে উচ্ছ্বসে যাই, এই বিপুল নিখিলে এই বিরাট আকাশে কোনখানে এতটুকু কান্না জাগবে না, উদ্‌ঘাপাত হবে না, অগ্নিবৃষ্টি হবে না, প্রলয় হবে না, বিরাট নিখিলে একটি চোখের পলক খসবে না।

তবে যদি মানুষকে একটা কথা শেখাতে চাও, আমি তোমার মতে—যদি এই নির্বোধ মানুষ জাতটাকে শেখাও শুধু স্মৃতির, নিছক স্মৃতির উপাসনা—এই দেবতা-ঠাকুরকে দূর করে দিও, বেঁটিয়ে ফেলে সব সমাজশাসন সব নীতির অহুশাসন—শুধু জীবনটাকে আনন্দের সরাবথানায় অপব্যয় করতে—তবে রাজী আমি।

কিন্তু আনন্দ, সত্যিকারের আনন্দ পেতে হলে চাই আবার সেই বন্ধন, চাই আবার সেই সমাজশাসন, যদিও উদারতর; চাই সত্যের ভিত্তি, যদিও দৃঢ়তর—চাই সচেতন সৃষ্টি-প্রতিভা, চাই বিভিন্ন জীবনপ্রেরণার এমন সংঘম ও সংযোগ যা সংগীত।

সুতরাং এতক্ষণ সব বাজে বকেছি—বাজে বকব বলেই বাজে বকেছি। কারণ চিঠি লেখার চরম উদ্দেশ্য জীবনের নির্যম বাস্তবতাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপদস্থ করে হাস্যাত্মক করা।

আজ এখানে বেজায় বাদল, কাল থেকেই শুরু হয়েছে। শাল মুড়ি দিয়ে এলোমেলা বিছানায় বসে চিঠি লিখছি। এখন রাত সাড়ে সাতটা হবে। খুব সম্ভব তুই এখন গল্প লিখছিস—লিখছিস হয়ত বিবাহী নায়ক তার প্রিয়ার ঘরের প্রদীপের আলোকে নিজের ব্যর্থ কামনার মৃত্যু দেখছে। হয়ত কোন ব্যথিত প্রণয়ী তোর হৃদয়ের কান্নার উৎসে জন্ম নিয়ে আজ চলল মানুষের আনন্দলোকের অবিনাশী মহাসভায়—যেখানে কালিদাসের যক্ষ আজো বিলাপ করছে, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত মানবস্রষ্টার সৃষ্টি অমর হয়ে আছে।

একদিন নাকি পৃথিবীতে কান্না থাকবে না, কঁাদবার কিছু থাকবে না। সেদিনকার হতভাগ্য মানুষেরা হয়ত শখ করে তোদের সভায় কঁাদতে আসবে আর আশীর্বাদ করবে এই তোদের, বারা তাদের ক্রন্দনহীন জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিবি।”

দ্বিতীয় চিঠি :

“বড় দুঃখ আমার এই যে কোন কাজই ভাল করে করতে পারলুম না। জীবনের মানেও বুঝতে পারি না। জানি শক্তিসংগ্রহে স্বপ্ন, পূর্ণ উপভোগ স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন আর কল্যাণ কোথায় এক হচ্ছে বুঝতে পারি না।

জীবনটা যখন চলা তখন একটা দিকে ত চলা দরকার, চারদিকে সমানভাবে দৌড়াদৌড়ি করলে কোন লাভ হবে না নিশ্চয়ই। সেই পথের লক্ষ্যটা একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।...

আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে না মিশলেই যায় সব ভেঙে। অনেক ধনী হয়ে অনেক টাকা বাজে অপব্যয় করার আনন্দ আছে, খুব ব্যক্তিচারী লম্পট হওয়াতেও আনন্দ আছে, সর্বভাগী বৈরাগী তপস্বী সন্ন্যাসী হওয়াতেও আনন্দ আছে, কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই গোল। এগিয়েও ভুল করতে পারি, পেছিয়েও। পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চলা যায় তাও তো ভেবে পাই না।

আমার মনে হয় আনন্দ আমার কাছে আনন্দ আর দুঃখ দুঃখ, শুধু এই জন্তেই যে, আনন্দ জীবনের সার্থকতার প্রমাণ আর দুঃখ মৃত্যুর জরুটি। কথাটা একটু হেয়ালি ঠেকেছে। আর যখন দেখা যায় আনন্দ জীবনের মূলচ্ছেদেও মাঝে-মাঝে পাওয়া যায় তখন আরো হেয়ালি দাঁড়ায় বটে কথাটা। তবু আমার মনে হয় কথাটা সত্যি।

আর এ ছাড়াও, অর্থাৎ এ যদি সত্যি না হয়, তবু আনন্দ ছাড়া জীবনের পথের পাণ্ডা আর আমাদের কেউ নেই। যারা কর্তব্য-কর্তব্য বা বিবেক-বিবেক বলে চেষ্টা করে মরে তারা আমার মনে হয় একেবারে অন্ধ, না হয় একেবারে পাগল। কি কর্তব্য আর বিবেক কি বলে এটা যদি ঠিক করতেই পারা যাবে তাহলে আর এত গোল কেন? জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তো বিবেক তৈরি হয়েছে আর কর্তব্য-অকর্তব্য প্রাণ পেয়েছে।

এই যে পাণ্ডাটি আমাদের, এ মাঝে মাঝে ভুল করে, কিন্তু নাচার হয়ে আমাদের তাকেই সঙ্গে নিতে হবে পথ দেখাতে।

এমনিতর অনেক কথা ভাবি কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারি না। ছেলেবেলা একটা সহজ idealism ছিল, ভালো মন্দ বেশ সুস্পষ্টভাবে মনে বিভক্ত হয়ে থাকত। মনে হত পথটা জানি চলাটাই শক্ত—এখন দেখছি চলার চেয়ে পথটা জানা কম কথা নয়।

এই ধর জীবনের একটা programme দিই। বিজ্ঞা জ্ঞান স্বাস্থ্য শক্তি সৌন্দর্য শিল্পসাধনা গেল প্রথম। দ্বিতীয় ভালবাসা পাবার। ধর পেলুম কিংবা পেলুম না। তাবপর আরো সাধনা পরিপূর্ণতার জন্তে। পরের উপকার, বিশ্ব-মানবের জন্তে দরদ, পৃথিবীজোড়া দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকারের ঐতীকার

চেষ্ঠায় বথাসাধ্য নিজেকে লাগান। তৃতীয় সারাজীবন ধরেই ভূমার জ্ঞান তপস্যা, সারাজীবন ধরে দুঃখকে অবহেলা করবার ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করবার মৃত্যুকে উপহাস করবার শক্তি অর্জন।

বেশ! মন্দ কি। কিন্তু যত সহজ দেখাচ্ছে ব্যাপারটা, আসলে মোটেই এমন সহজে মীমাংসা হয় না। কি যে ভূমা আর কি যে পরিপূর্ণতা, কি যে মাহুষের উপকার আর কি যে শিল্প আর জ্ঞান তা কি মীমাংসা হল?...

না। মাথা গুলিয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, আফ্রিকার সব চেয়ে আদিম অসভ্য Bushman-এর একটা বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ এরোপ্লেন পেলে যে অবস্থা হয় আমাদের এই জীবনটা নিয়ে হয়েছে তাই। আমরা জানি না এটা কি এবং কেন? এর কোথায় কি তা তো জানিই না, এর সার্থকতা ও উদ্দেশ্য কি তাও জানি না। হঠাৎ আমাদের আনাড়ি নাড়াচাড়ায় কোন একটা কল নড়ে-চড়ে পাখাটা একবার ঘুরে উঠছে, আমরা ভাবছি, হাওয়া খাওয়াই এর উদ্দেশ্য, কিংবা হয়ত পাখ নেগে কাকুর গা-হাত-পা কেটে যাচ্ছে তখন ভাবছি এটা একটা উৎপীড়ন।

উপমাটা ঠিক হল না। কারণ অবস্থা গুর চেয়ে থারাপ এবং আফ্রিকার Bushman-এর কাছে একটা এরোপ্লেন যত জটিল ও অর্থহীন, অভূত জীবন। আমাদের কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি। মাহুষ কত কোটি বছর পৃথিবীতে এসেছে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের তর্ক আজও শেষ হয়নি, সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু জীবনের অর্থ যে আজও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে মতভেদ নেই বোধহয়।

কবিত্ব করা যায় বটে এই বলে যে বোকা যায়না বলেই জীবন অপরূপ মধুর সুন্দর, কিন্তু ভাই, মন হা হা করে। কি করি এই দুর্বোধ অনধিগম্য জীবন নিয়ে? যতদিন না মৃত্যু-শীতল হাত থেকে আপনি খসে পড়ার ততদিন এমনি করে ছুটোছুটি করে মরব আর কৈদে কাটাব?

তা ছাড়া শুধু সুখ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার উপায়ও যদি থাকত! তাও ত নেই। আমি হয়ত কুৎসিত আর একজন চিররুগ্ন, আর একজন নির্বোধ, আর একজন অন্ধ বা পঙ্গু, তার একজন দীন ভিতারীর মেয়ে। বলছ আনন্দ না পাও আনন্দের সাধনা কর, কেমন? কিন্তু জন্মাক্ষের দেখতে পাবার সাধনা খঞ্জের নৃত্যসাধনা করা বোকামি নয় কি? স্থূল জগতে যেমন দেখছি মনের জগতেও এমনি নেই কে বলতে পারে? বোকা হয়ে গানের সাধনা তপস্যা করতে বল

কি ? জীবনের কোন গানের সাধনায় আমি বোবা তা ত জানি না। আন্দাজে টিল ছুঁড়ি যদি, হয় ত আমার গায়েই লাগবে।”

কি হবে এত সব জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে, সক্রোটসীয় দার্শনিকের মত মৃত্যুরূপী পরিপূর্ণতার প্রতীক্ষা করে ? তার চেয়ে চলো, মাঠে চলো, মোহন-বাগানের খেলা দেখে আসি।

মোহনবাগান ! আজকাল আর যেন তেমন করে বাজে না বুকের মধ্যে। সেই ইস্ট ইয়র্কস নেই, ব্ল্যাক-ওয়াচ ডারহামস এইচ-এল-আই ডি-সি-এল-আই নেই, সেই মোহনবাগানও নেই। আজকালকার মোহনবাগান যেন ‘মোহন’ সিরিজের উপন্যাসের ২তই বাসি।

কিন্তু সে-সব দিনের মোহনবাগান মৃত-দেশের পক্ষে সঞ্জীবনী ছিল। বলা বাহুল্য হবে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ছিল ‘বন্দেমাতরম’ তেমন খেলার ক্ষেত্রে ‘মোহনবাগান’। পলাশীর মাঠে যে কলঙ্ক অর্জন হয়েছিল তার খালন হবে এই খেলার মাঠে। আসলে, মোহনবাগান একটা ক্লাব নয়, দল নয়, সে সমগ্র দেশ—পরাভূত, পদানত দেশ, সেই দেশের সে উদ্ধত বিজয়-নিশান।

এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে মোহনবাগানের খেলার মাঠেই বাঙলা দেশের জাতীয়তাবোধ পরিপুষ্ট হয়েছিল। যে ইংবেজ-বিশেষ মনে-মনে ধুমায়িত ছিল মোহনবাগান তাতে বাতাস দিয়ে বিস্তৃত আশুনের স্পষ্টতা এনে দিয়েছে। অত্যাচারিতের যে অসহায়তা থেকে ‘টেররিজম’ জন্ম নেয় হয়তো তার প্রথম অঙ্কুর মাথা তুলেছিল এই খেলার মাঠে। তখনো বেংগার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকেনি, মোহনবাগান তখন হিন্দু-মুসলমানের সমান মোহন-বাগান—তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না। সেদিন যে ‘ক্যালকাটা’ মাঠের সবুজ গ্যালারি পূড়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, একজন এনেছিল পেট্রল, আরেকজন এনেছিল দিয়াশলাই। সওয়ার পুলিশের উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়ার খুরে একসঙ্গে জখম হয়েছিল দু’জনে।

সে-সব দিনে খেলার মাঠে ঢোকার লালনার কথা ছেড়ে দিই, খেলার মাঠে ঢুকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে অবিচার অচর্চিত হতে দেখেছে দেশের লোক, তাতে রক্ত ও বাক্য দুইই তপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। আর এই তপ্ত বাক্য আর রক্তই ঘরে-বাইরে স্বাধীন হবার সঙ্কল্প ধার জুগিয়েছে। সে-সব দিনের রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল, আর সেই একচোখো রেফারি

পদে-পদে মোহনবাগানকে বিভ্রমিত করেছে। অবধারিত গোল দ্বেবে মোহন-বাগান, হুইসল দিয়েছে অফসাইড বলে। ফাউল করলে ক্যালকাটা; ফাউল দিলে না, যদি বা দিলে, দিলে মোহনবাগানের বিপক্ষে। কিছুতেই মোহনবাগানকে দ্বাবানো যাচ্ছে না, বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি। একেকটা জোচ্চুরি এমন ছকান-কাটা ছিল যে সাহেবদের কানও লাল না হয়ে থাকতে পারত না। একবার এমনি ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রেফারি হঠাৎ পেনাল্টি দিয়ে বসল। যেটা খুবই অসাধারণ, ব্যাক থেকে কলভিন না বেনেট এল শট করতে। শট করে সে-বল সে গোলের দিকে না পাঠিয়ে কয়েক মাইল দূর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। সেটা রেফারির গালে প্রায় চড় মারার মত—দিবালোকের মত এমন নির্লজ্জ ছিল সেই পেনাল্টি। খেলোয়াড়ের পক্ষে রেফারিকে মারা অভ্যস্ত গহিত কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তিক্তবিরক্ত হয়ে সেদিন যে ড্যালহৌসির মাঠে বলাই চাটুজ্জ ক্রেন্টন সাহেবকে মেয়েছিল সেটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শুধু রেফারি কেন, সমস্ত শাসকবংশই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রী ছিল। নইলে ১৩৩০ সালে মোহনবাগানকে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে শিল্ড-কাইজালে খেলানো হত না। সেদিন রাত থেকে ভুবনপ্রাবন বর্ষা, সারা দিনে এক বিন্দু বিরাম নেই। মাঠে এক-হাঁটু জল, কোথাও বা এক কোয়র, হেদো না থাকলে সে-মাঠে অনায়াসে ওয়াটার-পোলো খেলা চলে। ফুটবল বর্ষাকালের খেলা সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ষারও একটা সীমা আছে সভ্যতা আছে। মোহনবাগান তখন দুর্ধর্ষ দল, ষরোয়ার্ডে শরৎ সিঙ্গি, কুমার আর রবি গাঙ্গুলি—তিন তিনটে অভ্রান্ত বুলেট—আর ব্যাকে সেই দুর্ভেজ চীনের দেয়াল—গোষ্ট পাল। ক্যালকাটা ভালো করেই জানে শুকনো মাঠে এই দুর্বারণ মোহনবাগানকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাবে না। স্বতরাং বান-ভাসা মাঠে একবার তাকে নামাতে পারলেই সে কোনঠাসা হয়ে যাবে! শেষদিকে বৃষ্টি বন্ধ করানো গেলেও খেলা কিছুতেই বন্ধ করানো গেল না। ক্যালকাটা কর্তৃপক্ষের সে অসংগত অনন্যতা পরোক্ষে দেশের মেরুদণ্ডকেই আরো বেশি উদ্ধত করে তুললে। যে করে হোক পরাভূত করতে হবে এই দম্ভদণ্ডকে। যে সহজ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এসেও ভুলতে পারে না সে উপরিতন, সে একতন্ত্রী।

আর, মোহনবাগানকেও বলিহারি! খেলচিস ফুটবল, ছুটে গিয়ে যেখানে প্রতিপদে আছাড় খেতে হবে, পায়ে বুট পরে নিস না কেন? উপায় কি, বুট

পরলে আর ছুট দিতে পারব না, ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস যে। দেশে-গাঁয়ে
 বখন বাতাবি নেবু পিটেছি তখন থেকে, সেই শুরু থেকেই তো খালি পা।
 জুতো কিনি তার সংগতি কই? স্কুল-কলেজে যাবার জন্তে একজোড়া জোটানোই
 কষ্টকর, তায় মাঠে-মাঠে লাফাবার জন্তে আরেক জোড়া? মোটে মা রঁধেন
 না, তপ্ত আর পাস্তা। দেখ না এই খালি পায়েই কেমন পক্ষিরাজ ঘোড়া
 ছোটাই। কেমন দিগ্বিজয় করে আসি। ভেব না, তাক লাগিয়ে দেব পৃথিবীর।
 খালি পায়েই ঘায়েল করব বুটকে। উনিশশো এগারো সনে এই খালি পায়েই
 শিল্ড এনেছিলাম। এবার পারলাম না, কিন্তু, দেখো, আরবার পারব। যেও
 সব তোমরা।

যাব তো ঠিক, কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো
 মেঘ ভেসে এসেছে, অমনি নিমেষে সন্ধ্যার মুখ কালো হয়ে গেল। হে মা
 কালীঘাটের কালী, হে মা কালীতলার কালী, তোমরা কে বেশি কালো জানি
 না; কিন্তু এ মেঘ তোমাদের গায়ে মেখে-মেখে মুছে দাও মা, তোমাদের
 কালো কেশে উড়িয়ে নিয়ে যাও কৈলাসে। কত তুচ্ছতাক, কত মানৎ, কত
 ইষ্টমন্ত্র, হাওয়া উঠুক, ধুলো উড়ুক, মেঘ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। সব সময় প্রার্থনা
 কি আর শোনে! মেঘের পরে মেঘ শুধু জমাটই হতে থাকে, ঘন নৈরাস্ত্রের
 পর ঘনতর মতস্তাপ। সে যে কী দুঃসময় তা কে বা বোঝে, কাকে বা
 বোঝাই! ঘাড উচু করে শুধু আকাশের দিকে তাকানো আর মেঘের
 অবয়ব আর চরিত্র নিয়ে গবেষণা। পশ্চিমের মেঘ যে অমোঘ হয় এই মর্মস্পর্শ
 সত্য চার আনার সবুজ গ্যালারিতে বসেই প্রথম উপলব্ধি করেছে। ফটিকজল
 পাখি আছে শুনেছি, এখন দেখলাম ফটিকরোদ পাখি। যারা জল চায় না
 রোদ চায়, মেঘের বদলে মরুস্থলীর জন্তে হা হা করে। হেঁকে বৃষ্টি আসবার
 ছড়া আছে, মেঘ-মারণমন্ত্রের প্রথম ছড়া সৃষ্টি হয় এই মোহনবাগানের মাঠে!

ওরে মেঘ দূরে

যা শিগগির উড়ে।

নেবুর পাতা করমচা

রকে বসে গরম চা!

তবু, পাহাড় সরে তো মেঘ সরে না। ব্যাঙের ভক্তিমায় নেমে আসে বাস্তব
 বৃষ্টি। মনে হয় না ঘনকৃষ্ণ কেশ আকুলিত করে কেউ কোনো নীপবনে ধারান্নান
 করছে। বরং মনে হচ্ছে দেশের মাথার উপর ঝরে পড়ছে দোঁর্দণ্ড অভিশাপ।

আর যেমনি জল ঝরল অমনি মোহনবাগানের জোলুস গেল ধুয়ে। আশ্চর্য, তখন তাতে না রইল আর বাগান, না রইল মোহ। তখন তার নাম গোয়া-বাগান বা বাহুরবাগান রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই।

তবু, কালে-ভদ্রে এমন একেকটা রোমহর্ষক খেলা সে জিতে ফেলে যে তার উপর আবার মায়া পড়ে, মন বসে। বারে-বারে প্রতিজ্ঞা করে মাঠ থেকে বেরিয়েছি ও-হতচ্ছাড়ার খেলা আর দেখব না, আবার বারে-বারেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয়েছে। তাই তেবোশো তিরিশের হারের পরও যে মাঠে যাব—কল্লোলের দল নিয়ে—তা আর বিচিত্র কি। ওরা খেলে না জিতুক, আমরা অন্তত টেঁচিয়ে জিতব। জিত আমাদের হবেই, হয় খেলায় নয় এই একত্রমেলার।

“কল্লোলের” লাগোয়া পূর্বের বাড়িতে থাকত আমাদের স্বধীন—স্বধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দলের সর্বকনিষ্ঠ তরুণ উৎসাহী। স্বগৌর-সুন্দর চেহারা, সকলের স্নেহভাজন। দলপতি স্বয়ং দৌলেশদা। যৌবনের সেই ধৌবরাজ্যে বয়সের কোনো ব্যবধান ছিল না, আর মোহনবাগানের খেলা এমন এক ব্যাপার যেখানে ছেলে-বুড়ো শস্তুর-জামাই সব একাকার, সকলের এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। অতি উৎসাহে সামনে কারু পিঠে হস্তো চাপড় দিয়েছি, ভদ্রলোক ঘাড় ফেরাতেই চেয়ে দেখি পূজাপাদ প্রফেসর। উপায় নেই, সব এখন এক সানকির টয়ার মশাই, এক গ্যালারির গায়েক-গায়েন। আরো এফটু টানুন কথাট। এক সুখচুঃখেঃ সমাংশভাগী। তাই, এই দেখুন খেলা, বেশিক্ষণ ঘাড় ফিঃঃ চোখ গোল করে পেছনে তাকিয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। বলা বাড়ি, উত্তেজনার তরঙ্গে এই সব ছোটখাট রাগ-দুঃখের কথা ভুলে যেতে হয়, আর দর্শকদের এই জন্মেঃ স্তব্ধতীর ফলে মোহনবাগান যদি একবার গোল দেঃ, তখন সেই পূজাপাদ প্রফেসরও হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করেন আর ছাত্রের গলা ধরে অনিন্দ-মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খান। সব আবার এক খেলার জল হয়ে যায়।

বস্তুত আট আনার লোহার চেয়ারে বসে কী করে যে ভদ্রলোক সেজে ফুটবল খেলা দেখা চলে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। এক ক্রিকেট খেলা, যে পাঁচ ওভার ঠুকঠাক করবার পর খুঁচ করে একটা ‘ব্লাস্’ হবে, না, সাঁ করে একটা ‘ড্রাইভ’ হবে! এর প্রতিটি মুহূর্ত উদ্বেগে উত্তেজনায় ঠাসা, বল এখন বিপক্ষের গোলের কাছে, পলক না পড়তেই ঘাবার নিজেঃ-নিজের হুংপিণ্ডের দ্বারাঃ। সাধ্য কি তুমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে পার!

এই, সেটোর কর, ওকে পাশ দে, এখানে থু, মার—এমনি বহু নির্দেশ-উপদেশ দিতে হবে তোমাকে। শুধু তাই? কখনো কখনো শাসন-তিরস্কারও করতে হবে বৈ কি। খেলতে পারিস না তো নেমেছিস কেন, ল্যাকপ্যাক করছিস যে মাল খেয়ে নেমেছিস নাকি, বুক দিয়ে পড় গোলের কাছে, পা হুঁথানা যায় তো সোনা দিয়ে মিউজিয়ামে বাঁধিয়ে রাখব! তারপর কেউ যদি গোল ‘মিস’ করে তখন আবার উল্লেখন : বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা মাঠ থেকে, গিল্লির আঁচল ধরে থাক গে। আর বেকারি যদি একটা অমনোমত রায়দেয় অমনি আবার উচ্চাষ : মারো, মারো শালাকে, খোঁতা মুখ ভোতা করে দাও। এ সব মহৎ উদ্বেজনা গ্যালারি ছাড়া আর কোথায় হওয়া সম্ভব? উঠে দাঁড়াতে না পারলে উল্লাস-উল্লাল হওয়া যায় কি করে? তাই গ্যালারিতেই আমাদের কায়মী আসন ছিল, মাঝ-মাঠে সেটারের কাছাকাছি, পাঁচ কি ছয় ধাপ উপরে। প্রায়ই আমরা একসঙ্গে যেতাম কল্লোল-আঁপিস থেকে—দৌনেশদা, সোমনাথ, গোরা, নূপেন, প্রেমেন, স্বধীন আর আমি—কোনো কোনো দিন আশু ঘোষ সঙ্গে জুটত। আরও কিছু পরে প্রবোধ দাভাল। অবিশিষ্ট যে সব দিন এগোরোট-বারোটায় এসে লাইন ধরতে হত সে সব দিন মাঠের বাইরে আগে থেকে সবাইকার একত্র হওয়া যেত না কিন্তু মাঠে একবার ঢুকতে পেরেছি কি নিশ্চিন্ত আছি তোমাব নির্ধারিত জায়গা আছে। নজরুল আরো পরে ঢোকে মাঠে এবং তখন সে বেশ সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিচিহ্নিত। তাই সে জনগণের গ্যালারিতে না এসে বসেছে গিয়ে আট আনার চেয়ারে, কিন্তু তার উল্লাস-উড্ডীন রঙিন উল্লরীয়টি ঠিক আছে। অবিশিষ্ট চাদর গায়ে দিয়ে খেলার মাঠে আসতে হলে অমনি উচ্চতর পদেই আসা উচিত। আমাদের তো জামা কর্দা-ফাঁই আর জুতো চিচিং-ফাঁক। বুষ্টি নেই একবিন্দু, অথচ তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে মাঠে ঢুকে দেখি এক হাঁটু কাদা। ব্যাপার কি? সুনলাম জনগণের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে পড়ে ভূমিতল কাদা হয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে ছাতা না বা ওয়াটার প্রুফ—শুধু এক চশমা সামলাতেই প্রাণান্ত। কহুয়ের ঠেলায় কত লোকের চশমা যে নাসিকাচ্যুত হয়েছে তার ইতি-অন্ত নেই। আর চক্ষুজ্জ্বালীন চশমাই যদি চলে যায় তবে আর রইল কি? কখনো কখনো ভূমিপৃষ্ঠ থেকে পাদম্পর্শ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জলে ভাসা জানি, এ দেখছি স্থলে ভাসা। নয় পদের খেলা দেখতে রিক্ত হাতে শূন্য মাথায় কখনো বা নয় পদেই মাঠে ঢুকেছি।

তুখু গোকুলকেই দেখিনি মাঠে, তার কারণ “কল্লোলের” দ্বিতীয় বছরেই তার অস্থখ করে আর সে-অস্থখ তার সারে না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে শৈলজা একদিন গিয়েছিল আর চুপি-চুপি জিগসেস করেছিল, ‘গোষ্ঠ পাল কোন জন?’ আরো পরে, বুদ্ধদেব বন্ধুকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, ‘কর্নার আবার কাকে বলে?’ শুনেছি ওয়া আর দ্বিতীয় দিন মাঠে যায় নি।

তবু তো এখন কিউ হয়েছে, আগে-আগে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঢুকতে হয়েছে, মাঝদিকে গুণ্ডার কাছ থেকে বেশি দূরে টিকিট কিনে। আগে-আগে গ্যালারির বাইরে কাঁটাতারের বন্ধন ছিল না, বাইরে কত লোককে যে কত জনে টেনে তুলেছে ভিতর থেকে তার লেখাজোখা নেই। যাকে টেনে তুলেছে সে যে সব সময়ে পরিচিত বা আত্মীয়বন্ধু তার কোনো মানে নেই, দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাও বলা যায় না, তবু নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা—এই একটা নিকাম আনন্দ ছিল। এখন কাঁটাতারের বড় কড়াকড়ি, এখন কিউর লাইন এসে দাঁড়ায় হল-গ্যাং-গ্যাংসর্ন পর্যন্ত, খেলা দেখায় আর সেই পৌরুষ কই।

নরক গুলজার করে খেলা দেখতাম সবাই। উল্লাসজ্ঞাপনের যত রকম রীতি-পদ্ধতি আছে সব মনে চলতাম। এমন কি পাশের লোকের হাত থেকে কেড়ে ছাতা ওড়ানো পর্যন্ত। বৃষ্টি যদি নামত চৈচিয়ে উঠতাম সবার সঙ্গে : হাতা বন্ধ, ছাতা বন্ধ। ঘাড় সোজা রেখে ভিজতাম। শেষকালে যখন চশমার কাঁচ মোছবার জন্যে আর শুকনো কাপড় থাকত না তখনই বাধ্য হয়ে ছাতার আশ্রয়ে বসে পড়তে হত। খেলা যদি দেখতে চাও তো বসে থাকো ভিজবে বেরাল হয়ে। মনে আছে এমনি এক বর্ষার মাঠে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এক ছাতার তলায় গুড়ি মেরে বসেছিলাম সারাক্ষণ। বৃষ্টির জলের চেয়ে পার্শ্ববর্তী ছাতার জলই যে বেশি বিরক্তিকর মর্মে-মর্মে বুঝেছিলাম সেদিন।

কিন্তু যদি আকাশভরা সোনার রোদ থাকে, মাঠ শুকনো খটখটে, তবে সব কষ্ট সহ্য করবার দায়ধারী আছি। আর সে গগনদাহন গ্রীষ্মের কষ্টই কি কম! তারপর যদি দুপুর থেকে বসে থেকে মাথার রোদ ক্রমে-ক্রমে মুখের উপর তুলে আনতে হয়! কিন্তু খবরদার, তুলেও জল চেও না, জল চাইতে না মেঘ এসে উদয় হয়! যা দেবী সর্বভূতেষু ভূষারূপেণ সংস্থিতা তার ধ্যান করো। বরফের টুকরো বা কাটা শশা বা বাতাবিনেবু না জোটে তো শুকনো চাঁনেবাদাম খাও।

আর যদি ইচ্ছে করে আলগোছে কারো শূত্র পকেটে শুকনো খোসাগুলো চালান করে দিয়ে বকধার্মিক সাজো।

যেমনি দুই দিক থেকে দুই দল শূন্তে বল হাই কিক মেরে মাঠে নামল অমনি এক ইক্সিতে সবাই উঠে দাঁড়াল গ্যালারিতে। এই গ্যালারিতে উঠে দাঁড়ানো নিয়ে বন্ধুবর শচীন করকে একবার কোন সাপ্তাহিকে আক্বেশ করতে দেখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে তার বক্তব্য ছিল এই, যে, গ্যালারিতে যে যার জায়গায় বসেই তো দিব্যি খেলা দেখা যায়, তবে মিছিমিছি কেন উঠে দাঁড়ানো? শুধু যে যোগ্য উত্তেজনা দেখানোর তাগিদেই উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে তা নয়, উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে আট আনার চেয়ার ও চার আনার গ্যালারির মধ্যকার জায়গায় লোক দাঁড়িয়েছে বলে। বাধ্য হয়েই তাই গ্যালারির প্রথম ধাপের লোককে দাঁড়াতে হচ্ছে এবং ফলে একে-একে অন্ত্যস্ত ধাপ। তাছাড়া বসে বসে বড় জোর হাততালি দেওয়ার মত খেলা তো এ নয়। উঠে দাঁড়াতেই হবে তোমাকে, অন্তত মোহনবাগান যখন গোল দিয়েছে। কখনো-কখনো সে চিংকার নাকি বালি থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত শোনা গেছে। সে চিংকার কি বসে-বসে হয়?

তবু এত করেও কি প্রত্যেক খরার দিনেই জেতাতে পেরেছি মোহনবাগানকে? একেবারে ঠিক চূড়ান্ত মুহুর্তে অত্যন্ত অনাবশ্যক ভাবে হেরে গিয়েছে দুর্বলতর দলের কাছে। কুমোরটুলি এরিয়ান্স হাওড়া ইউনিয়নের কাছে। ঠিক পারের কাছে নিয়ে এসে বানচাল করে দিয়েছে নৌকো। সে সব দুর্দৈবের কথা ভাবতে আজো নিজের জন্তে দুঃখ হয়—সেই ঝোড়ো কাক হয়ে স্নান মুখে বাড়ি ফিরে যাওয়া। চলায় শক্তি নেই, রেস্টুরায় ভক্তি নেই—এত সাধের চীনেবাদামে পর্যাস্ত স্বাদ পাচ্ছি না—সে কি শোচনীয় অবস্থা! ওয়ালফোর্ডের ছাদখোলা দোতলা বাস-এ সাক্ষ্য-ভ্রমণ তখন একটা বিলাসিতা, তাতে পর্যন্ত মন ওঠে না, ইচ্ছে করে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মুখ লুকাই। কে একজন যে মোহনবাগানের হেরে যাওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল তার মর্মবেদনাটা যেন কতক বুঝতে পারি। তখনই প্রতিজ্ঞা করি আর যাব না ঐ অভাগ্যের এলাকায়। কিন্তু হঠাৎ আবার কোন সূদিনে সমস্ত সংকল্প পিটটান দেয়। আবার একদিন পাঞ্জাবির ঘড়ির পকেটে গুনে গুনে পরসী গুঁজি। বুঝতে পারি মোহনবাগান যত না টানে, টানে সেন্টারের কাছাকাছি সেই কল্লোলের দল।

আচ্ছা, এরিয়াল হাওড়া ইউনিয়ন—এরাও তো দিশি টিম, তবে এরা জিতলে খুশি হই না কেন, মনে-মনে আশা করি এরা মোহনবাগানকে ভালোবেসে গোল ছেড়ে দেবে, গোল ছেড়ে না দিলে কেন চটে বাই? যখন এরা সাহেব টিমের সঙ্গে খেলছে তখন অবিশ্বি আছি আমরা এদের পিছনে, কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে এসেছ কি খবরদার, জিততে পাবে না, লক্ষ্মী ছেলের মত লাভু খেয়ে বাড়ি ফিরে যাও। মোহনবাগানের ঐতিহ্যকে নষ্ট কোরো না যেন।

রোজ-রোজ খেলা দেখার ভিড় ঠেলার চেয়ে মোহনবাগানের মেম্বর হয়ে যাওয়া মন্দ কি। মেম্বর হয়েও যে কি দুর্ভাগ হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত দেখলাম। একদিন কি একটা খবরের কাগজের স্তম্ভকাঁপানো বিখ্যাত খেলায় দেখতে পেলাম তিন-চারজন মেম্বর মাঠে না ঢুকে বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, তাদের ঘরে ছোট্ট একটি ভিড়। বিশ্বাসাতীত ব্যাপার—ভিতরে ঐ চিত্ত-চমকানো খেলা, আকাশ ঝলসানো চিৎকার—অথচ এ কয়জন জাঁদরেল মেম্বর বাইরে ঘাসের উপর বসে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট খাচ্ছে আর মন্দ-মন্দ পা দোলাচ্ছে। ভিড়ের থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে বিম্বিত স্বরে জিগগেস করলে, ‘এ কি, আপনারা মাঠে ঢোকেন নি যে?’ ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বললে : ‘আমরা তো কই মাঠে ঢুকি না, বাইরেই বসে থাকি চিরদিন। আমরা non-seeing মেম্বর।’ তার মানে? তার মানে আমরা অপয়া, অনামুখো, অলক্ষ্যে, আমরা মাঠে ঢুকলে মোহনবাগান নির্বাং হেরে যায়, মেম্বর হয়েও আমরা খেলা দেখি না, বাইরে বসে দাঁতে ঘাস কাটি আর চিৎকার শুনি।

এই অপূর্ব স্বার্থশূন্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। বাড়িতে বা অত্র কোথাও গেলে বা বসে থাকলে চলবে না, খেলার মাঠে অনায়াসে ঢোকবার হকদার হয়েও ঢুকবে না কিছুতেই, বাইরে বসে থাকবে এককোণে—এমন আত্মত্যাগের কথা এ যুগের ইতিহাসে বড় বেশি শোনা যায়নি। আরও একটা উদাহরণ দেখেছি স্বচক্ষে—একটি খল্ল ভদ্রলোকের মাধ্যমে। কি হল, পা গেল কি করে? গাড়ি-চাপা? ভদ্রলোক কঠিন মুখে করুণভাবে হাসলেন। বললেন, ‘না। ফুটবল-চাপা।’ সে কি কথা? আর কথা নয়, কাজ ঠিক আদায় করে নিয়েছেন বোল আনা। শুধু আপনাকে বলছি না, দেশের লোককে বলছি। সবাই বলেছিলেন ফুটবল মাঠে পা-খানা রেখে আসতে, আপনাদের কথা শুনে তাই রেখে এসেছি। কই শোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবেন না যাহ্নঘরে?

এগারো

ফুটবল খেলার মাঠে দু'জন সাহিত্যিককে আমরা আবিষ্কার করি। শিবরাম চক্রবর্তী সেন্টারের কাছে গ্যালারির প্রথম ধাপে ঝাঁড়াত—তাকে টেনে আনতে দেরি হত না আমাদের দশচক্রে। গোলগাল নখরকাস্তি চেহারা, লম্বা চুল পিছনের দিকে ঝলটানো। সমস্তটা উপস্থিতি রসে-হাস্তে সমৃদ্ধ। তারমধ্যে শ্বেদ আছে, কিন্তু ঘেঘ নেই—সে সরসতা সরলতারই অগ্র নাম। “ভারতী”তে অদ্ভুত কতকগুলো ছোট গল্প লিখে অস্বাভাবিক খ্যাতি অর্জন করেছে, আর তার কবিতাও স্পষ্টস্পর্শ প্রেমের কবিতা—আর সে প্রেম একটু জরো হলেও জল-বার্লি-খাওয়া প্রেম নয়। শিবরামের সত্যিকারের আবির্ভাব হয় তার একান্ত নাটিকায়—“যেদিন তারা কথা বলবে” আজকালকার গণসাহিত্যের নিভূল পূর্বগামী। সেই স্তরুতার দেশে বেশি দিন না থেকে শিবরাম চলে এল উজ্জল-উজ্জল মুখরতার দেশে। কলহাস্তের মুখরতা। শিবরাম হাসির গঞ্জে কায়োম বাসা বাঁধলে। বাসা যেমন পাকা, স্বস্তিও তেমনি উচুদরের :

হাসির প্রাণরস প্রসবণ এই শিবরাম। সবচেয়ে সুন্দর, সবাইকে যখন সে হাসায় তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সে হাসে এবং সকলের চেয়ে বেশি হাসে। আর হাসলে তাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। গালে কমনীর টোল পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু তার মন যে কী অগাধ নির্মল, তার পাংছন্ন ছায়া তার মুখের উপর ভেসে ওঠে। পরকে নিয়ে হয়তো হাসছে তবু সর্বক্ষণ সেই পরের উপর তার পরম মমতা! শিবরামের কোন দল নেই হৃদয় নেই। তার হাসির হাওয়ার জগ্রে প্রত্যেকের হৃদয়ে উন্মুক্ত নিমগ্ন। শিবরামই বোধ হয় একমাত্র লোক যে লেখক হয়েও অগ্রের লেখার আবিষ্কাশ প্রশংসা করতে পারে। আর সে-প্রশংসায় একটুকু ফাঁক বা ফাঁকি রাখে না। আজকালকার দিনে লেখক, লেখক হিসাবে যত না হোক, সমালোচক হিসাবে বেশি বুদ্ধিমান। তাই অগ্র লেখককে পরিপূর্ণ প্রশংসা করতে তার মন ছোট হয়ে আসে। হয়ত ভাবে, অনেক প্রশংসা করলে নিজেই ছোট হয়ে গেলাম। আর যদি বা প্রশংসা করতে হয় এমন কটা ‘কিন্তু’ আর ‘যদি’ এনে ঢোকাতে হবে যাতে বোকা যাবে লেখক হিসাবে তুমি বড় হলেও বোকা হিসাবে আমি আরো বড়। মানে প্রশংসা করতে হলে শেষ পর্যন্ত আমিই যেন জিভি, পাঠকেরা আমাকেই যেন প্রশংসা

করে। বুদ্ধির সঙ্গে এমন সঙ্গী আপোশ নেই শিবরামের। যদি কোনো লেখা তার মনে ধরে সে মন মাতিয়ে প্রশংসা করবে। আর প্রশংসা করবে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজের জন্তে এতটুকু সুখ-সুবিধে না রেখে। এই প্রশংসায় তার নিজের বাজার উঠে গেল কিনা তার দিকে না তাকিয়ে। যজ্ঞর দেখেছি, শিবরামই তাদের মধ্যে এক নম্বর, যারা লেখক হয়েও অল্প লোকেয় লেখা পড়ে, ঠিকঠাক মনে রাখে ও গায়ে পড়ে ভালো লেখার সুখ্যাতি করে বেড়ায়।

কিন্তু এক বিষয়ে সে নিদারুণ গম্ভীর। অন্তত সে সব দিনে থাকত। হাই-কোর্টের আদিম বিভাগে কি এক মহাকায় মোকদ্দমা হচ্ছে তার কলাফল নিয়ে। অবশি অকল নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, কেননা অকলে যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে, মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রিটে মেসে সেই ‘তক্তারামে’ শোওয়া আর ‘শুক্তারাম’ ভক্ষণ—এ তার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু কল হলেই বিপদ। তখন নাকি অর্ধেক রাজ্য আর সেই সঙ্গে আস্ত একটি অর্ধাঙ্গিনী জুটে যাবার ভয়। মোকদ্দমায় যে ফল হয়নি তা শিবরামকে দেখলেই বোঝা যায়। কেননা এখনো সে ঐ একই আছে, দেড় হয়নি; আর মুক্তির আরামে আছেও সেই মুক্তারামবাবুর মেসে। সামাজীবনে যে একবারও বাসা বদল করে না সে নিঃসন্দেহ খাটি লোক।

মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, আর শিবরামের মুখে চলেছে শব্দের খেলা। কুমার হয়তো একটা ভুল পাশ দিলে, অমনি বলে উঠল ‘কু-মার’; কিংবা গোষ্ঠর সঙ্গে প্রবল ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল বিপক্ষের খেলোয়ার, অমনি বলে উঠল : ‘এ বাবা, শুধু গোষ্ঠ নয়—গোস্ত।’ মাঠের বাইরেও এমনি খেলা চালাত অবিরাম। জুংসই একটা নাম পেলেই হল—শত্রু মিত্র আসে যায় না কিছু। নিজের নামের মধ্যে কি মজার pun রয়েছে শুধু সেই সম্বন্ধেই উদাসীন।

আরেক আবিষ্কার আমাদের বিস্মদা—বিশ্বপতি চৌধুরী। একথানা বই লিখে যে বাড়লা সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। ‘ঘরের ডাক’-এর কথা বলছি—খেলার মাঠেও তার সেই ঘরের ডাক, হৃদয়ের ডাক। সহজেই আমাদের দলের মধ্যে এসে দাঁড়াত আর হাসাত অসম্ভব উচ্চ গ্রামে। হাসাত অথচ নিজে একটুকু হাসত না—মুখ চোখ নিদারুণ নির্জিগ্ম ও গম্ভীর করে রাখত। সমস্ত হাসির মধ্যে বিস্মদার সেই গাভীর্ষটাই সব চেয়ে বেশি হাস্যোদ্বীপক। শিবরাম শুধু বক্তা, কিন্তু বিস্মদা অভিনেতা। শিবরামের গল্প বাক্য, কিন্তু বিস্ম-

দায় গল্প একদম বানানো ; অথচ, এ যে বানানো তা তার চেহারা দেখে কার সন্দেহ করার সাধ্য নেই। ঝরং মনে হবে এ যেন সস্ত-সস্ত ঘটেছে আর বিত্তদা স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী। এমন নিষ্ঠুর ও নিখুঁত তার গাভীৰ্ব। উদ্ভাস কল্পনার এমন মৌলিক গল্প রচনার মধ্যেও বাঁহাহুরি আছে। আর সবচেয়ে কেরামতি হচ্ছে, সে-গল্প বলতে গিয়ে নিজে এতটুকু না-হাসা। মনে হয়, এ যেন মোহন-বাগান গোল দেবার ‘গো—ল’ না-বলা। ওনলে হয়তো সবাই আশ্চর্য হবে, মোহনবাগান গোল দেয়ার পরেও বিত্তদা গভীর থেকেছে।

তার গাভীৰ্বটাই কত বড় হাসির ব্যাপার, একদিনের একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। খেলার শেষে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি কিরছি, সঙ্গে বিত্তদা। সেদিন মোহনবাগান হেবে গেছে যেন কার সঙ্গে, সকলের মন-মেজাজ অত্যন্ত কুংসিত। বিত্তদা যেমন-কে-তেমন গভীর। কতদূর এগোতেই সামনে দেখি কতকগুলো ছোকরা দুই দলে ভিন্ন হয়ে গিয়ে একে-অন্যকে নৃশংসভাবে গালাগাল করছে। আর এমন সে গালাগাল যে কালাকাল মানছে না। তার মানে, একাল নিয়ে তত নয়, বত পূর্বপুরুষদের কাল নিয়ে তাদের মভাস্তর। প্রথম দলের দিকে এগিয়ে গেল বিত্তদা। স্বাভাবিক শাস্ত গলায় বললে, ‘কি বাবা, গালাগালি দিচ্ছ কেন?’ বলেই বলা-কওয়া নেই কতকগুলি চোঙ গালাগাল বিত্তদা তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। তারা একদম ভাবাচাকা খেয়ে গেল—কে এই লোক! পরমুহূর্তেই অপর দলকে লক্ষ্য করে বিত্তদা বললে, ‘সব ভত্রলোকের ছেলে তোমরা, গালাগাল করবে কেন?’ বলেই ওদেরো দিকে কতকগুলো গালাগাল ঝাড়লে। প্রথম দল তেড়ে এল বিত্তদার দিকে : ‘আপনি কে মশায় আমাদের গালাগাল দেন?’ দ্বিতীয় দলও মারমুখো : ‘আপনি গালাগাল করার কে? আপনাকে কি আমরা চিনি, না, দেখেছি?’ দেখতে দেখতে দু’দল একত্র হয়ে বিত্তদাকে আক্রমণ করতে উত্তত হল। বিত্তদার গভীর মুখে তুট্ট একটু হাসি। করজোড় করে বললে, ‘বাবা, আর কেন? যে ভাবেই হোক, দু’দলকে মিলিয়ে দিয়েছি তো! যাও বাবারা, বাড়ি যাও। এমনি একত্র হয়ে থাক—মাঠের খেলায় দেশের খেলায় সব খেলায় জিততে পারবে। আমার শুধু মিলিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা। নইলে, আমি কেউ না।’

ছেলেরা দলভুক্ত হেসে উঠল। বিত্তদার ধোপে কোথাও আর এতটুকু ঝগড়াঝাটি রইল না।

বিশপতি আর শিবরাম “কল্লোলে” হয়তো কোনদিন লেখেন কিন্তু দু’জনেই

“কল্লোলের” বন্ধু ছিল নিঃসংশয়। মনোভঙ্গিও দিক থেকে শিবরাম তো বিশেষ শরগোত্র। কিন্তু এমন একজন লোক আছে যে আপাতদৃষ্টে “কল্লোলের” প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও প্রকৃতপক্ষে “কল্লোলের” স্বজনস্বজন। সে কান্নীর স্বরেশ চক্রবর্তী—“উত্তরা”র উত্তরসাধক।

আমরা তার নাম রেখেছিলাম ‘চটপটি’। ছোটখাটো মানুষটি, মুখে অনর্গল কথা, যেন তপ্ত খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে—একদণ্ড একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে নাযায়, হাতে-পায়ে অসামান্য কাজকে সংক্ষিপ্ত করার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা। এক কথায় অদম্য কর্মশক্তির অনম্য প্রতিমান। একদিন “কল্লোলের” কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দোকানে এসে উপস্থিত—সেই সর্বভ্রগামী পবিত্রের সঙ্গে। কি ব্যাপার? প্রবাসী বাঙালীদের তরফ থেকে দূর লখনউ থেকে মাসিকপত্রিকা বের করা হয়েছে—চাই “কল্লোলের” সহযোগ। সম্পাদক কে? সম্পাদক লখনউর সার্থকনামা ব্যারিস্টার—এ পি সেন—মানে, অতুলপ্রসাদ সেন আর প্রতিভাশ্রী প্রাক্ষের রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তবে তো এ মশাই প্রৌঢ়পন্থী কাগজ, এর সঙ্গে আমাদের মিশ খাবে কি করে? আমরা যে আধুনিক, অমল হোমের প্রশস্তি অনুসারে “অতি-আধুনিক”। আমরা যে উগ্রজলন্ত নবীন।

কোনো বিধা নেই। “উত্তরা” নিরন্তর থাকবে না তোমাদের তাকণোর বাণীতে। যেমন আমি, স্বরেশ চক্রবর্তী, ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের বন্ধুতার ডাকে নিমেষেই সাড়া দিয়ে উঠেছি। কে তোমাদের পথ আটকাবে, কে মুখ ফিরিয়ে নেবে অস্বীকারে? আর যা আন্দাজ করছে তা নয়। অতুলপ্রসাদ অবিস্ত্রি ভালোমানুষ, বাংলা সাহিত্যের হালচাল সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন। মোটা আয়ের প্র্যাকটিস, তাই নিয়ে যেতে থাকেন। যখন এক-আধটু সময় পান, হালকা গান বাঁধেন। (হালকা মানে গড়ন-পিটনটা হালকা, কিন্তু রস গভীরসঞ্চারী। সে-রস সোজা হৃদয়ের থেকে উঠেছে বলেই বোঝা যায় তার হৃদয়ও কত গভীর আর কত গাঢ়।) তিনি শুধু নাম দিয়েই খালাস। প্রবাসী বাঙালীর উন্নতি চান, আর তাঁর মতে উন্নতির প্রথম সোপানেই মাতৃভাষায় একখানি পত্রিকা প্রসার। তাঁকে তোমরা বিশেষ ধোয়ো না। আর রাধাকমল? বয়সে তিনি প্রবীণ হলেও জেনে রাখো, তিনি সাহিত্য-প্রগতিতে বিশ্বাসী, নতুন লেখকদের সমর্থনে উচ্চতাজ্ঞ। তাঁকে আপনলোক মনে করো। আর অত উচ্চদৃষ্টি কেন? সামনে এই বেকিতে সম্মুখে বসে আছি আমি, তাকে দেখ। যে আসল কর্ণধার, যে মূলকারক।

স্বরেশ চক্রবর্তী কি করে এল সাহিত্যে, কবে কখন কি লিখল, বা আদৌ কিছু লিখেছে কিনা, প্রশ্ন করার কথাই কাক মনে হইল না। সাহিত্যে তার আবির্ভাবটা এত স্বাভাবিক। সাহিত্য তার প্রাণ, আর সাহিত্যিকরা তার প্রাণের প্রাণ। সব সাহিত্য আর সাহিত্যিকের খবর-অখবর তার নথ্যদর্পণে। সে যে বিশেষ করে অতি-আধুনিকদের নিয়ন্ত্রণ করেছে এতেই তো প্রমাণ হচ্ছে তার উদার ও অগ্রসর সাহিত্যিক দৃষ্টি। যদিও কান্নিতে সে থাকে, আমল কান্নিবাস তো সংস্কে। আমাদের যখন ডাকছে, বললাম স্বরেশকে, তার কান্নিবাস এতদিনে সফল হল।

‘শেষকালে কান্নিপ্রাপ্তি না ঘটে।’ আমাদের মধ্যে থেকে কে টিঙ্গলী কাটলে। না, তেরোশ বজ্রিশে যে “উত্তরা” বেয়িয়েছিল তা এখনো টিকে আছে। “কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি” আর নেই, কিন্তু “উত্তরা” এখনো চলছে। এ শুধু একটা আশ্চর্য অহুর্মান নয়, স্বরেশ চক্রবর্তীই একটা আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। সাহিত্যের কত হাওয়া-বদল হল, কত উত্থান-পতন, কিন্তু স্বরেশের নড়চড় নেই, বিচ্ছেদ-বিরাগ নেই। ঝড়ের বাতেও নিভীক দীপস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে উপেক্ষিত নিঃসঙ্গতায়।

“উত্তরা”র ছ’জন নিজস্ব লেখক ছিল; যদিও তাঁরা মার্কা-স্বারা নয়, মননে-চিন্তনে তাঁরা তর্কাতীত আধুনিক, আর আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত মতাহুগত না হওয়া। ছ’জনেই পণ্ডিত, শিক্ষাদাতা; কিন্তু মনেতে যেমন অবড়ভঙ্গ শোনাচ্ছে, তাঁদের মনে ও কলমে কিন্তু এতটুকুও জ্বল ধরেনি। রূপালি রোদে ঝিলিকমারা ইম্পাতের মত তাতে যেমন বুদ্ধির ধার তেমনি ভাবের জেগা। এক হচ্ছেন লখনউর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর হচ্ছেন কান্নির মহেন্দ্র রায়। একজন বাকাকুশল, আরেকজন স্থিতাক্ষর। কিন্তু দু’জনেই আসর-জমানো মজলিসীলোক—আধুনিকতার গূর্ণপোষক। একে-একে সবাই তাই ভিড়ে গেলাম সে-আসরে। নজরুল, অগদীশ গুপ্ত, শৈলজা, প্রেমেন, প্রবোধ, বুদ্ধদেব, অজিত। বকবকে কাগজে বরবরে ছাপা—“উত্তরা” সাত-সল্লারও উত্তরা। সবাইই মন টানল।

লবচরে বড় ঘটনা, সাহিত্যের এই আধুনিকতা প্রথম প্রফাণ্ড অভিনন্দন পায় এই প্রবাসী “উত্তরা”র। সেই উজোগ-উত্তর গোড়াতেই। আর, স্বয়ং রাধাকমলের লেখনীতে। দুঃসাহসিক আন্তরিকতার তাঁর সমস্ত প্রবন্ধটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সত্য শোনাগ। শুধু তাবের নবীনতাই নয়, তাবার সজীবতাকেও তিনি

প্রশংসা করলেন। চারদিকে হৈ-ঠৈ পড়ে গেল। আমরা মেতে উঠলাম আর আমাদের বিকৃত হল তেতে উঠল। বার শক্ত আছে তার শক্তও আছে। শক্ততাটা হচ্ছে শক্তিপূজার নৈবেদ্য। আমাদের নিন্দা করার মানেই হচ্ছে আমাদের বন্দনা করা।

মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায়, তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছে থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বন্টিতা, সত্যভাবিতা বা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম, তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল :

“হে প্রাণ-মাগর ! তোমাতে সকল প্রাণের নদী

পেয়েছে বিয়াম, পথের প্রাবল-বিরোধ রোধি” !

হে মহামৌনি, গহন তোমার চেতনতলে

মহাবুদ্ধিব্যারণ তৃপ্তি-মত্ত জলে !

ধবস্তুরি ! মধুস্তব-মধু-শয—

তব করে হোব মৃত্যুগু—অবিদ্বের !”

কিংবা

“পাপ কোথা নাহ—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান—

গয়েছিল আলো বায়ু নদীভল তরুণতা—মধুমান !

প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,

সে রস বিরস হতে পারে কতু ? হবে তার অপযশ ?”

ফুটপাথের উপর গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন তখন আবৃত্তির বিহীনতায় তাঁর দুই চোখ বুজে যেত। আমরা কে শুনিছি বা না শুনিছি, বুঝি বা না বুঝি, এটা রাস্তা না বাড়ি, সে-সব সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল, তিনি যে তদগতচিত্তে আবৃত্তি করতে পারছেন সেইটেই তাঁর বড় কথা। কিন্তু যদি মুহূর্তমাত্র চোখ মেলে দেখতেন সামনে, দেখতে পেতেন আমাদের মুখে লেশমাত্র বিরক্তি নেই, বরং ভক্তির নম্রতায় সমস্ত মুখ-চোখ গদগদ হয়ে উঠেছে। স্থান ও সময়ের সীমাবোধ সত্ত্বেও তিনি কিঞ্চিৎ উদাসীন হলেও তাঁর কবিতার চিত্তহারিতা সত্ত্বেও আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহান ছিলাম না।

তিনি নিজেও সেটা বুঝতেন নিশ্চয়। তাই একদিন পবন-প্রত্যাশিতের মত
 এলেন আমাদের আস্তানায়, শোপেনহাওয়ার-এর উদ্দেশে লেখা তাঁর বিখ্যাত
 কবিতা “পাছ” সঙ্গে নিয়ে। সেই কবিতা “আধুনিকতায়” দেদীপ্যমান।
 “কল্লোলে” বেরিয়েছিল ভেরোশ বক্তৃতির ভাদ্র সংখ্যায়। আর এ কবিতা বের
 করতে পারে “কল্লোল” ছাড়া আর কোনো কাগজ তখন ছিল না বাংলাদেশে।

“স্বন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী !
 লভ্যে চাহি না তবু, স্বন্দরের করি আরাধনা—
 কটাক্ষ-দৈক্য তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
 স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !
 নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব লাবণি !
 স্বর্ণপাঞ্জে স্বধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা !
 পান করি অনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
 ব্যাঘ্র বিবশ, তবু হোম করি জালি কামানল !—
 এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই স্তব্ধ ! নেত্রে মোর নাচে
 উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা ! পাঞ্জে ঢালি লোহিত গরল !
 মৃত্যু ভূত্যরূপে আসি ভয়ে-ভয়ে পরসাদ ষাচে !
 মুহূর্তে মধু লুটি—ছিন্ন করি হৃদপদ্মদল !
 ষামিনীর ডাকিনীর তাই হেরি একসাথে হাসে খল-খল !

চিনি বটে ঘোবনের পুরোহিত প্রেম দেবতারে,—
 নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি’ ;
 অনন্তরহস্তময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে
 মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী !
 নেত্র তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিধারে ।
 বিশ্বংগী রশ্মিগাগ ! কটিভলে জন্ম-রাজধানী ।

উষসের অগ্নিসিঁরি স্রষ্টার উদ্ভাপ-উৎস । জানি তাহা জানি ।”

অবিস্মরণীয় কবিতা। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব ঐশ্বর্য। তারপর তাঁর
“শ্রেতপুরী” বেবোয় অগ্রহায়ণের “কল্লোলে”।

“হেরি উরসের যুগ্ম ঘোবনমঞ্জরী
যে-অনল সর্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চারি
মর্মগ্রস্থি মোর

হাহ করি গড়ে পুনঃ সোহাগের মেহ-হেম তোর—
সে অনল পরশের আশে

মোর মত দেখি তারা ঘুরে ঘুরে আসে তব পাশে।

বিলোল কবরী আর নীবিবদ্ধ মাঝে
পেলব বন্ধিম ঠাই যেথা বত রাজে—

খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব-অগ্রে ব্যগ্র জনে-জনে,
অভয় তনু-তীর্থ—জাবণের লীলা নিকেতনে।

বত কিছু আদর-সোহাগ—

শেষ করে গেছে তারা! মোর অহুয়ান,
চূষন আল্লেব—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহুকৃত প্রণয়ের হীন অহুকৃতি!...

আজি এ নিশায়—

মনে হয়, তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়ে তোমায়!

তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা!

বত কিছু পান করি রূপরসধারা—

তারা পান করিয়াছে আপে।

সর্বশেষ ভাগে

তাদেরি প্রসাদ যেন ভূষিতেছি দায়!

নাহি হেন কুল-কল কামনার কল-লভিকার,
যার 'পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হবে নাই যাহার পরাগ।

ওগো কাম-বধু!

বল, বল, অহুচ্ছিন্ন আছে আর এতটুকু মধু?

য়েখেছ কি আমার লাগিয়া সবভনে

মনোমঞ্জরী তব পীরিত্তির অরূপরভনে?

আমাদের মিটেছে সাধ
 চিন্তে মোর নামিরাছে বহুজনতৃপ্তি-অবসাদ ।
 তাই যবে চাই তোমাশানে—
 দেখি ওই অনাবৃত দেহের আশানে
 প্রতি ঠাই আছে কোনো কামনার মণ বলিদান !
 চুষনের চিত্তাভ্রম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !
 বাধিবারে ঘাই বাহুপাশে
 অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়াযুতি ভাসে ।
 দিকে দিকে প্রেতের পহরা !
 গুণে নারী, অনিন্দিত কান্তি তব!—মরি মরি রূপের পসরা !
 তবু মনে হয়
 ও সুন্দর স্বর্ণখানি প্রেতের আলয় !
 কামনা-অক্লুশ ঘাতে যেই পুনঃ হইল বিকল
 অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !
 তীত্র স্থপ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মুহু আউনাদে—
 নীরব নিশীথে কারা হাহাধরে উচ্চকণ্ঠে কাদে ।”

মোহিতলালও এলেন “উত্তরা”র—এলেন আমাদের পুরোবর্তী হয়ে ।
 “কল্লোলে”র সঙ্গে সঙ্গে “উত্তরা”ও সরগরম হয়ে উঠল । কিন্তু দিন যেতে-না-
 যেতে কেমন বেহুশ ধরল বাজনায । মতে বা মনে কোনো অমিল নেই, তবু
 কেন কে জানে, মোহিতলাল বঁকে দাঁড়ালেন—কল্লোলের দলের যে সব লেখক
 তোমার কাগজে লেখে তাদের সংশ্রব যদি না ত্যাগ করো তবে আমি আর
 “উত্তরা”র লিখব না ! সুরেশ মেনে নিতে চাইল না এ শর্ত । ফলে, মোহিতলাল
 বর্জন করলেন “উত্তরা” । সুরেশ আরো দুর্দম হয়ে উঠল । এত প্রার্থন্য যেন
 সইল না অতুলপ্রসাদের । তিনি সরে দাঁড়ালেন । তবু সুরেশ অবিচ্যুত ।
 রাধাকমল আছেন, যিনি “সাহিত্যে অল্লীলতা” নামক প্রবন্ধে রায় দিয়েছেন
 আধুনিকতার স্বপক্ষে । কিন্তু অবশেষে রাধাকমলও বিযুক্ত হলেন । সুরেশ একা
 পড়ল । তবু সে দমল না, পিছু হঠল না । প্রতিজ্ঞার পতাকা ঝাড়া
 করে রাখল ।

তবু, কেন জানি না, “কল্লোলের” সঙ্গে শুধু “কালি-কলমের” সংস্রবটাই লোকে

জুড়ে দেয়—“উত্তরা”র কথা দিবি তুলে থাকে। এ বোধ হয় শুধু অহুপ্রাসেব খাতিরে। নইলে, একই লেখকদল এই তিন কাগজে সমানে লিখেছে—সমান স্বাধীনতায়। “কালি-কলমের” মত “উত্তরা”ও এই আধুনিক ভাবের তত্ত্বধারক ছিল। বরং “কালি-কলমের” আগে আবির্ভাব হয়েছিল “উত্তরা”র। “কালি-কলমের” জন্মের পিছনে হয়তো খানিকটা বিক্ষোভ ছিল, “উত্তরা”র শুধু সৃজনস্বরের মহোলাস। “কলোলা”-“কালি-কলমে”র বহু অসম্পূর্ণ কাজ “উত্তরা” করে দিয়েছে। যেমন আরো বহু পরে করেছে “পূর্বাশা”।

নিজে লেখেনি, অকণ্টক স্বযোগ থাকলেও কোনোদিন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা নিজেই সাহিত্যিক অহমিকা, অবচল নিষ্ঠার সাহিত্যের ব্রতোদ্ঘাপন করেছে, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে শুধু সাহিত্যিকের স্বকীতি। এ চিরসংগ্রামশীল তুচ্ছ ব্যক্তিকে কি বলে অভিহিত করব? স্বরশকে নিশ্চয় সাহিত্যিক বলব না, বলাব সাহিত্যের শক্তিদীপ্ত ভাস্কর। রূপদক্ষ কারুকার।

মোহিতজালের মত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আবাসনীয় ছিলেন—ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মগ্নও ছিলাম। তাই নৈরাত্তের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে আকৃতি করতাম ‘ময়ীচিকা’। এমনি টুকরো-টুকরো লাইন :

“চোরাপুঞ্জের পেকে

একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে।”

“তুমি শালগ্রাম শিলা

শোয়া বসা যার সকাল সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।”

“মরণে কে হবে সাথী,

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাত্তি।”

“মিছে দিন যায় বয়ে

উপরে ও নীচে ঘূমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে।”

“চারিদিক-দেখে চারিদিক থেকে বুঝিগাছি আমি ভাই,

নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।

ঝিম ঝিম নিশ্চিন্ত—

নাকের ভগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন ত’

যতীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রণ নিয়েছিলেন “কল্লোলের”। যতদূর মনে পড়ে তাঁর প্রথম কবিতা বেরোর “কল্লোলের” দ্বিতীয় বছরে মাধ্যমাসে। কবিতার নাম ‘অন্ধকার’ :

“নিখিতা জননীবক্ষে স্থপোষিত শিশু

খেলা করে ল’য়ে কণ্ঠহার।

কোন মহাশিশু ক্রীড়ান্তরে

তব বৃকে

ঘুরাইছে জ্যোতির্ম্বালা বিশ্ব-শৃঙ্খলার ?

অন্ধকার, মহা অন্ধকার !”

এর পরে আরো কয়েকটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন—তার মধ্যে তাঁর “রেল-ঘুম”টা উল্লেখযোগ্য। চলন্ত ট্রেনের অত্মসম্বরণ করে কবিতার ছন্দ বাঁধা হয়েছিল। সত্যেন দত্তের পালাকি বা চরকার কবিতার মত। আমাদের কাছে কেমন কৃত্রিম মনে হয়েছিল, কেমন আন্তরিকতাবঞ্চিত। মনে আছে, প্রথম ঘোঁড়রীকে পড়িয়ে শোনানো হয়েছিল কবিতাটা। তিনি বলেছিলেন, ‘মরীচিকা’র কবির কোনো কবিতাই অপাণ্ডিত্যের হতে পারে না। এর মোটে বছর খানেক আগে ‘মরীচিকা’ বেরিয়েছে। একখানা ছোট কবিতার বইয়ে এর মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বিদগ্ধজনমনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

যতীন্দ্রনাথের মিত্রা যতীন্দ্রমোহন বাগচিও কি তাই না এলে পাবেন “কল্লোলে” ? আর তিনি এলেন, তাবতে অদ্ভুত লাগছে, একেবারে মদ্রি-মৌবনের বেশে, কবিতার নামও “যৌবন-চাকলা”।

“সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—

ভূটিয়া যুবতী চলে পথ।

টস্টসে রস-ভরপুর

আপেলের মত্ত-মুখ

আপেলের মত বৃক

পরিপূর্ণ প্রবল প্রহর

মৌবনের রসে ভঃপুর।

নেম ভাকে কড় কড়

বুঝিবা আসিবে ঝড়,

তিলেক নাহিক ডর তাতে ।

উষারি বৃকের বাস

পুরায় মনের আশ

উরস পরশ করি হাতে ;

অজানা বাধায় স্তম্ভুর

সেধা বুঝি করে গুরগুর ।

সুবতী একেলা পথ চলে

পাশের পলাশ বনে

কেন চায় কণে-কণে

আবেশে চরণ যেন টলে

পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে ।

আপনার মনে যায়

আপনার মনে গায় ।

তবু কেন আন-পানে টান !

করিতে রসের সৃষ্টি

চাই কি হৃদয়ের দৃষ্টি ?

স্বরূপ জানেন ভগবান !”

“কল্লোলের” যৌবন-চাক্ষু্য তা হলে খালি “কল্লোলের”ই একচেটে নয় ।

না, কি “কল্লোলের” হয় আরো উচ্চরোলে বাধা ? তার চাক্ষু্য আরো
বেগবান ? তার যাত্রা আরো দূরাধেযী ?

“বৃন্তবন্ধুহারী

যাব উদ্ধামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,

রিক্তবৃষ্টি হেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,

যাব, যেথা শব্দের টলমল চরণ-পাতনে

জাহ্নবী তরঙ্গমল্লমুখরিত তাণ্ডব-মাতনে

গেছে উড়ে অটোভট ধূতীর ছিন্নভিন্ন দল,

ককচ্যুত ধ্বংসেতু লক্ষ্যহারী প্রলয়-উজ্জল

আজ্ঞাবাহমদমন্ত আপনায়ে দীর্ঘ কর্ষ করে

নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উদ্‌গিশু করে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ—”

তাই কি চলেছি আমরা ?

বারো।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম কবে দেখি ?

প্রথম দেখি আঠারোই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩০ সাল। সেবার বি.এ. র বছর, ঢুকিনি তখনো “কল্লোলে”। রবীন্দ্রনাথ সেনেট হলে কয়লা-লেকচার দিচ্ছেন। ভবানীপুরের ছেলে, কলকাতার কলেজে গতিবিধি নেই, কোণঠাসা হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু গুরুবলে ভিত্তি ঠেলে একেবারে মকের উপর এসে বসেছি।

সেদিনকার সেই দৈবত আবির্ভাব যেন চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ধরা আছে। স্মৃতিগত অঙ্কবাবে সহস্রোখিত দিবাকরের মত। ধ্যানে মে-মুষ্টি ধারণ করলে দেহ-মন রোমাঙ্কিত হয়ে ওঠে। ‘বাস্তবশুদ্ধপ্রোত্তপ্রাণপ্রাণ’ নতুন করে প্রাণ পায়। সে কি রূপ, কি বিভা, কি ঐশ্বর্য! মানুষ এত স্মার হতে পারে, বিশেষত বাংলাদেশের মানুষ, কল্পনাও করতে পারতুম না। রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও স্মার। স্মার হ্রত দুর্লভদর্শন দেবতার চেয়েও।

বাংলাদেশে এক ধরনের কবিরানাকে ‘রবিরানা’ বলত। সে আখ্যাটা কাব্য ছেড়ে কাব্যাকারের চেহারায়ও আরোপিত হত। যাদের লম্বা চুল, হিলহিলে চেহারা, উঁচু উঁচু ভাব, তাদের সম্পর্কেই বলা হত এই কথাটা। রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হল ওরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেনি কোনদিন। রবীন্দ্রনাথের চেহারায় কোথাও এতটুকু দুর্বলতা বা ক্লান্ততার ইঙ্গিত নেই। তাঁর চেহারায় লালিত্যের চেয়ে বলশালিতাই বেশি দীপ্যমান। হাতের কবজি কি চওড়া, কি সাহসবিস্তৃত বিশাল বকপট! ‘স্বপ্নপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কতু সহিব না’ এ শুধু রবীন্দ্রনাথের মুখেই ভালো মানায়। যিনি সীতরে নদী পার হয়েছেন, দিনের বেলায় ঘুমনি কোনদিন, ক্যান চালাননি গ্রীষ্মকালের ছপুয়ে।

পরনে গরুর ধুতি, গারে গরুর পাঁজিবি, কাঁধে গরুর চামর, শুভ্র বেশ আর খেতখন্দ—ব্যক্তমূর্তিতে ব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন, আজ চোখের সামনে

তাঁর বাস্তবমূর্তি অভিভোজিত হল। কথা আছে, যার লেখার তুমি ভক্ত কথাটাকে তুমি দেখতে চেও না। দেখেছ কি তোমার ভক্তি চটে গিয়েছে। দেখে যদি না চটো, চটেবে কথা শুনে। নির্জন ঘরে নিঃশব্দ মূর্তিতে আছেন, তাই থাকুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় উলটো। সংসারে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার বেলায় তোমার কল্পনাই পরাস্ত হবে, চূড়ান্ততম চূড়ায় উঠেও তাঁর নাগাল পাবে না। আর কথা—কণ্ঠধর ? এমন কণ্ঠধর আর কোথায় শুনবে ?

যত দূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—পর-পর তিন দিন ধরে। পরে সে বক্তৃতা-লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবছিলাম, যে ভালো লেখে সে ভালো বলতে পারে না—যেমন শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় কিছুই অনিয়ম নয়। আলোকসম্মত তাঁর সাধনা, অপারমিতা তাঁর প্রতিভা। প্রথম দিন তিনি কি বলেছিলেন তা আবছা-আবছা এখনো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন মানুষের তিনটি স্পৃহা আছে—এক, টিকে থাকা, I exist ; দুই, জানা, I know ; তিন, প্রকাশ করা, I express । অদম্য এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের। নিজের স্বার্থের জগে টিকে থেকেই তার শেষ নেই, তার মধ্যে আছে ভূমি, বহুলতা। যো বৈ ভূম্য তদমৃতং, অথ যদমৃতং তৎ মর্ত্যং। যেখানে অমৃত সেখানেই সৃষ্টি। ভগবান তো শক্তিতে এই ধরিত্রীকে চালনা করেছেন না, একে সৃষ্টি করেছেন আনন্দে। এই আনন্দ একটি অসীম আকৃতি হয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে। বলছে, আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে রূপ দাও। আকাশ ও পৃথিবীর আরো এক নাম “রোদনী”। তারাই কাঁদছে, প্রকাশের আকুলতার কাঁদছে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের বক্তৃতাও সারাংশ আমার ডায়রিতে লেখা আছে এমনি : “বিধাতা দূত পাঠালেন প্রভাতের স্বর্ধালোকে। বললে দূত, নিমন্ত্রণ আছে। দ্বিপ্রহরে দূত এসে বললে রক্ত তপস্বীর কণ্ঠে, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যায় স্বর্ধাস্তচ্ছটায় পেক্ষাদাস উদাস দূত বললে, তোমার যে নিমন্ত্রণ আছে। তারপর দেখি নীচব নিম্নীখিনীতে তারায়-তারায় সেই লিপির অক্ষর ফুটে উঠেছে। চিঠি তো পেলাম, কিন্তু সে-চিঠির জবাব দিতে হবে না ? কিন্তু কি দিয়ে দেব ? রস দিয়ে বেদনা দিয়ে—যা সব মিলে হল সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত। বলব, তোমার নিমন্ত্রণ তো নিলাম, এবার আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।”

নিজস্ব ঘরের জানলা থেকে দেখা অচেনা আকাশের নিঃসঙ্গ একটি তারার মতই মূর রবীন্দ্রনাথ। তখন ঐ মন্ডলের উপর বসে তাঁর বস্তুতা স্তন্য-স্তন্যে একবারও কি ঘূর্ণাকরে ভেবেছি, কোনোদিন কণকালের ক্ষণে হলেও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার যোগ্যতা হবে? আর, কে না জানে, তাঁর সঙ্গে কণকালের পরিচয়ই একটা অনন্তকালের ঘটনা।

ভাবছিলুম, কত বিচিত্রগুণাবৃত রবীন্দ্রনাথ। যেখানে হাত রেখেছেন সেইখানেই সোনা ফলিয়েছেন। সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিই, হেন দ্বিক নেই যেদিকে তিনি যাননি আর স্থাপন করেননি তাঁর প্রত্যক্ষ। যে কোনো একটা বিভাগে তাঁর সাফল্য তাঁকে অমরত্ব এনে দিতে পারত। পৃথিবীতে এমন কেউ লেখক জন্মায়নি যার প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মত সর্বদিকমুখী। তা ছাড়া, যেখানে মেঘলেশ নেই সেখানে বৃষ্টি এনেছেন তিনি, যেখানে কুসুমলেশ নেই সেখানে পর্বাগুফল। “অপমেঘোদয়ং বর্ষং, অদৃষ্টকুসুমং ফলং।” অচ্ছিন্নপ্রবাহা গঙ্গার মত তাঁর কবিতা—তার কথা ছেড়ে দিই, কেননা কবি হিসেবেই তো তিনি সর্বাগ্রগণ্য। ধ্বন, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন। ধ্বন, প্রবন্ধ। কত বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তার প্রসার—ব্যাকরণ থেকে রাজনীতি। অনেকে তো গল্প ভ্রমণকাহিনী লিখে নাম করেন। রবীন্দ্রনাথ এ অঞ্চলেও একচ্ছত্র। তারপর, চিঠি। পত্রসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরূপ। কত শত বিষয়ে কত সহস্র চিঠি, কিন্তু প্রত্যেকটি সম্ভ্রামনজন সাহিত্য। আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বসতে চান? তাতেও রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে নেই। তাঁর “জীবন স্মৃতি” আর “ছেলেবেলা” অতুলনীয় রচনা। কোথায় তিনি নেই? যেখানেই স্পন্দ করেছেন, পুষ্পপূর্ণ করেছেন। আলটপকা অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছেন ছোটকো-ছোটকা,—তাই চিরকালের কবিতা হয়ে রয়েছে। তবু তো এখনো গানের কথা বলিনি। প্রায় তিন হাজার গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, আ প্রত্যেক গানে নিজস্ব সুরসংযোগ করেছেন। এটা যে কত বড় ব্যাপার, স্বরূপ হয়ে উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের স্বর-দুঃস্বর এমন কোনো অমুভূতি নেই যা এই গানে সুর-স্বমধুর হয়নি। প্রকৃতির এমন কোনো হাবভাব নেই যা এই গানে সুর-স্বমধুর হয়নি। শুধু তাই? এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি ধরতে চেয়েছেন সেই অতীন্দ্রিয়কে, যে শ্রোতৃশ্র শ্রোতৃং, মনসো মনঃ, চক্ষুষ্য চক্ষুঃ। যে সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস অথচ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত। এই গানের মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটিত

করেছেন তারওবর্ষের ভগ্নোন্মতি। এই গানের মধ্য দিয়ে আগাতে চেয়েছেন পরণমনিত দেশকে।

চেউ গুনে-গুনে কি সমুদ্র পার হতে পারব ? শুধু চেউ গানো না হোক, সমুদ্রস্পর্শ তো হবে।

সাহিত্যে শিশুসাহিত্য বলে একটা শাখা আছে। লেখানেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বহিত। তারপর, ভাবুন, বিদেশীর পক্ষে ইংরেজের ইংরিজি লেখা সহজ-সাধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিমর্ত্য। ইংরিজিতে তিনি শুধু তাঁর বাংলা রচনাই অল্পবাদ করেননি, মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং দেশে-দেশে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন বহুবার। সে ইংরিজি একটা প্রদীপ্ত বিশ্বয়। তাঁর নিজের হাতে বাজানো বাজনার সুর।

যে লেখক, সে লেখার বাইরে শুধু বক্তৃতা দিচ্ছে না, গান গাইছে। আর তার সাহিত্য হল, সঙ্গীত হল, তার চিত্র হবে না ? রবীন্দ্রনাথ পট ও তুলি জুড়ে নিলেন। নতুন রূপে প্রকাশ করতে হবে সেই অব্যক্তরূপকে। সর্বাত্মসুন্দর রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাটিও সুন্দর। কবিতা লিখতে কাটাকুটি করেছেন, তার মধ্য থেকে ব্যঙ্গনাপূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে—তাঁর কাটাকুটিও সুন্দর। আর এমন কঠোর যিনি অধিকারী তিনি কি শুধু গানই করবেন, আবৃত্তি করবেন না, অভিনয় করবেন না ? অভিনয়ে-আবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য।

বক্তৃতা শুনতে-শুনতে এই সব ভাবতুম বসে বসে। ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সব-কিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু “কল্লোলে” এসে আন্তে আন্তে সে-ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। স্মৃতিতে মর্যাদার রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুত লেখনের হীন অল্পকৃতি হলে চলবে না। পস্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ। সেদিনকার “কল্লোলের” সেই বিদ্রোহ-বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায় :

এ মোর অত্যাধিকার, এ মোর বর্ধার অহংকার,
যদি পাই দীর্ঘ আশু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু ; স্বকণ্ঠের হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।

পশ্চাতে শত্রুরা শয়ন অগণন হাহুত ধারালো,
 সম্মুখে থাকুন বসে পব কথি রবীন্দ্রঠাকুর,
 আপন চক্রে থেকে জালিব যে ভীত ভীত আলো
 যুগ-সুধ রান তার কাছে । মোর পথ আরো দূর !
 গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
 উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নব-জয়-সত্যাবনা ;
 অক্ষয়তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
 ভবিষ্যৎ বৎসরের শব্দ আমি—নবীন প্রেরণা !
 শক্তির বিলাস নহে, তপশ্চায় শক্তি-আবিকার,
 তুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
 আপন বকের তলে ; আপনারে তাই নমস্কার !
 চক্রে থাক আয়ু-উষি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী ॥

সেই কমলা-লেকচার্সের সভায় আরেকজন বাড়ালি দেখেছিলেন । তিনি
 আন্তোভোব মুখোপাধ্যায় । চলাতে কথায়, বাংলার বাঘ, শূর-শাহুল । ধী, ধৃতি
 অ'র দাঁড়ের প্রতিমূর্তি । রবীন্দ্রনাথ যদি মৌনধ্ব, আন্তোভোব শক্তি । প্রতিভা
 আর প্রতিজ্ঞা । এই দুই প্রতিনিধি—অন্ততঃ চেহারার দিক থেকে—আর
 পাওয়া যাবে না ভবিষ্যতে । কাব্য ও কর্মের প্রকাশাত্মা ।

দাউধ স্ববার্নন ইস্কুলে যখন পড়ি, তখন সরস্বতী পূজার চাঁদার খাতা নিয়ে
 কয়েকজন ছাত্র মিলে একদিন গিয়েছিলেন আন্তোভোব বাড়ি । দোতলার
 উঠে দেখি সামনের ঘরেই আন্তোভোব জলচৌকির উপরে বসে আনের আগে গারে
 তেল মাখাচ্ছেন । ভয়ে-ভয়ে গুটি-গুটি এগিয়ে এসে চাঁদার খাতা তার সামনে
 বাড়িয়ে ধরলাম । আমাদের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি হংকার করে
 উল্লেন : ‘পেনাম করলিনে ?’ আমরা খাতা-টাতা কেলে খুণ-খুণ করে
 প্রণাম করতে লাগলাম তাঁকে ।

তেরোশ বজ্রিশ সাল—“কল্লোলের” তৃতীয় বছর—বাংলাদেশ আর “করোল”
 তরের পক্ষেই দুর্বৎসর । দোঙ্গরা আঘাত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মারা যান দার্জিলিঙে ।
 আর আটুই আশিন মারা যায় আমাদের গোকুল, সেই দার্জিলিঙেই । শুধু
 গোকুলই নয়, পর-পর মারা গেল বিজয় সেনগুপ্ত আর স্বকুমার তাহুড়ি ।

বঙ্গলবার বিকেল ছ’টার সময়, খবর আসে কলকাতায়—চিত্তরঞ্জন নেই ।

আমরা তখন কল্লোল-অফিসে তুমুল আড্ডা দিচ্ছি, খবর শুনে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। দেখি সমস্ত কলকাতা ঘন বেরিয়ে পড়েছে সর্বস্বহারার মত। কেউ কার দিকে তাকাচ্ছে না, কারো মুখে কোনো কথা নেই, লক্ষ্যহীন বেদনায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরদিন শোনা গেল বৃহস্পতিবার ভোরে স্পেশাল ট্রেনে চিত্তরঞ্জনর মৃতদেহ নিয়ে আসা হবে কলকাতায়। অত ভোয়ে ভবানী-পুর থেকে বাই কি করে ইন্টিশানে? ট্রাম-বাস তো সব বন্ধ থাকবে। সমবায় ম্যানসনের ইঞ্জিনিয়ার স্কুমার চক্রবর্তীর ঘরে রাত কাটলাম। আমি, স্কুমারবাবু আর দোনেশদা। স্কুমারবাবু দোনেশদার বন্ধু, অতএব “কল্লোলে”র বন্ধু, সেই স্বপ্নে আমাদের সকলের আশ্রয়। দরদী আর পরোপকারী। জীবনযুদ্ধে পর্যুত হচ্চেন পদে-পদে, অথচ মুখের নির্মল হাসিটি অস্ত যেতে দিচ্চেন না। বিদেশিনী মেয়ে ফ্রেডাকে বিয়ে করেন কিন্তু অকালেই সে-মিলনে ছেঁদ পড়ল। এসে পড়লেন একেবারে দৈন্ত ও শূন্যতার মুখোমুখি। ক্ষমাহীন সংগ্রামের মাক্ষাণে। তাই তো বোনামা বন্ধুরে, ভাঙা আহাজের ভাঙে, “কল্লোলে” তিনি বাসা নিলেন। এমনি অনেকে সাহিত্যাত্মক না হয়েও শুধু আদর্শবাদের খাতিরে এসেছে সেই যৌবনের মুক্ততীরে। সেই বাসা ভেঙে গিয়েছে, আর তিনিও বিদায় নিয়েছেন এক ঝাঁকে।

রাত থাকতেই উঠে পড়লাম তিনজনে। হাঁটা ধরলাম শেরালদার দিকে। সে কি বিশাল জনতা, কি বিরাট শোভাযাত্রা—তা বর্ণনা শুরু করলে শেষ করা বাবে না। “কৃষানের বেশে কে ও কৃশতলু কৃণাহু পুণ্যছবি”—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী একজন শববাহী। আট ঘণ্টার উপর সে-শোভাযাত্রার অঙ্গগমন করে—ছিলাম আমরা—নূপেন সহ আরো অনেক বন্ধু, নাম মনে পড়ছে না—দিনের ও শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কলকাতা শহরে আরো অনেক শোভাযাত্রা হয়েছে—কিন্তু এমন আর একটাও নয়। অস্তত আর কোনো শোভাযাত্রায় এত জল আর পাখা বৃষ্টি হয়নি!

শ্রাবণ সংখ্যায় “কল্লোলে” চিত্তরঞ্জনর উপর অনেক লেখা বেরোয়, তার মধ্যে অতুল গুপ্তের “দেশবন্ধু” প্রবন্ধটা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

“জুলাই মাসের মডারন রিভিউতে অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার মোট কথা এই যে, চিত্তরঞ্জনর প্রভাবের কারণ তাঁর দেশবাসীরা হচ্ছে কর্তৃত্বজ্ঞার জাত। তাদের গুরু একজন চাইই যার

হাতে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারে। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দেশের লোকের উপর চিত্তরঞ্জন দাসের প্রভাবের স্বরূপ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার প্রমাণ। কারণ সে প্রভাবের একমাত্র কারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ইউরোপের মত কাটা-ছাঁটা অপৌরুষেয় তত্ত্বপ্রচারের ফল নয়।...

লোকচিত্তের উপর চিত্তরঞ্জনের যে প্রভাব তা কোনও নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় নয়। তা স্বর্ধের মত স্বপ্রকাশ। চোখ না বুজে থাকলেই দেখা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগছে। আমাদের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্ত-রঞ্জে মূর্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই মুক্তির অগ্নে যে নির্ভীকতা, যে ত্যাগ, সে সর্বস্বপণ আমরা অন্তরে-অন্তরে প্রয়োজন বলে জানছি, কিন্তু ভয়ে ও স্বার্থে জীবনে প্রকাশ করতে পারছি না, সেই নির্ভীকতা, সেই ত্যাগ ও সেই পণ সমস্ত বাধামুক্ত হয়ে চিত্তরঞ্জে ফুটে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব দু-এরই এই মূল। আইন-সভায় যাত্রা চিত্তরঞ্জন উপস্থিত না থাকলে একরকম ভোট দিত, তাঁর উপস্থিতিতে অন্য রকম দিত, তারা দেশের মুক্তিকামী এই ত্যাগ ও নির্ভীকতার মূর্তির কাছেই মাথা নোয়াত। চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে দেড়শ বছরের ব্রিটিশ শাস্তির ফল প্রভু-ভয় ও স্বার্থভীতি ক্ষণেকের অগ্নি হলেও মাথা তুলতে পারত না। এই যদি কর্তৃত্বভাষ্য হয়, তবে ভগবান বেন এ দেশের সকলকেই কর্তৃত্বভাষ্য করেন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অপৌরুষেয় তত্ত্বের ভাবুক না করেন।...

ডেমোক্রেটিক শাসন অর্থাৎ ‘গুরু’দের শাসন। তার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে কোন ‘ডেমস’ কাকে গুরু মানে তার উপর। ভারত-বর্ষের ‘ডেমস’ যে গুরুর খোঁজে শবরমতীর আশ্রমে কি দেশবন্ধুর বিশ্রাম-আবাসেই যায়, দৈনিক কাগজের সম্পাদকের অফিসে নয়, এটা আশার কথা, মোটেই ভয়ের কথা নয়। অধ্যাপক সরকার যাকে ডেমোক্রেটিক বলে চালাতে চাচ্ছেন সে হচ্ছে সেই aristocratic শাসন, যা ইউরোপের শাসকসম্প্রদায় এককাল ডেমোক্রেটিক বলে চালিয়ে আসছে।

পণ্ডিতে না চিহ্নক দেশের জনসাধারণ চিত্তরঞ্জনকে যথার্থ চিনেছিল। তারা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল ‘দেশবন্ধু’। ঐ নাম দিয়ে তারা জানিয়েছে তাদের মনের উপরে চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের উৎস কোথায়। পণ্ডিতের চোখে এটা না পড়তে পারে, কারণ এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্য পৃথিবীর কোনও দেশেই সমসাময়িক কোনও মহত্বকে চিনতে পারে নাই, কেন না তার কথা পুঁথিতে লেখা থাকে না।*

তেরোশ একত্রিশ সালের শেষ দিকেই গোকুলের জর শুরু হয়। ছবি এঁকে আয়ের স্থবিধে বিশেষ করতে পারেনি—অথচ আয় না করলেও নয়। প্রভুত্বের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে চাকরি নিয়ে একবার পুনতে চলে যায়। বছরখানেক চাকরি করবার পর বসেতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে—দিন-রাত একটুকুও ঘুমতে পারত না। বসের সলিসিটর শুকথকর ও তাঁর স্ত্রী গোকুলকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলেন, কিন্তু চাকরি করার মত লক্ষ্য আর হল না। কলকাতায় ফিরে আসে গোকুল। শুকথকর ও তাঁর স্ত্রী মালিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার তার শেষ ছিল না। মালিনী গোকুলকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন ও গোকুলের জন্মদিনে বসে থেকে কোনো-না-কোনো উপহার পাঠাতেন। তাঁরই দেওয়া কালো ডায়ালের ওমেগা রিস্টওয়াচ গোকুলের হাতে শেষ পর্যন্ত বাঁধা ছিল।

গোকুল তার মামার বাড়িতে ছিল, অনেক বিধি বাধার মাঝখানে। শরীর মন দুর্বল, তার উপরে অথাগম নেই। না এঁকে না লিখে কিছুতেই স্বাধীনভাবে জীবিকাভন হবার নয়। এমন অবস্থায় গোকুলের দিদিমণি (বড় বোন) বিধবা হয়ে চারটি ছোট-ছোট নাবালক ছেলে নিয়ে গোকুলের আশ্রয়ে এসে পড়েন। কালিদাস নাগ, গোকুলের দাদা, তখন ইউরোপে। অনেক বাধা-বিপদ ঠেলে অনেক ঝড়-জল মাথায় করে বিদেশে গিয়েছেন উপযুক্ত হয়ে আসতে। কালিদাসবাবুর অসুস্থস্থিতিতে গোকুল বিষম বিব্রত হয়ে পড়ে, কিন্তু অভাবের বিরুদ্ধে লড়তে মোটেই তার অদক্ষতা নেই। ভবানীপুরে কুণ্ড রোডে ছোট একটি বাড়ি ভাড়া করে দিদি ও ভাগ্নেদের নিয়ে চলে আসে। এই ভাগ্নেদের মধ্যেই জগৎ মিত্র কথা-শিল্পীর ছাড়পত্র নিয়ে পরে এসে ভিডেছিল “কলোলে”। শিবপুরের একটা বাড়িতে দিদিমণির অংশ ছিল। দিদিমণির স্বামীর মৃত্যুর পর, যা সচরাচর হয়, দিদিমণির শারিকতা তা দখল কবে বসে। অনেক ঝগড়া-বিবাদে পর শারিকদের কবল থেকে দিদিমণির সে-অংশ উদ্ধার করে গোকুল। সে-বাড়িতে দখল নিতে গোকুলকে কত ভাবে যে অপমানিত হতে হয়েছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সেই অংশটা ভাড়া দিয়ে দিদিমণির কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু পুরোপুরি সংসার চলে না। মামার বাড়িতে থাকতে পাবলিক স্টেজ থিয়েটার দেখার সাহস করতে পারত না গোকুল। সেই গোকুল ভয়ে-ভয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীদের Photoplay Syndicateএ এসে যোগ দেয়। তখনকাল দিনে ফিল্মে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া। কিন্তু একেবারে না

খেতে পাওয়ার চেয়ে সেটা মন্দ কি। স্টুডিয়োতে আর্টিস্টের কাজ, মইয়ের উপরে উঠে সিন আঁকা, স্টেজ সাজানো—নানারকম শারীরিক ক্রেশের কাজ করতে হত তাকে। শরীর ভেঙে পড়ত, কিন্তু ঘুম হত রাত্রে। বলত, আর কিছু উপকার না হোক, ঘুমিয়ে বাঁচছি।

কালিদাসবাবু ডক্টরেট নিয়ে ফিরলেন বিদেশ থেকে। গোকুল যেন হাতে চাঁদ কপালে স্থিতি পেয়ে গেল। মা-বাপ-হারা ভাইয়ে-ভাইয়ে জীবনে নানা সুখ-দুঃখ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অপূর্ব বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিদেশে দাদার জন্তে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যেমন ভালবাসত দাদাকে তেমনি নীরবে পূজা করত। দাদা ফিরে এলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! দাদাকে কুণ্ডলেনের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে, দিদিমণি ও তাঁর ছেলেদের নিয়ে চলে এল তাঁদের শিবপুরের বাড়িতে। সেই শিবপুরের বাড়িতে এসেই সে অস্থির পড়ল।

জরের সঙ্গে পিঠে প্রবল ব্যথা। সেই জ্বর ও ব্যথা নিয়েই সে ‘পথিকের’ কিস্তি লিখেছে, করেছে ‘জ’। ক্রিস্তফের’ অনুবাদ। ক’দিন পরেই রক্তবমি করলে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দিলে, যক্ষ্মা।

শিবপুরের বাড়িতে আমরা, “কল্লোলের” বন্ধুরা, প্রায় রোজই যেতাম গোকুলকে দেখতে, তাকে সঙ্গ দিতে, সাধ্যমত পরিচর্যা করতে।

অনেক শোকশীতল বিষয় সন্ধ্যা আমরা কলহাস্তমুখর করে দিয়ে এসেছি। গোকুলকে এক মুহূর্তের জন্তেও আমরা বুঝতে দিই নি যে আমরা তাকে ছেড়ে দেব। কতদিন দিদিমণির হাতের ডাল-ভাত খেয়ে এসেছি তৃপ্তি করে। দিদিমণি বুঝতে পেরেছেন ঐ একজনই তাঁর ভাই নয়।

একদিন গোকুল আমাদের বললে, ‘আর সব যাক, আর কিছু হোক না হোক, স্বাস্থ্যটাকে ছেড়ে দিও না।’

তার স্নেহকরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

‘যার স্বাস্থ্য আছে তার আশা আছে।’ নিখাস ফেলল গোকুল : ‘আর যার আশা আছে তার সব আছে।’

ভেরো

ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলে দার্জিলিঙে নিয়ে যেতে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গোকুলকে বিদায় দেবার সেই মানগম্ভীর সন্ধ্যাট মনের

মধ্যে এখনো লেগে আছে। তার পুনরাগমনের দিকে আমরা ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকব এই প্রত্যাশাটি তাকে হাতে-হাতে পৌঁছে দেবার জন্তে অনেকেই সেদিন এসেছিলাম ইস্টিশানে। কাকনজজ্যার থেকে সে কাকনকান্তি নিয়ে ফিরে আসবে। বিশ্বভুবনের যিনি জমোহর তিনিই তার রোগগ্রহণ করবেন।

সঙ্গে গেলেন দাদা কালিদাস নাগ। কিন্তু তিনি তো বেশি দিন থাকতে পারবেন না একটানা। তবে কে গোকুলকে পরিচর্যা করবে? কে থাকবে তার রোগ-শয্যার পার্শ্চর্য হয়ে? কে এমন আছে আমাদের মধ্যে?

আর কে! আছে সে ঐ একজন অশরণের বন্ধু, অগতির গতি—পবিত্র গঙ্গোপাখ্যায়।

যখন ভাবি, তখন পবিত্রের প্রতি অন্ধার মন ভরে ওঠে। শিবপুরে থাকতে রোজ সে রুগীর কাছে ঠিক সময়ে হাজিরা দিত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত তার পাশটিতে, তাকে শান্ত রাখত, প্রফুল্ল রাখত, নৈরাস্ত্রের বিরুদ্ধে মনের দরজায় বসে কড়া পাহারা দিত একমনে। কলকাতা থেকে হাওড়ার পোল পেরিয়ে রোজ শিবপুরে আসা, আর দিনের পর দিন এই আত্মহীন কঠিন শুশ্রূষা—এর তুলনা কোথায়! তারপর এ নিঃসহায় রুগীকে নিয়ে দার্জিলিং যাওয়া—অন্তত তিন মাসের কড়ারে—নিজের বাড়ি-ঘর কাজকর্মের দিকে না তাকিয়ে, সুখসুবিধের কথা না ভেবে—ভাবতে বিশ্বয় লাগে! একটা প্রতিজ্ঞা যেন পেয়ে বসেছিল পবিত্রকে। অক্লান্ত সেবা দিয়ে গোকুলকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিজ্ঞা।

যে স্থানিটোরিয়ামে গোকুল ছিল তার টি-বি ওয়ার্ড প্রায় পাতালপ্রদেশে—নেমে চলেছে তো চলেইছে। নির্জন জঙ্গলে ঘেরা। চারদিকে শুষ্কগহন পরিবেশ। সব চেয়ে দুঃসহ, ওয়ার্ডে আর দ্বিতীয় রুগী নেই। সামান্য আলাপ করবার জন্তে সঙ্গী নেই জিসীমায়। এক ঘরে রুগী আরেক ঘরে পবিত্র। রুগীরও কথা কওয়ার বাবণ, অতএব পবিত্রও সে কি শব্দ-স্রুতিহীন কঠিন সহিষ্ণুতা। এক ঘরে আশা, অন্য ঘরে চেষ্টা—দু'জন দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখছে। উৎসাহ জোগাচ্ছে। আশা তবু কাঁপে, কিন্তু চেষ্টা টলে না।

এক-এক দিন বিকেলে গোকুল আর তাগিদ না দিয়ে পারত না: ‘কি আশ্চর্য, চব্বিশ ঘণ্টা রুগীর কাছে বসে থেকে তুইও শেষ পর্যন্ত রুগী ব’নে যাবি নাকি? যা না, ঘণ্টা-দুই বেড়িয়ে আয়।’

পবিত্র হাসত। হয়ত বা খইনি টিপত। কিন্তু বাইরে বেরুতে চাইত না।

‘দার্জিলিঙে এসে কেউ কি ঘরের মধ্যে বসে থাকে কখনো?’

‘একজন থাকে। একজনের জন্তে একজন থাকে!’ আবার হাসত পবিত্র,
‘সেই দুই একজন যখন দুইজন হবে তখন বেরুব একসঙ্গে।’

গোকুল যেখানে ছিল, তুনেছি, সেখানে নাকি সুস্থ মানুষেরই দেহ রাখতে
দেয় হয় না! সেইখানেও পবিত্রের আশ্রয় যোগসাধনা!

‘না, তুই যা! তুই ঘুরে এলে আমি ভাবব কিছুটা মুক্ত হাওয়া আর মুক্ত
মানুষের সঙ্গস্পর্শ নিয়ে এলি।’

পবিত্র তাই একটু বেরুত বিকেলের দিকে, শুধু গোকুলকে শান্তি দেবার
জন্তে। কিন্তু নিজের মনে শান্তি নেই।

গোকুলের চিঠি। তিরিশে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সালে লেখা। দার্জিলিঙের
জানিটোরিয়াম থেকে :

অচিন্ত্য, তোমার চিঠি (নন্দনকানন থেকে লেখা !) আমি পেয়েছি। উত্তর
দিতে পারিনি, তার কারণ নন্দনকাননের শোভায় তোমার কবিমন এমন মশগুল
হয়ে ছিল যে ঠিকানা দিয়েছিলে কলকাতার। কিন্তু কলকাতায় যে কবে
আসবে তা তোমার জানা ছিল না। যাই হোক, তুমি ফিরেছ জেনে সুখী
হলাম।

পৃথিবীতে অমন শত-সহস্র নন্দন-অমরাবতী-অলকা আছে, কিন্তু সেটা
তোমার আমার জন্তে নয়—এ কথা কি তোমার আগে মনে হয়নি? তোমার
কাজ আলাদা: তুমি কবি, তুমি শিল্পী। ঐ অমরাবতী অলকার
স্নিগ্ধমায়া তোমার প্রাণে দুর্জয় কামনার আগুন জ্বলে দেবে। কিন্তু তুমি দৃশ্য
নও লুট করে তা ভোগের পেয়ালাস ঢালবে না। কবি ভিখারী, কবি বিবাগী,
কবি বাউল—চোখের জলে বুকের রক্ত দিয়ে ঐ নন্দন-অলকার গান গাইবে,
ছবি আঁকবে। অলকার সৃষ্টি দেবতা যেদিন করেন সেদিন ঐ কবি-বিবাগীকেও
তার মনে পড়েছিল। ঐ অলকার মতই কবি বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। তার
তপ্তি কিছুতে নাই, তাই সে ছন্নছাড়া বিবাগী পথিক, তাই সে বাউল।

এ যদি না হত, অলকা-অমরাবতীকে মানুষ জানত না, বিধাতার অভিপ্রায়
বুঝা হত। তিনি স্বর্গের নৌদর্ঘ সুখশান্তি দিয়ে পূর্ণ করে কবির হাতে ছেড়ে
দিলেন। কবি সেখানে দুঃখের বীজ বুনল, বিরহের বেদনা দিল উজাড় করে
ঢেলে।

মাটির মানুষ ভুখা। তৃষ্ণায় তার বুক শুকিয়ে উঠেছে, ব্যর্থ-বেদনা সে আর

বুঝতে পারে না, চোখে তার জল আসে না, জালা করে, কাঁদবার শক্তি তার নেই, তাই সে মাঝে-মাঝে কবির সৃষ্টি ঐ নন্দন-অলকা-অমরাবতীর দিকে তাকিয়ে বুক হালকা করে নেয়। বিধাতা বিপুল আনন্দে বিভোর হয়ে কবিকে আশীর্বাদ করেন—হে কবি, তোমার শূণ্যতা তোমার ক্ষুধা মরুভূমির চেয়ে নিদারুণ হোক।

যাক, অনেক বাজে বকা গেল। তোমার শরীর আছে কেমন! পড়াশোনা ভালই চলছে আশা করি। নতুন আর কি লিখলে? ভালই আছি। আজ আমি।

ক’দিন পরেই চোঁঠা আবার সে আমাকে একটা চিঠি লেখে। এ চিঠিতে আমার একটা কবিতা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে, সেটা দ্রষ্টব্য নয়। দ্রষ্টব্য হচ্ছে তার নিজের কবিতা। তার রসবোধের প্রসন্নতা।

অচিন্ত্য, এ ভারি চমৎকার হল। সেদিন তোমাকে আমি যে চিঠি লিখেছি তার উত্তর পেলাম তোমার ‘বিরহ’ কবিতায়। অপূর্ব! বিশ্বাস, কামনা, বুভুক্ষা, অতৃপ্তি, প্রেম আর শ্রদ্ধা যেন ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

বিশ্বাস বলছে :

মরি মরি :

অপরূপ আকাশেরে কি বিশ্বাসে রাখিয়াছ ধরি
নয়নের অন্তরমণিতে। নীলের নিভল পারাবার !
বাঁধিয়াছ কি অপূর্ব লীলাছন্দ জ্যোতি মূর্ছনার
স্বকোমল স্নেহে !

কামনা বলছে :

যৌবনের প্রচণ্ড শিখায়
দেহের প্রদীপখানি আনন্দেতে প্রজ্বালিয়া
সৌরভে সৌরভে,
এলে প্রিয়া
লীলামন্ত নিকরের ভঙ্গিমাগৌরবে—

বুভুক্ষা বলছে :

আজ যদি প্রচণ্ড উৎস্রকে
সৃষ্টির উন্নত মুখে
তোমার ঐ বন্ধখানি প্রাকাসম নিষ্পেষিয়া লই মম বুক
কানে কানে মিলনের কথা কই—

অতৃপ্তি বলছে :

এই মোর জীবনের সর্বোত্তম সর্বনাশী স্খা
মিটাইতে পারে হেন নাহি কোনো স্খা
দেহে প্রাণে ওঠে প্রিয়া তব—

প্রেম বলছে :

জ্যোৎস্নার চন্দনে স্নিগ্ধ যে আঁকিল টিকা
আকাশের ভালে,
ফাল্গুনের স্পর্শ-লাগা মুগ্ধরিত নব ডালে-ডালে
লগ্নফুল কিশলয় হয়ে
যে হাসে শিঙুর হাসি—
যে তটিনী কলকণ্ঠে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
বক্ষে নিয়া দুঃস্বস্ত-পিপাসা
সে আজি বেঁধেছে বাসা
হে প্রিয়া তোমার মাঝে !...
মরি মরি
তোমারে হয় না পাওয়া। তাই শেষ করি ।
চেয়ে দেখি অনিমিখ
তুমি মোর অসীমের সসীম প্রতীক ।

শ্রদ্ধা বলছে :

হে প্রিয়া তোমারে তাই
বারে বারে চাই
খুঁজিতে সে ভগবানে,
তাই প্রাণে-প্রাণে
বিরহের দগ্ধ কান্না ফুকরিয়া ওঠে অবিরাম
তাই মোর সব প্রেম হইল প্রণাম ।

তোমার কথা তোমায় শোনালাম । এ সমালোচনা নয় । আমি দু-এক-
জনের কবিতা ছাড়া বাংলার প্রায় সব লেখাই বুঝতে পারি না । যাদের লেখা
আমি বুঝতে পারি, পড়ে মনে আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই, উপভোগ করি, তোমাকে
আজ তাদের পাশে এনে বসালাম । আমার মনে যাদের আসন পাতা হয়েছে
তার কেউ আমার নিরাশ করেনি । তোমাকে এই কঠিন জগৎগায় এনে ভয়

আর আনন্দ সমান ভাবে আমার উতলা করে তুলেছে। কিন্তু খুব আশা হচ্ছে কবিতা লেখা তোমার সার্থক হবে। তোমার আগেকার লেখার তিত্তর এমন সহজ ভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতাকে দেখতে পাই নি। ‘সূর্য’ কবিতায় কতকটা সফল হয়েছিলে কিন্তু ‘বিরহে’ তুমি পূর্ণতা লাভ করেছ।

গতবারের চিঠিতে যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলাম সেটাই তোমায় বলছি। তোমার শ্রুততা তোমার অন্তরের ক্ষুধা মরুভূমির চেয়ে নিদারুণ হোক। শরীরের যত্ন নিও। কাজটা খুব শক্ত নয়। ইতি—

আমাকে লেখা গোকুলের শেষ চিঠি। এগারই আবার, ১৩৩২ সাল।

অচিন্ত্য, তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু আমার ছোটো চিঠির উত্তর একটাতে সারলে কল বিশেষ ভালো হবে না। আর একটা বিষয়ে একটু তোমাদের সাবধান করে দিই—আমাকে magnifying glass চোখে দিয়ে দেখো না কোন দিন। এটা আমার ভাল লাগে না। আমি কোন বিষয়েই তোমাদের বড় নই। আমি তোমাদেই বন্ধুভাবে নিয়েছি বলে তোমরা সকলে ‘হাতে চাঁদ আর কপালে সূর্য’ পেয়েছ এ কথা কেন মনে আসে? এতে তোমরা নিজের শক্তিকে পঙ্ক করে কেলবে। আমাকে ভালবাস শ্রদ্ধা কর সে আলাদা কথা, কিন্তু একটা ‘হু গু’ কিছু প্রমাণ কোরো না।

আমি আজও পথিকের চেহারা দেখতে পেলাম না। জন্মদাতার chance কি সবার শেষে? মনটা একটু অস্থির আছে। আসি।

গোকুলের ‘পথিক’ ছাপা হচ্ছিল কাশীতে, ইণ্ডিয়ান প্রেসে। ডাকে প্রফ আসত, আর সে-প্রফ আগাগোড়া দেখে দিত পবিত্র। পড়ে যেত গোকুলের সামনে. আর অদল-বদল যদি দরকার হত, গোকুল বলে দিত মুখে-মুখে। গোকুলের ইচ্ছে ছিল ‘পথিকের’ মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ‘পথিক’ কথিকাটি কবির হাতের লেখায় ব্লক করে ছাপবে, কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি।

তেরোশ বজ্রিশের বৈশাখে “কল্লোলে” রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তি’ কবিতাটি ছাপা হয়। “কল্লোলের” সামান্য পুঁজি থেকে তার জন্তে দক্ষিণা দেওয়া হয় বিশ্বভারতীকে।

“যেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত

আমার পরান হবে কিংবাকের রক্তমা-লাঙ্কিত

সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির-বাহিত্ত

তোমার লীলায় মোর লীলা

যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে-তালে মিলা।”

দার্জিলিং থেকে দু'জন নতুন বন্ধু সংগ্রহ হল “কল্লোলের”—এক অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, আর স্বরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এক কথায় আমাদের দা-গৌসাই। প্রথমোক্তর সম্পর্কটা কিছুটা ভাসা-ভাসা ছিল, কিন্তু দা-গৌসাই “কল্লোলের” একটা কায়েমী ও দৃঢ়কার খুঁটি হয়ে দাঁড়াল। পলিমাটির পাশে সে যেন পাথুরে মাটি। সেই শক্তি আর দৃঢ়তা শুধু তার ব্যায়ামবলিষ্ঠ শরীরে নয়, তার কলমে, মোহলেশহীন নির্মম কলমে উপচে পড়ত। বক্তৃতির প্রাবণে ‘দা-গৌসাই’ নামে সে একটা আশ্চর্যকর ভাল গল্প লেখে, আর সেই থেকে তারও নাম হয়ে যায় দা-গৌসাই। গল্পটার সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল যে সেটা প্রেম নিয়ে লেখা নয়, আর লেখার মধ্যে কোথাও এতটুকু সজলকোমল মেঘোদয় নেই, সর্বত্রই একটা খটখটে বোদ্ধবের কঠিন পরিচ্ছন্নতা। অথচ যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিকুর জন্তে সমস্ত সৃষ্টি অর্থায়িত, সেই মধুর ব্যক্তিকু অপরিহার্যরূপে উপস্থিত। লোকটিও তেমনি। একেবারে সাদাসিধে, কাঠখোটা, স্পষ্টবক্তা। কথাবার্তাও কাট-কাট, হাড়-কাঁপানো। ঠাট্টাগুলোও গাট্টা-মার। ভিজে হাওয়ায় দেশে এক ঝাপট। তপ্ত ‘লু’। তপ্ত, কিন্তু চারদিকে স্বাস্থ্য আর শক্তির আবেগ নিয়ে আসত। ঢাকে: যেমন কাঠি, তেমনি তার সঙ্গে সাইকেল। পো ছাড়া যেমন সানাই নেই, তেমনি সাইকেল ছাড়া দা-গৌসাই নেই। এই দোচাকা চড়ে সে অষ্টদিক (উর্ধ্ব অধ: ছাড়া) প্রদক্ষিণ করছে অষ্টপ্রহর। সন্দেহ হয়েছে সে সাইকেলই বোধহয় ঘুমোয়, সাইকেলেই খায় দায়। বেমাইকেল মধুসূদন দেখেছি কিন্তু বেসাইকেল স্বরেশ মুখুজে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

পবিত্রর চেটা ফলবতী না হলেও ফুল ধরল। গোকুল উঠে বসল বিছানায়। একটু একটু করে ছাড়। পেল ঘরের মধ্যে। ক্রমশ ঘর থেকে বাইরের বারান্দায়। আর এই বারান্দায় এসে একদিন সে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলে। মুখে-চোখে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দেহ-মন থেকে সরে গেল রোগছায়া। পবিত্রকে বললে, ‘জানিস, কান্নার মরতে চাওয়া উচিত নয় পৃথিবীতে, তবু আজ যদি আমি মরি আমার কোন ক্ষোভ থাকবে না।’

সংসারের আনন্দ সব ক্ষীণশাস, অল্পজীবী। কিন্তু এমন কতগুলি হয়তো আনন্দ আছে যা পরিণতি খুঁজতে চায় মৃত্যুতে, যাতে করে সেই আনন্দকে নির-বচ্ছিন্ন করে রাখা হবে, নিয়ে যাওয়া হবে কালাতীত নিত্যতায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপারে গোকুল দেখতে পেল ক্রব আর দৃঢ়, স্থির আর স্থায়ী কোন এক আনন্দ-তীর্থের মুক্তদ্বার। পথিকের মন উন্মুখ হয়ে উঠল।

ভাদ্রের শেষের দিকে ডাক্তার কালিদাসবাবুকে লিখলেন, গোকুলের অস্থখ বেড়েছে। চিঠি পেয়েই দীনেশদা দার্জিলিঙে ছুটলেন। তখন ঘোর দুঃস্বপ্ন বর্ষা, রেলপথ বন্ধ, পাহাড় ভেঙে ধ্বংস পড়েছে। কার্শিয়াং পর্যন্ত এসে বসে থাকতে হল দু'দিন। ক'দিনে রাস্তা খোলে তার ঠিক কি, অথচ যার ডাকে এল তার কাছে যাবার উপায় নেই। সে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে অথচ দীনেশদা গতিশূন্য। এই বাধা কে আনে, কেন আনে, কিসের পরীক্ষায়? দীনেশদা কোমর বাঁধলেন। ঠিক করলেন পায়ে হেঁটেই চলে যাবেন দার্জিলিং। সেই বড়-জলের মধ্যে গহন-দুর্গম পথে রওনা হলেন দীনেশদা। সেটাই “কল্লোলের” পথ, সেটাই “কল্লোলের” ডাক। বায়ে ঘণ্টা একটানা পায়ে হেঁটে দীনেশদা দার্জিলিং পৌঁছলেন—জলবান্দারক মাথা সে এক দুর্দম যোদ্ধার মূর্তিতে। চলতে-চলতে পড়ে গিয়েছেন কোথাও, তারই ক্ষতচিহ্ন সর্বদেহে ধারণ করে চলেছেন। আঘাতকে অস্বীকার করতে হবে, লজ্জন করতে হবে বিপত্তি-বিপর্যয়।

গোকুলের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হতেই দীনেশদার হাত ধরল গোকুল। বললে, ‘জীবনের এক দুর্দিনে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভাবছিলাম, আজ আবার এই দুদিনে যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয়।’

বন্ধুকে পেয়ে কথায় পেয়ে বসল গোকুলকে। দীনেশদা বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু গোকুল শোনে না। বলে, ‘বলতে দাও, আর যদি বলতে না পারি।’

কথা শেষ করে দীনেশদার হাত তার কপালের উপর এনে রাখল; বললে, ‘Peace, Peace! আমার এখন খুব শান্তি। বড় চাইছিলাম তুমি আস, বেশি করে লিখতে পারিনি, কিন্তু বড় ইচ্ছে করছিল তুমি আস।’ সব বন্ধু-বান্ধবের কথা খুঁটিনাটি করে জেনে নিলে। বললে ‘আমাকে রাখতে পারবে না, কিন্তু কল্লোলকে রেখে।’

সে রাতে খুব ভালো ঘুমোল গোকুল। সকালে ঘুম ভাঙলে বললে, ‘বড় তৃপ্তি হল ঘুমিয়ে।’

কিন্তু দুপুর থেকেই ছটকট করতে শুরু করলে। ‘দাদা এখনো এলেন না?’ ‘আজ সন্ধ্যাবেলা পৌঁছবেন।’

গভীর সমর্পণে চোখ বুজল গোকুল।

সন্ধ্যাবেলা কালিদাসবাবু পৌঁছলেন। দুই ভাইয়ে, স্ত্র-দুঃখের দুই সঙ্গীতে, শেষ দৃষ্টিবিনিময় হল। আবেগরুদ্ধকণ্ঠে গোকুল একবার ডাকলে, ‘দাদা!’

সব শেষ হয়ে গেল আন্তে আন্তে । কিন্তু কিছুই কি শেষ আছে ?

গোকুলের তিরোধানে নজরুলের কবিতা “গোকুল নাগ” প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণের “কল্লোলে”, সেই বছরেই । এই কটা লাইনে “কল্লোল” সম্বন্ধে তার ইঙ্গিত উজ্জ্বল-স্পষ্ট হয়ে আছে :

সেই পথ, সেই পথ-চল, গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে—নাই শুধু নিতি-নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে
আদি নাই অন্ত নাই ক্রান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—
সেই নেশা সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান
সেই কল্ললোকে নব-নব অভিযান—
সব নিয়ে গেছ বন্ধু ! সে কল-কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত্ত উত্তোল !

* আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে

* শূন্যের শূন্যতা বাজে, বুক নাহি ভরে ।...

স্বন্দরের তপস্রায় ধ্যানে আত্মহার্য
দারিদ্র্যের দর্পতেজ নিয়ে এল যারা,
যারা চির-সর্বহার্য করি আত্মদান
যাহারা স্বপ্নন করে করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ সহজ আয়োজন এ স্মরণ দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদেয়ে জীবনে তোমার ।
নহে এরা অভিনেতা দেশনেতা নহে
এদের স্বপ্ননকুঞ্জ অভাবে বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন নাই কোলাহল ;
আছে অশ্রু আছে প্রীতি, আছে বক্ষকত,
তাই নিয়ে স্মৃতি হও, বন্ধু স্বর্গগত !

* এ দুটো লাইন নজরুলের কাব্যগ্রন্থে নেই ।

গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদনিৰ্মাণ
 শিরোণা তাদের তরে তাদের সম্মান ।
 দুদিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়,
 কিন্তু শ্রষ্টাসম যারা গোপনে কোথায়
 সৃজন করিছে জাতি সৃষ্টিছে মানুষ
 রহিল অচেনা তারা ।

অপ্রত্যাশিতভাবে আরেক জায়গা থেকে তপ্ত অভিনন্দন এল । অভিনন্দন পাঠালেন দীনেশচন্দ্র সেন, বাগবাজার বিশ্বকোষ লেন থেকে ।

“...গোকুলের পথিক পড়া শেষ করেছি । বইখানিতে সব চাইতে আমার দৃষ্টি পড়েছে একটা কথার উপর । লেখক বাঙ্গালার ভাবী সমাজটার যে পৰিকল্পনা করেছেন তা দেখে বুড়োদের চোখের তারা হয়ত কপালে উঠতে পারে, হয়ত অনেকে সামাজিক শুভচিন্তাটাকে বড় করে দেখে মনে করতে পারেন, এরূপ লেখায় প্রাচীন সমাজের ভিত্তি ধ্বসে পড়বে । আট বছরের গৌরীর দল এ সকল পুস্তক না পড়ে তজ্জগৎ অভিভাবকেরা হয়ত খাড়া পাহারার ব্যবস্থা করবেন । কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যে দরজা শাশি ও জানালা একেবারে বন্ধ করে রেখেছি এ ত আর বেশি দিন পারব না—এতে করে যে কতকগুলি রোগা ছেলে নিয়ে আমরা শুধু প্রাচীন শ্লোক আওড়ে তাদের আধমরা করে রেখে দিয়েছি । বাঙালী জাতি একেবারে জগৎ থেকে চলে যাওয়া বরং ভাল কিন্তু সংস্কারের ষাঁতায় ফেলে তাদের অসার করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন কি ?

“এবার সবদিককার দরজা জানালা খুলে দিতে হবে আলো ও হাওয়া আসুক । হয়ত চিরনিরুদ্ধ গৃহে বাস করায় অভ্যস্ত দুই একটা রোগা ছেলে এই আলো ও হাওয়া বরদাস্ত করতে পারবে না । কিন্তু স্বভাবটাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টায় নিজেরা যে মরে যাব । না হয় মড়ার মতন হয়ে কয়েকটা দিন বেঁচে থাকব । এরূপ বাঁচার চেয়ে মরা ভাল ।

“যে সকল বীর আমাদের ঘর-দোর জোর করে খুলে দেওয়ার জন্তে লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তন্মধ্যে “কল্লোলের” লেখকেরা সর্বাপেক্ষা তরুণ ও শক্তিশালী । প্রাচীন সমাজের সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করবার দৈন্ত ইহাদের নাই । নিজেদের প্রগাঢ় অসুভূতি সত্যের প্রতি অসুযোগ প্রভৃতি গুণে একান্ত নির্ভীক, ইহারামূলী পথটাকে একেবারে পথ বলে স্বীকার করেন না, ইহার

যাহা স্বাভাবিক, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই আত্মার স্বপ্রকাশিত সত্যটাকে ইহারা বেদ কোরাণের চাইতে বড় মনে করেছেন। এই সকল বলদর্শিত মর্মবান লেখকদের পদভরে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঙ্কর কেঁপে উঠবে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে যে কত সুখী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় ভোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি—যেন কাগজ ও সোনার ফুল-লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দনকাননে এসেছি...”

গোকুল সম্বন্ধে আরো একটি কবিতা আসে। নাম ‘বৌবন-পথিক’ :

ভূমি নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস

ক্ষণতরে বিকম্পিত করি গেলে বাণীর কানন—

লেখাটা মফঃস্বল থেকে, ঢাকা থেকে। লেখক অপরিচিত, কে-এক শ্রীবুদ্ধদেব বসু। তখন কে জানত এই লেখকই একদিন “কল্লোলে”—তথা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় নতুন অধ্যায় বোজনা করবে!

চৌদ্দ

ভবানীপুর মোহিনী মুখুন্ডে বোড়ে কে-একটি যুবক গল্প বলছে।

পৌষের সন্ধ্যা। কথককে ঘিরে শ্রোতা-শ্রোত্রীর ভিড়। শীতের সঙ্গে-সঙ্গে গল্পও জমে উঠেছে নিটোল হয়ে।

ভীষ্ম একটি মুহূর্তের চুড়ায় গল্প কখন উঠে এসেছে অজান্তে। দোহুলায়মান মুহূর্ত। ঘরের বাতাস স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ বন্ধ হল গল্প বলা।

‘তারপর? তারপর কি হল?’ অস্থির আগ্রহে সবাই হেঁকে ধরল কথককে।

‘তারপর?’ একটু হাসল নাকি যুবক? বললে, ‘বাকিটা কাল শুনতে পাবে। সময় নেই, লাস্ট ড্রাম চলে গেল বোধ হয়।’

পরদিন গল্পের বাকিটা আমরাও শুনতে পেলাম। ইডেন হিন্দু হস্টেলের বাধকমে দরজা বন্ধ করে কার্বলিক এসিড খেয়ে কথক বিজয় সেনগুপ্ত আত্মহত্যা করেছে।

দেখতে গিয়েছিলাম তাকে। দীর্ঘ দেহ সংকুচিত করে মেঝের উপর শুয়ে আছে বিজয়। ঠোট দুটি নীল।

চারদিকে গুজন উঠল ঘুমসমাজে, সাহিত্যিক সমাজে। কেউ সহানুভূতি দেখাল, কেউ করলে তিরস্কার। কেউ বললে, এম.-এ.র পড়া-খরচ চলছিল না; কেউ টিগুনী কেটে বললে, এম.-এ.র নয় হে, প্রেমের। কেউ বললে, বিকৃতমস্তিষ্ক; কেউ বললে, কাপুরুষ।

যে যাই বলুক, তার মৃত হৃদয় মুখে শুধু একটি গল্প-শেষ করার শাস্তি। আবার কোথায় আরেকটি গল্প আরম্ভ করার আয়োজন।

তারপর? এই মহাজিজ্ঞাসার কে উত্তর দেবে? শুধু প্রাণ থেকে প্রাণে, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে, এই তারপরের ইশারা। শুধু একটি ক্রমাগত উপন্যাস।

বিজয়ের বেলায় অনেকেই তো অনেক মন্তব্য করেছিল, কিন্তু সুকুমারের বেলায় কি বলবে? তাকে কে হত্যা করল? অকালে কে তাকে তাড়িয়ে দিলে সংসার থেকে?

এম.-এস-সি. আর ল পড়ত সুকুমার। খরচের দায়ে এম.-এস-সি. চালাতে পারল না, শুধু আইন নিয়ে থাকল। কিন্তু শুধু নিজের পড়া-খরচ চালালেই তো চলবে না—সংসার চালাতে হবে। দেশের বাড়িতে বিধবা মা আর ছুটি বোন তার মুখের দিকে চেয়ে। বড় বোনটিকে পাতাই করা দরকার। কিন্তু ঘুরে ঘুরে সে হা-ক্লান্ত, বিনাপণে বর নেই বাংলাদেশে।

একমাত্র রোজগার ছাত্র-পড়ানো—আর কালে-ভদ্রে পূজার কাগজে গল্প লিখে দু-পাঁচ টাকা দর্শনী। আর সে দু-পাঁচ টাকা আদায় করতে আড়াই মাস ধরা দেওয়া। সকালে যাও, সুনবে, কৈলাসবাবু তো তিনটের সময় আসেন; আর যদি তিনটের সময় যাও, সুনবে, কৈলাসবাবু তো ঘুরে গিয়েছেন সকাল-বেলা। সুতরাং যদি লিখে রোজগার করতে চাও তো সাহিত্যে নয়, মুহুরি-হুয়ে কোটের বারান্দায় বসে দরখাস্তের মুসাবিদা করো।

তাই একমাত্র উপায় টিউশানি। সকালে সন্ধ্যায় অলিতে গলিতে শুধু ছাত্রের অগ্নিছত্র। পাঁচ থেকে পনেরো—যেখানে বা পাওয়া যায়। তুচ্ছ উল্লেখ্য। সে ক্লেশ কহতব্য নয়, মৃত্যুর মানদণ্ডে মান নেই, শুধু দু-গুটাই অখণ্ড। স্বাস্থ্য পড়ল ভেঙে, দিব্যবর্ণ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। সুকুমার অসুখে পড়ল।

শেষ দিকে প্রথম চৌধুরীর বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ করত। নামে চাকরি, থাকত একেবারে ঘরের ছেলের মত। কিন্তু শুধু নিজে আরামে থেকে তার স্বথ কই? স্নেহ-সেবার বিছানায় পড়ে থাকলে তার চলবে কেন? তার মা-বোনরা কি ভাববে?

টাকার ধান্দায় ঘোরে সামর্থ্য কই শরীরে? ডাক্তার যা বললেন, রোগও রাজকীয়—সাধ্য হলে চেঞ্জে যাওয়া দরকার এখনি। কিন্তু সুকুমারের মত ছেলের পক্ষে দেশের বাড়িতে যাওয়া ছাড়া আর চেঞ্জ কোথায়? সেখানে যায়ের বুক ভরবে সত্যি, কিন্তু পেট ভরবে কি দিয়ে?

মাসখানেক কোনো খবর নেই। বোধহয় মঙ্গলময়ী মায়ের স্পর্শে নিরাময় হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন চিঠি এল কল্লোল-আপিসে, সে দুমকায় যাচ্ছে তার এক কাকার গুথানে। দেশেবু মাটিতে তার অস্থির কোনো সুরাহা হয়নি।

হু'খান' কাঠির ওপর নড়বড়ে একটি মাথা আর তার গভীর দুই কোটরে জলন্ত দুটা চক্ষু। এই তখন সুকুমার। কবিতাকাঞ্চ দেহ তক্তসার হয়ে গেছে। কাঁপছে হাওয়া লাগা প্রদীপের শিখের মত। আড়াল করে না দাঁড়ালে এখনি হয়ত নিবে যাবে।

কিন্তু এই শরীরে দুমকায় যাবে কি করে? ই্যা, যাব, মা বোনের চোখের সামনে নির্জয়ের মত তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যেতে পারব না। তাঁদের চোখের আড়ালে যেতে পারলে তাঁরা ভাবতে পারবেন দিনে দিনে আমি ভালো হয়ে উঠছি। আর ভালো হয়ে উঠেই আবার লেগেছি জীবিকার্জনের সংগ্রামে।

এ রুগীর পক্ষে দুমকার পথ তো সাধ্যাতীত। কাকুর নিশ্চয় যেতে হয় সঙ্গে, অন্তত পৌছে দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু যাবে কে?

গোকুলের বেলায় পবিত্র, সুকুমারের বেলায় নূপেন। আরেকজন আদর্শ-প্রেরিত বন্ধু। ওটা তখনো সেই যুগ যে-যুগে প্রায় প্রেমেরই সমান-সমান বন্ধুতার দাম ছিল—মেই একই বিরহোৎকর্ষ বন্ধুতা। যে একত্রিয় সে তো শুধু মিত্র, যে সমপ্রাণ সে সখা, যে সন্নিবাহমত সে সহৃৎ—কিন্তু যে অত্যাগসহন, অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে অস্ত্রের ত্যাগ ব্যর্থ অসহনীয়, সেই বন্ধু। ছিল সেই অধীর অকপট আসক্তি। এমন টান যার জন্তে প্রাণ পর্যন্ত দেওয়া যায়।

আর এ তো শুধু বন্ধু নয়, মরণের পথে একলা এক পর্যটক।

দেওঘর পর্যন্ত কোনো বকমে আসা গেল। সুকুমারের প্রাণটুকু গলার কাছ ধুকধুক করছে—সাধ্য নেই দুমকার বাস নেয়। নূপেন বললে, 'ভয় নেই, আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাব।'

কিন্তু বাস-এ তো উঠতে হবে। এত প্রচণ্ড ভিড়, পিন ফোটারায় জায়গা নেই। আর এমন অবস্থাও নেই যে ফাঁকা বাস-এর জন্তে বসে থাকি চলে।

প্রায় জোরজোর করেই উঠে পড়ল নূপেন। বসবেন কোথায় মশাই? জায়গা কই? মাঝখানে মেঝের উপর একটা বস্তু ছিল। নূপেন বললে, কেন, এই বস্তুর উপর বসব। আপনারা তো ছ'জন দেখছি, উনি তবে বসবেন কোথায়? ভয় নেই, বেশি জায়গা নেব না, উনি আমার কোলের উপর বসবেন।

অনেক হালকা আর ছোট হয়ে গিয়েছিল স্কুমার। আর নূপেন তাকে সত্যিসত্যি কোলে নিয়ে বসল, বুকের উপর মাথাটা শুইয়ে দিলে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সারা গা। তুই বোজা চোখে কোন হারানো পথের স্বপ্ন। আর মন? মন চলেছে নিজ নিকেতনে।

দুমকায় এসে ঢালা বিছানা নিলে স্কুমার। সেই তার শেষশয্যা।

একদিন নূপেনকে বললে, 'সত্যি করে বল তো, কোনো দিন কাউকে ভালোবেসেছিস?'

নূপেন কথাটার পাশ কাটিয়ে গেল: 'কে জানে।'

'কে জানে নয়! সত্যি করে বল, কোনোদিন কাউকে অন্তরের সঙ্গে একান্ত করে ভালোবেসেছিস পাগলের মত? জীবন কথা ভাবিসনে! কোনো মেয়ের কথা বলছি না!'

তবে কি সেই অব্যক্তমূর্তির কথা? নূপেন স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আচ্ছা, বল, অন্নজলের জন্তে যে প্রেম, তার চেয়ে বেশি প্রবল বেশি বিত্তক প্রেম কি কিছু আছে আর পৃথিবীতে? সেই অন্নজলের প্রেমে সর্বস্বান্ত হয়েছিস কখনো? শরীরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাস্থ্য-আয়ু সব বিলিয়ে দিয়েছিস তার জন্তে?'

নূপেনের মুখে কথা নেই। স্কুমারের ইশারায় মুখের কাছে বাটি এনে ধরল। রক্তে ভরে গেল বাটিটা।

ক্লান্তির ভাব কাটিয়ে উঠে স্কুমার বললে, 'জানলার পর্দাটা সরিয়ে দে। এখনো অন্ধকার হয়নি। আকাশটা একটু দেখি।'

নূপেনের মুখের স্নান ভাব বুঝি চোখে পড়ল স্কুমারের। বেন সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনি স্বরে বললে, 'কোনো দুঃখ করিস না। অন্ধকার কেটে যাবে। আলোয় ঝলমল করে উঠবে আকাশ। আবার আলো ঝলমল নীল আকাশের তলে আমি বেড়াব তোর সঙ্গে। তুই এখানে—আর আমি কোথায়! তবু আমরা এক আকাশের নিচে। এই আকাশের শেষ কই—'

সবই কি শূন্য? কোথাও কি কিছু ধরবার নেই, দাঁড়াবার নেই? আকাশের অভিমুখে উথিত হল সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

কিম আকাশঃ অনাকাশঃ ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং । এমন কি কিছুই নেই
যা আকাশ হয়েও আকাশ নয়, যা কিছু না হয়েও কিছু ?

স্বকুমারের মৃত্যুতে প্রথম চৌধুরী একটি চিঠি লিখেছিলেন দীনেশদাকে ।
সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

কল্যাণীয়েষু

আজ ঘুম থেকে উঠে তোমার পোস্টকার্ডে স্বকুমারের অকালমৃত্যুর খবর
শেয়ে মন বড় খারাপ হয়ে গেল । কিছুদিন থেকে তার শরীরের অবস্থা যে রকম
দেখছিলুম তাতেই তার জীবনের বিষয়ে হতাশ হয়েছিলুম ।

আমার সাধ্যমত তার রোগের প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছি । কিন্তু
তার ফল কিছু হল না । নূপেন যে তার সঙ্গে দুমকা গিয়েছিল তাতে সে প্রকৃত
বন্ধুর মত কাজ করেছে । নূপেনের এই ব্যবহারে আমি তার উপরে যতপরনাই
সম্মত হয়েছি ।

এই সংবাদ পেয়ে একটি কথা আমার ভিতর বড় বেশি করে জাগছে ।

স্বকুমারের এ বয়সে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হল শুধু তার অবস্থার দোষে ।
এ দেশে কত ভদ্রসন্তান যে এরকম অবস্থায় কায়ঃক্লেশে বেঁচে আছে মনে করলে
ভয় হয় ।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

একজন যায়, আরেকজন আসে । সে যায় সেও নিশ্চয় কোথাও গিয়ে
উপস্থিত হয় । আর যে আসে, সেও হয়তো কত অজানিত দেশ ঘুরে কত
অপরিচয়ের আকাশ অতিক্রম করে একেবারে হৃদয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় :

“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে

অনেক ঘুরেছি আমি ; বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সন্দেশ—”

হঠাৎ “কল্লোল”ে একটা কবিতা এসে পড়ল—‘নীলিমা’ । ঠিক এক টুকরো
নীল আকাশের সারল্যের মত । মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠল । লেখক
অচেনা, কিন্তু ঠিকানাটা কাছেই, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট । বলা-কওয়া নেই, সটান
একাদশ গিয়ে দরজায় হানা দিলাম ।

এই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত !

তু ধু মনে মনে সন্তোষ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে সশরীরে এসে আবির্ভূত হলাম। আপনার নিবিড়-গভীর কবি-মন প্রসন্ন নীলিমার মত প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভাবলাম আপনার হৃদয়ের সেই প্রসন্নতার স্বাদ নিই।

ভীষ্ম হাসি হেসে জীবনানন্দ আমার হাত ধরল। টেনে নিয়ে গেল তার ঘরের মধ্যে। একেবারে তার হৃদয়ের মাঝখানে।

লোকটি যতই গুপ্ত হোক পদবীর গুপ্ত তখনো বর্জন করেনি। আর যতই সে জীবনানন্দ হোক তার কবিতায় আসলে একটি জীবনাধিক বেদনার প্রাহেলিকা।

বরিশাল, সর্বানন্দ ভবন থেকে আমাকে-লেখা তার একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুশি হলাম। আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছেনি। মাঝে মাঝে নিতান্ত “নীলোৎপল-পত্রকাস্তিভিঃ কচিং প্রভিরাজনরাশিসন্নিভৈঃ” মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে কেলে চোখের চাতককে হৃদয়ের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই আবার আকাশের cerulean vacancy, ডাক-পাখির চিৎকার, গাভ্রিল-শালিকের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ—উদাস অলস নিরালা ছপুরটাকে আরো নিবিড়ভাবে জন্মিয়ে তুলচে।

চারিদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজিবাগের ভেতর বসে আছি, দূরে দূরে তাতার দহ্যর হুল্লোড়। আমার তুরানী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি!...হঠাৎ কোথেকে কত কি ভাগিদ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশমাল্য ভিড়ে! সারাটা দিন—অনেকখানি রাত—জোয়ারভাটায় হাবুড়বু।

গেল কাক্তনমাসে সেই যে আপনার ছোট্ট চিঠিখানা পেয়েছিলুম মেকথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে। তখন থেকেই বুঝেছি বিধাতার রূপা আমার উপর আছে। আমি সারাটা জীবন এমনতর জিনিসই চেয়েছিলুম। চট করে যে মিলে যাবে সে রকম ভরসা বড় একটা ছিল না। কিন্তু শুরুতেই পেয়ে গেলুম। ছাড়চিনে, এ জিনিসটাকে স্মৃতির মণিগুণ্ডার ভেতরেই আটকে রাখবার মত উদাসী আমি নই। বেদান্তের দেশে জন্মেও কাহাকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ায় ভেতরই আমি কাহাকে ছুটিয়ে তুলতে চাই।

শুট হৃদিস পাচ্ছি আবার এই টিমটিমে কবি-জীবনটি দূপ করেই নিবে যাবে ; যাগ গে—আপলোস কিসের ? আপনাদের নব-নব সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর খুঁজে পাব তো—আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সমস্ত। আমার হাতে যে বাঁশী ভেঙে যাচ্ছে,—গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেছে,—আমার মেহেবাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনিবার্ণ প্রদীপে পথ দেখে চললুম, এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে।

চারদিকেই বে-দরদার ভিড়। আমরা যে ক’টি সমানধর্মী আছি, একটা নিরেট অচ্ছেদ্য মিলন-স্থল দিয়ে আমাদের গ্রাথিত করে রাখতে চাই। আমাদের তেমন পয়সাকড়ি নেই বলে জীবনের creature comforts জিনিসটি হয়তো চিরদিনই আমাদের এড়িয়ে যাবে ; কিন্তু একসঙ্গে চলার আনন্দ থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই—সে পথ যতই পর্ণমলিন, আতপক্লিষ্ট, বাত্যাহত তোক না কেন।

আরো নানারকম আলাপ কলকাতায় গিয়ে হবে। কেমন পড়ছেন ? First Class নেওয়া চাই। কলকাতায় গিয়ে নতুন ঠিকানা আপনাকে সমর-যত জানাব। আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

বরিশাল থেকে ফিরে এসে জীবনানন্দ ডেরা নিল প্রেসিডেন্সি বোডিংয়ে, হারিসন রোডে, “কল্লোলের” নাগালের মধ্যে। একা এক ঘর, প্রায়ই যেতাম তার কাছে। কোনো-কোনো দিন মনে এমন একটা সুর আসে যখন হৈ-হজা, জনতা-জটলা ভালো লাগে না। সে সব দিন পটুয়াটোলা লেনে না ঢুকে পাশ গাটিয়ে রমানাথ স্বজুমদার স্ট্রাট দিয়ে জীবনানন্দের মেসে এসে হাজির হতাম। পেতাম একটি অস্পর্শশীতল সান্নিধ্য, সমস্ত কথার মধ্যে একটি অন্তর্যতম নীরবতা। তুচ্ছ চপলতার উর্ধ্ব বা একটি গভীর ধ্যানসংযোগ। সে যেন এই সংগ্রাম-সংকুল সংসারের অন্ত্রে নয়, সে সংসারপলাতক। জোর করে তাকে দু-একদিন কল্লোল-আগিসে টেনে নিয়ে গেছি, কিন্তু একটুও আরাম পায়নি, সুর মেলাতে পারেনি সেই সপ্তস্বরে। যেখানে অনাহত ধ্বনি ও অলিখিত রং জীবনানন্দের আড্ডা সেইখানে।

তীব্র আলো, শব্দ বা প্রখর স্বাগতজন—এ সবের মধ্যে সে নেই। সে ধূসরতার কবি, চিরপ্রদোষদেশের সে বাসিন্দা। সেই যে আমাকে সে জিখেছিল,

আমি ছায়ার মধ্যে কারা খুঁজে বেড়াই, সেই হয়তো তার কাব্যলোকের আসল চাবিকাঠি। যা সত্তা তাই তার কাছে অবস্থ, আর বা অবস্থ তাই তার অমু-
ভূতিতে আশ্চর্য অন্তিমর। যা অমৃত তাই অনির্বচনীয় আর বা শব্দস্পর্শস্পন্দ
তাই নীরবনির্জন, নির্বাণনিশ্চল। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ নতুন স্বাদ নিয়ে
এগেছে, নতুন ত্রোস্তনা। নতুন মনন, নতুন চৈতন্য। খোয়াটের জলে ভেসে
আসা ভরাটের মাটি নয়, সে একটি নতুন নিঃসঙ্গ নদী।

সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্ত্রীর্থে
স্তনভ্রাম্যমুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি সে কর্জুপক্ষের কোপে পড়ে।
অল্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যতদূর দেখতে পাই অল্লীলতার
হাঁড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি।

নথাগ্র পর্বস্ত যে কবি, সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়। এবং
তারই অন্ত্রে আশা, সর্বকল্যাণকারিণী কবিতা তাকে বঞ্চনা করবে না।

ইডেন পার্গেনে একজিবিশনের তাঁবু ছেড়ে শিশিরকুমার ভাড়াটি এই সময়
মনোমোহনে “সীতা” অভিনয় করছেন, আর সমস্ত কলকাতা বসন্ত-প্রলাপে
অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-
মিথুনের একটিকে বাণবিদ্ধ করার দক্ষন বাগ্মীর কণ্ঠে যে বেদনা উৎসারিত
হয়েছিল, শিশিরকুমার তাকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বাণীময় করে তুললেন। সমস্ত
কলকাতা-শহর ভেঙে পড়ল মনোমোহনে। শুধু অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি
নেই। রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে, নরবেশে কে সে দেবতার
দেহধারী, তার জয়ধ্বনি করবে, পারে তো পা স্পর্শ করে প্রণাম করবে তাঁকে।

সে সব দিনের “সীতা” জাতীয় মহাঘটনা। বিজ্ঞানলালের “সীতা”র
হস্তক্ষেপ করল প্রতিপক্ষ, কুছ পরোয়া নেই, যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে
নেওয়া হল নতুন বই। রচনা তো গোঁণ, আসল হচ্ছে অভিনয়, দেবতার
দুঃখকে মানুষের আয়তনে নিয়ে আসা, কিংবা মানুষের দুঃখকে দেবত্বমণ্ডিত
করা। শিশিরকুমারের সে কি ললিতগম্ভীর রূপ, কণ্ঠধরে সে কি স্নায়ুভরঙ্গ!
কতবার যে “সীতা” দেখেছি তার লেখাজোখা নেই। দেখেছি অথচ মনে
হয়নি দেখা হয়েছে। মনে ভাবছি, জন কিটসের মত অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে
আছি সেই গ্রীসিয়ান আর্নের দিকে আর বলছি : A thing of Beauty is
a Joy for ever.

কিন্তু কেবলই কি দু-তিন টাকার ভাড়া সিটে বসে হাততালি দেব, একটি-

বারও কি যেতে পারব না তাঁর সাজসজ্জা, তাঁর অন্তরঙ্গতার রংমহলে? বাবে যে, অধিকার কি তোমার? তাঁর অগণন ভক্তের মধ্যে তুমি তো নগণ্যতম। নিজে কে শিল্পী, সৃষ্টিকর্তা বলতে চাও, সেই অধিকার? তোমার শিল্পবিদ্যা কি আছে তা তো জানি, কিন্তু দেখছি বটে তোমার আশ্বর্ষ্যটাকে। তোমাকে কে গ্রাহ্য করে? কে তোমার তত্ত্ব নেয়?

সব মানি, কিন্তু এত বড় শিল্পাদিত্যের আশ্বর্ষ্য পাব না এটাই বা কেমনত্তর?

তেরোশ বজ্রিশ সালের ফাস্তনে “বিজলী” দীনেশরঞ্জনর হাতে আসে। তার আগে সাবিজীপ্রসন্নর আমলেই নূপেন “বিজলী”তে নাট্যসমালোচনা লিখত। সে সব সমালোচনা মামুলি হিজিবিজি নয়, সেটা ব্যবসাদারি চোখের কটাক্ষপাত। সেটা একটা আলাদা কারুকর্ম। নূপেন তার আবেগ-গঞ্জীর ভাষায় “সীতার” প্রশস্তিরচনা করলে—সমালোচনাকে নিয়ে গেল কবিতার পর্যায়ে।

সে সব আলোচনা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারেরও চোখ পড়ল, কিন্তু তাঁর চোখ পড়ল লেখার উপর তত নয়, যত লেখকের উপর। নূপেনকে তিনি বুকে করে ধরে নিয়ে এলেন।

কিন্তু শুধু শুদ্ধভক্তির কবিতাকে কি তিনি মূল্য দেবেন? চালু কাগজের প্রশংসাপ্রচারে কিছু না-হয় টিকিট-বিক্রির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কবিতা? কেই বা পড়ে, কেই বা অর্থ-অনর্থ নিয়ে মাথা বামার? পত্রিকার পৃষ্ঠায় ফাঁক বোজাবার জন্তেই তো কবিতার সৃষ্টি। অর্থাৎ পদের দিকে থাকে বলেই তার আরেক নাম পদ্য।

জানি সবই, তবু সেদিন শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যে লোককালান্তীত বেদনার ব্যঞ্জনা আনলেন তাকেই বা প্রকাশ না করে থাকতে পারি কই? সোজাসুজি শিশিরকুমারের উপর এক কবিতা লিখে বসলাম। আর একটু লাক-সত্তরো আরগা করে ছাপালাম “বিজলীতে”।

দীর্ঘ দুই বাহু যেদি আর্জকণ্ঠে ডাক দিলে : নীতা, নীতা, নীতা—

পলাতক গোধূলি প্রিয়ারে,

বিরহের অন্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিজী-হৃহিতা

অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।

“কান্না কেঁদেছে ঘন কলকণ্ঠা শিশ্রু-বেশা-বেজবতী তীরে

তারে তুমি দিয়াছ যে ভাষা ;

নিখিলের সলীলীন বস্ত্র ছুঁতে খুঁজে কেবের বুধা প্রেরণীয়ে,
 তব কণ্ঠে ভাদ্বেয় শিপাসা ।
 এ বিশ্বের সর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই ভব উদার ক্রন্দনে
 ঘুচে গেছে কালের বন্ধন ;
 তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেরণী যুগে-যুগে চঞ্চল চরণে
 ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন ।
 বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে ত্বজন
 আদি নাই, নাহি তার সীমা ;
 তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যক্ষ অশন
 চিস্তে তব ধ্যানীর মহিমা ॥

শিশিরকুমারের সানন্দ ডাক এসে পৌঁছল—সম্মেলন সম্ভাষণ । ভাগ্যের দক্ষিণ
 মুখ দেখতে পেলাম মনে হল । দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে সটান চলে গেলাম তাঁর
 মাজঘরে । প্রণাম করলাম ।

নিজেই আবৃত্তি করলেন কবিতাটা । যে অর্থ হয়তো নিজের মনেও
 অলক্ষিত ছিল তাই যেন আরোপিত হল সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের ঔদার্যে ।
 বললেন, ‘আমাকে ওটা একটু লিখে-টিখে দাও, আমি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিই
 এখানে ।’

দীনেশরঞ্জন তাঁর চিত্রীর তুলি দিয়ে কবিতাটা লিখে দিলেন, ধারে ধারে কিছু
 ছবিরও আভাস দিয়ে দিলেন হয়তো । সোনার জলে কাজকরা ফ্রেমে বাঁধিয়ে
 উপহার দিলাম শিশিরকুমারকে । তিনি তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন ।

একটি যজনবৎসল উদার শিল্পমনের পরিচয় পেয়ে মন যেন প্রসার লাভ
 করল ।

পনেরো

তারপর থেকে কখনো-সখনো গিয়েছি শিশিরকুমারের কাছে । অভিনয়ের
 কথা কি বলব, সহজ আলাপে বা সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন আর কোথাও
 শুনিনি । যত বড় তিনি অভিনয়ে তত বড় তিনি বলনে-কথনে । তা খ্রীষ্টধর্মের
 ইতিহাসই হোক বা শেক্সপিয়রের নাটকই হোক বা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যই

হোক। কিংবা হোক তা কোনো অস্বস্তি বিষয়, প্রথম প্রায় ভালবাসা। তাঁর সেই সব কথা মনে হত যেন বিকিরিত বহ্নিকণা, কখনো যুগ্মদ্বিধু। অভিনয় দেখে হয়তো ক্লান্তি আসে, কিন্তু মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে পারি তাঁর কথা শুনে। তাতে কি শুধু পাণ্ডিত্যের দীপ্তি? তা হলে তো ঘুম পেত, যেমন উকিলের অতিকৃত বক্তৃতা শুনে হাকিমের ঘুম আসে। না, তা নয়। তাতে অহুতবেশ গভীরতা, কবিমানসের মাদুর আর সেই সঙ্গে বাচন-কলার স্ফূর্তি। তা ছাড়া কি মেধা, কি দীপ্তি, কি দূরবিস্তৃত স্মরণশক্তি! মুহূর্তেই বোঝা যায় বিরাট এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি—বৃহৎ এক বনস্পত্তির প্রচ্ছায়ে।

শিশিরকুমার যে কত বড় অভিনেতা, কত বড় অসাধ্যসাধক, আমার জানা-মত চোটখাট একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটা আরো অনেক পরের কথা, যে বছর শিশিরবাবু তাঁর দলবল নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। আমেরিকা থেকে একটি বিদুষী মহিলা এসেছেন ভারতবর্ষে, দৈবক্রমে তাঁর সৌহার্দ্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁর খুব ইচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে যে অভিনেতা আমেরিকা যাবার সাহস করেছেন তাঁর সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন। শিশিরকুমার তখন নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে তেতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি আনন্দিত মনে নিমন্ত্রণ করলেন সেই বিদেশিনীকে। দিন-রক্ষণ ঠিক করে দিলেন।

নির্ধারিত দিনে বিদেশিনী মহিলাকে সঙ্গে করে উঠে গেলাম ভেতলায়। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলাম না, তাই তাঁকে বললাম, ‘তুমি এই বারান্দায় একটু দাঁড়াও, আমি ভিতরে খোঁজ নিই।’

ভিতরের খোঁজ নিতে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। দেখি ঘরের মেঝের উপর ফরাস পাতা—আর তার উপরে এমন সব লোকজন জমায়েত হয়েছেন যাদের অস্বস্তি দিনে-দুপুরে দেখা যাবে বলে আশা করা যায় না। হার্মোনিয়ম, ঘুঙুর, আরো এটা-ওটা জিনিস এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বোধহয় কোনো নাটকের কোনো জরুরি দৃশ্যের মহড়া চলছিল। কিন্তু তাতে আমার মাথাব্যথা কি? শিশিরবাবু কোথায়? এই কোথা নিয়ে এসেছি বিদেশিনীকে? আবার আরেকজন মিস মেয়ে না হয়!

জিগগেস করলাম, শিশিরবাবু কোথায়?

খবর যা পেলাম তা মোটেই আশাবৰ্ধক নয়। শিশিরবাবু অসুস্থ, পাশের ঘরে নিজ্জাগত।

কক্কাবতী ছিলেন সেখানে। তাঁকে বললাম আমার বিপদের কথা। তিনি বললেন, বসুন, আমি দেখছি! তুলে দিচ্ছি তাঁকে।

সমস্ত ফরাসটাই তুলে দিলেন একটানে। শূণ্ডুর, হার্মোনিয়ম, এটা-সেটা, সাজ আর উপাঙ্গের দল সব পিটটান দিলে। কোন জাহুকরের হাত পড়ল—চকিতে ক্রীমস্ত হয়ে উঠল ঘর-দোর। কোথেকে খানকয়েক চেয়ারও এসে হাজির হল। বিদেশিনীকে এনে বসালাম।

তবু ভয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ যে অভিনেতা তাঁর স্পর্শ পেতে না তার তুল হয়।

গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে প্রবেশ করলেন শিশিরকুমার। প্রতিভা-দীপ্ত সৌম্য মুখে অনিভ্যার ক্লেসক্লাস্টিক সৌন্দর্য্যমাণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ সৌজনে অভিবাদন করলেন সেই বিদেশিনীকে।

তারপর হুক করলেন কথা। যেমন তার জ্যোতি ভেমনি তার অজস্রতা। আমেরিকার সাহিত্যের খুঁটিনাটি—তার জীবন ও জীবনাদর্শ। আর থেকে থেকে তার-সহায়ক কবিত্বের আবৃত্তি। সর্বোপরি এক সৃজনপিণাস শিল্পী-মনের দুর্বারতা। বিদেশিনী মহিলা অভিভূত হয়ে রইলেন।

চলে আসবার পর জিগগেস করলাম মহিলাকে : ‘কেমন দেখলে?’

‘চমৎকার। মহৎ প্রতিভাবান—নিঃসন্দেহ।’

ভাবি, এত মহৎ ধীর প্রতিভা তিনি সাহিত্যের জন্তে কি করলেন? অনেক অভিনেতা তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু একজন নাট্যকার তৈরি করতে পারলেন না কেন?

শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে আবার একবার আসি ঢাকার দল এসে “কল্লোলে” মিশলে পরে। আগে এখন ঢাকার দল তো আশুক।

তার আগে ছুঁজন আসে ফরিদপুর থেকে। এক জসীমউদ্দীন, আর হুমায়ুন কবির।

একেবারে সাদামাঠা আত্মভোলা ছেলে এই জসীমউদ্দীন। চূলে চকুনি নেই, আমায় বোতাম নেই, বেশবাসে বিভ্রাস নেই। হয়তো বা অভাবের চেয়েও ঔদাসীন্যই বেশি। সরলস্ত্রামলের প্রতিমূর্তি যে গ্রাম তারই পরিবেশ তার ব্যক্তিতে তার উপস্থিতিতে। কবিতায় জসীমউদ্দীনই প্রথম গ্রামের দিকে

সংকেত, তার চাষা-ভূষণ, তার খেতখামার, তার নদী-নালায় দিকে। তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে। যে ছুঁতে সর্বহারার হয়েও সর্বময়। যে দৃশ্য অগোচর হয়েও উচু জাতের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পারিপাট্য। একেবারে সোজাখুঁজি মর্মস্পর্শ করবার আকুলতা। কোনো ‘ইজমে’র ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।

এমনি একটি কবিতা গেঁয়ো মাঠের সজল শীতল বাতাসে উড়ে আসে “কল্লোলে”।

“তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দু’হাতে জড়িয়ে ধরি
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি ;
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত বয়ে
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আধালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠপানে চাহি
হাস্যরবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাঁদের জড়িয়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গা—”

কবিতাটির নাম ‘কবর’। বাংলা কবিতার দিগদর্শন। “কল্লোলের” পৃষ্ঠা থেকে সেই কবিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাংলা পাঠ-সংগ্রহে উদ্ধৃত হল! কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সত্বেম বাঁচাতে গিয়ে অনভিজাত “কল্লোলের” নামটা বেমালুম চেপে গেলেন।

হুমায়ূন কবির কখনো-সখনো আসত “কল্লোলে”, কিন্তু কায়েরমী হয়ে খুঁটি পাকাতো পারেনি। নত্ন মুখচোরা—কিন্তু সমস্ত মুখ নিয়ত হাসিতে সমুজ্জল। তোমায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় দুই চক্ষু দূরাণ্বেষী। কথার অস্ত্রে তত হাসে না যত তার আদিতে হাসে; তার মানে, তার প্রথম সংস্পর্শটুকু প্রতি মুহূর্তেই আনন্দময়। কবিরের তখন নবীন নৌরদের বর্ণা, কবিতায় প্রেমের বিচিত্রবর্ণ কলাপ বিস্তার করছে। কিন্তু মাধ্যম্নিন গান্ধীর্থে সেই নবানুগের মাধুর্য কই? বয়সের ক্ষেত্রে প্রাবীণ্য আশুক, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে যেন পরিপূর্ণতা না আসে।

“কল্লোলে” এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। একদিকে রক্ষ-তক্ষ শহরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনাচ্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানখেত বা ড্রয়িংরুম। সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উত্তোগ। ষতটা শক্তিসাধ্য, শুধু ভবিষ্যতের ফটকের দিকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া। আর তা শুধু সাহিত্যে নয় ছবিতে। তাই একদিন যামিনী রায়ের ডাক পড়ল “কল্লোলে”। তেরোশ বক্ত্রিশের আশ্বিনে তাঁর এক ছবি ছাপা হল—এক গ্রাম্য মা তার অনাবৃত বুকের কাছে শিশুসন্তানকে দুই নিবিড় হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব সেই দাঁড়াবার ভঙ্গিটি। বহির্দৃষ্টিতে মার মুখটি শ্রীহীন কিন্তু একটা স্থিরলক্ষ্য স্নেহের চারুতার অনির্বচনীয়। গ্রীবা, পিঠ ও স্তনাংশেরেখার বক্রিমায় সেই স্নেহ জ্বলভূত। অকপ্রত্যক্ষ দীন, হয়তো অশোভন, কিন্তু দুইটি কর্মকঠিন কন্নতলের পর্যাপ্তিতে প্রকাণ্ড একটা প্রাপ্তি, আশ্রয় একটা ঐশ্বর্য যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেই তো তার সৌন্দর্য—নিজের মাঝে এই অভাবনীশ্বের আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের বিষয় তার শিশু, তার বুকের অনাবরণ। যে শিশুর এক হাত তার আনন্দিত মুখের দিকে উৎক্ষিপ্ত—তার জন্মের আলোকিত আকাশপটের দিকে।

যামিনী রায় বন্ধু ছিলেন “কল্লোলের”। পরবর্তী যুগে তিনি যে লোক-লক্ষীর রূপ দিয়েছেন তারই অক্ষুরাভাস যেন ছিল এই আশ্বিনের ছবিতে।

সে-সব দিনে যেতাম আমরা যামিনী রায়ের বাড়িতে বাগবাজারে। অজ্ঞাত গলিতে অখ্যাত চিত্রকর—আমাদেরও তখন তাই অবাধ নিমন্ত্রণ। আত্মীয় আত্মীয় যোগ ছিল “কল্লোলের” সঙ্গে। শুধু অকিঞ্চনতার দিক থেকে নয়, বিজ্রোহিতার দিক থেকে। ভাঁড়ের মধ্যে রং আর বাঁশের চোড়ার মধ্যে তুলি আর পোড়ো বাড়িতে স্টুডিও—যামিনী রায়কে মনে হতো রূপকথার সেই নায়ক যে অসম্ভবকে সত্যভূত করতে পারে। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো করে দিতে পারে এক মুহূর্তে।

সোনা গালাবার সময় বুঝি খুব উঠে-পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা—মুখে চোঙ—ঘন্টাকণ না সোনা গং। গলার পর যেই গড়ানে ঢালা, অমনি নিশ্চিন্ত। অমনি স্বর্ণময়।

পূর্বতনদের মধ্যে থেকে হঠাৎ স্মরেন গাজুলি মশাই এসে “কল্লোলে” জুটলেন। চিরকাল প্রবাসে থাকেন, তাই শিল্পমানসে মেকি-মিশাল ছিল না।

যেখানে প্রাণ দেখেছেন, সৃষ্টির উদ্‌গমন দেখেছেন, চলে এসেছেন। অগ্রবর্তীদের মধ্যে থেকে আরো কেউ-কেউ এসেছিলেন “কল্লোলে” কিন্তু ততটা যেন মিশ খাওয়াতে পারেননি। স্বরেনবাবু এগিয়ে থেকেও পিছিয়ে ছিলেন না, সমভাবে অল্পপ্রেরিত হলেন। “কল্লোলের” জন্যে উপগ্রাস তো লিখলেনই, লিখলেন শরৎচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবনী। স্বরেনবাবু শরৎচন্দ্রের শুধু আত্মীয় নন, আবাল্য সঙ্গী-সাথি—প্রায় ইয়ারবন্ধি বলা যেতে পারে। খুব একটা অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কাহিনী, কিন্তু সাহিত্যরসে বিভাসিত।

শরৎচন্দ্রের জীবনী ছাপা হবে, কিন্তু তাঁর হালের ফোটো কই? কি করে জোগাড় করা যার? না, কি চেয়ে-চিন্তে কোথা থেকে একটা পুরোনো বয়সের ছবি এনেই চালিয়ে দেওয়া হবে? চেহারাটা যদি তরুণ-তরুণ দেখায়, বলা যাবে পাঠককে, কি করব মশাই লেখকেরই বয়স বাড়ে, ছবি অপরিবর্তনীয়!

গভীর মুখে ভূপতি বললে, ‘ভাবনা নেই, আমি আছি।’

ভূপতি চৌধুরী “কল্লোলের” আদিত্য সত্য, এবং অন্তকালীন। একাধারে গল্পলেখক, ইঞ্জিনিয়ার, আবার আমাদের সকলকার ফোটোগ্রাফার। প্রফুল্ল মনের সদালাপী বন্ধু। শত উল্লাস উত্তালতার মধ্যেও ভদ্র মাজিত রুচির অন্তঃশীল মাধুর্য্যটি যে আহত হতে দেয় না। সমস্ত বিষয়ের উপরেই দৃষ্টিভঙ্গি তার বৈজ্ঞানিক, তাই তার লেখায় ও ব্যবহারে সমান পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ভঙ্গির অন্তরালে একটি চিরজাগ্রত কবি ভাবাকুল হয়ে রয়েছে। কঠোরের গভীরে স্বাহ্ সৌন্দর্যের অবতারণ।

তেরোশ একত্রিশ সালের সেই নবীনব্রতী যুবকের চিঠির কটি টুকরো এখানে তুলে দিচ্ছি :

“মানব সভ্যতাস্বত্বের ধ্বংসক ধ্বনির পীড়নে কান বধির হবার উপক্রম হয়েছে। ফার্নেসের লালচক্ষু, পিস্টনের গ্লসারদোলা, গভর্নরের ঘূর্ণি, ক্রাই হাইলের টলেপড়া, জাফটের আকুলিবিফুলি—প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। খুব নকালে বাড়ি থেকে উঠে সোজা সাইকেলে করে কলেজ-প্রাইম-মার্শ ল্যাবোরেটরিতে ওয়ারলেস যন্ত্রিও সেট তৈরি করাচ্ছি—আবার নক্যায় বাড়ি ফিরে আসছি।

সত্যি বলছি ভাই, যখন শান্তভাবে চুপ করে শুয়ে থাকি, হয়ত আকাশের ঘন নীলিমার দিকে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে কত কি ভেবে যাই, একটা শান্তি আর তৃপ্তি আর পূর্ণতা প্রাণের মধ্যে অনুভব করি—মাস্তকের কর্মজীবনের

কোলাহল তখন ভাবতেও ভাল লাগে না। কিন্তু সেই কোলাহলের মাঝে মানুষ যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে তার কাজের আনন্দে কি মত্তই না হয়ে ওঠে। এ মত্ততার কিপ্রভা আর কিপ্ততার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বেগ আছে, সে বেগে মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ হয়, বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। তারপর আবার অন্ধকারের করালী লীলা প্রকট হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি না কি ভালো লাগে—এই উন্নত দুর্দাম বেগ না শাস্ত-স্থির আত্মসমাধি? কলের বাঁশির তীব্র দৃঢ় আহ্বান, না, মনোবাঁশরীর রঞ্জে-রঞ্জে বেজে-ওঠা ব্যাকুল ক্রন্দন? লোকারণ্য না নির্জনতা? বিজ্রোহ না স্বীকৃতি?

সব দেখি আর কি মনে হয় জান? বণিক সভ্যতার বাহু আড়ম্বর আর লম্বাব্রোহের ড্র্যাজেডি যতই চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠুক না, মাটির ভাঁড়ে ওঠপন্ন দিলে, মাতাল হবার প্রবৃত্তি হয় না। সোনার পেরালা চাই। সোনার রঙেই মানুষ পাগল হয়ে ওঠে, মদের নেশায় নয়। মদ খেয়ে মানুষ কতটুকু মাতাল হতে পারে? তাকে মাতাল করতে ঐ মদকে সোনার পেরালায় ঢেলে রূপার স্বপনের ছোঁয়াচ দিতে হবে।...

তোমার চিঠির প্রত্যেকটা অক্ষর, তার এক-একটি টান আমার মনকে টেনে রেখেছে। আকাশ ভরে বেষ করেছে আজ। কি কালো জমাট আঁধার—যেন ভীষণতা শব্দের প্রতীকার রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। এরই মধ্যে তোমার একটা কথার উত্তর খুঁজে পেয়েছি। কবিত্ব সে খালি ফুলের অগ্নান হানিটুকু দেখে, চাঁদের অক্ষুরন্ত সুধাস্রোতে ভেসে বা নদীর চিরন্তনী কলধ্বনি শুনেই উদ্ভূত হয়ে ওঠে না। রণক্ষেত্রে রক্তস্রোতের ধারায় মৃতদেহের তুণীকৃত পাহাড়ের মাঝে প্রেতভৈরবের অট্টহালির ভীমরোলে ভল্লথড়গাশল্যশূলের উত্তত অগ্রে, অমানিশার গাঢ় অন্ধকারেও সে বিকশিত হয়। যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই আবার ভীমা ভীমরোলা নৃগুণালিনী চামুণ্ডা।

অচিন, খুব একটা পুরোনো কথা আবার মনে পড়ছে। সাথি হচ্ছে মানুষেরই মূক্যের মত। তাদেরই মধ্যে নিজের খানিকটা দেখা যায়। তাই যখন তোমাকে প্রেমেনকে শৈলজাকে গোকুলবাবু D. R. নূপেন পবিত্রকে দেখি তখনই মনে খানিকটা হর্ষ জেগে ওঠে। নিজেকে খানিকটা-খানিকটা দেখার আনন্দ তখন অনীম হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, লবায়ের খবর দেব। D. R. পাবলিশিং নিয়ে খুব উঠে-পড়ে লেগেছেন। G. C. আসেন সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যান। শৈলজা মাঝে-মাঝে আসেন, বিদ্যাতের মত ঝিলিক দিয়ে

একটা সেই বাঁকা চোখের চাউনি ছুঁড়ে চলে যান, কথা বড় কন না। পবিত্র ঠিক তেমনি ভাবে আসে যায় হাসে বকে, আপনার খেলালে চলে। ওকে দেখলে মনে হয় যেন স্বতন্ত্র প্রাণধারা। আর নুপেন? ঠিক আগেরই মতো ধূমকেতুর আসা-যাওয়ার ছন্দে চলে...

পুকলিয়ায় ক্যাম্প করতে এসেছি কলেজ থেকে। তোমার লেখার তালিকা দেখে আমার হিংসে হচ্ছে। আমি তো লেখা ছেড়ে দিয়েছি বললেই হয়— তবে আজকাল আর একটা জিনিস ধরেছি সেটা হচ্ছে বিশ্রাম করা। চূপ করে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। ঘুরে অনেকখানি নিচুতে ধানের ক্ষেতের সবুজ শীষের দোলায়মান বর্ণবিভ্রাট ভারি চমৎকার লাগে কখনও। অনেক দূরে ঠিক অপূর্ণ ছায়ার মতো একটা পাহাড়ের সারির নীল রেখা সারা দিনরাত জেগে আছে চোখের উপর।

এখানে একটি মেয়ের ছবি তুললাম সেদিন। ভারি সুন্দর মেয়েটি, কিন্তু তার সেই চপল ভঙ্গিটিকে ধরতে পারিনি। সেটুকু কোথায় পালিয়ে গেছে। যন্ত্র তার ক্ষমতার সব আয়ত্ত করেছে বটে, কিন্তু সে প্রাণের ছায়া ধরতে পারে না—”

এক রোদে-পোড়া হুগুরে বাজে-শিবপুর যাওয়া হল শরৎচন্দ্রের ছবি তুলতে। ক্যামেরাধারী ভূপতি। স্বাক্ষর-ধরন তাড়ান-খেদান, ছবি একটা তাঁর তুলে আনতে হবেই। কিন্তু যদি গা-ঢাকা দিই একেবারে লুকিয়ে থাকেন চূপচাপ? যদি বলেন, বাড়িতে নেই।

খুব হৈ-হল্লা করলে শেষ পর্যন্ত কি না বেরিয়ে পারবেন?

অন্তত বকা-ঝকা করতে তো বেরবেন একবার। অন্তএব খুব কড়া করে কড়া নাড়ো। কড়া যখন রয়েছে নাড়াবার জেগেই রয়েছে, যতক্ষণ না হাতে কড়া পড়ে। ‘ভেলি’র চিংকারে বিহ্বল হলে চলবে না।

দরজা খুলে দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। হুগুরের রোদের মত বাঁজালো নয়, শরৎচন্দ্রের মতই স্নেহশীল। শুভ্রোজ্জ্বল সৌজাত্যে আহ্বান করলেন সবাইকে। কিন্তু প্রাথমিক আলাপের পর আসল উদ্দেশ্য কি টের পেয়ে পিছিয়ে গেলেন। বললেন, ‘খোলটার ছবি তুলে কি হবে?’

কিছুই যে হবে না শুধু একটা ছবি হবে এই তাঁকে বহু যুক্তি-ভর্ক প্রয়োগ করে বোঝানো হল। তিনি রাজি হলেন। আর রাজিই যদি হলেন তবে তাঁর একটা লিখনরত ভঙ্গি চাই। তবে নিয়ে এল নিচু লেখবার টেবিল, গড়গড়া,

মোটো ফাউন্টেন-পেন আর ডাব-মার্ক লেখবার প্যাড। পাশে বইয়ের সারি, পিছনে পৃথিবীর মানচিত্র। যা তাঁর সাধারণ পরিমণ্ডল। ডান হাতে কলম ও বাঁ হাতে সটকা নিয়ে শরৎচন্দ্র নত চোখে লেখবার ভঙ্গি করলেন। ভূপতির হাতে ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

আজ সেই ছবিটির দিকে একদৃষ্টে ভাকিয়ে আছি। শরৎচন্দ্রের খুব বেশি ছবি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু “কল্লোলের” পৃষ্ঠায় এটি যা আছে, তার তুলনা নেই। পরবর্তী যুগের কজন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিহীন নতুন লেখকের সঙ্গে তান বে তাঁর আত্মার নিবিড়-নৈকট্য অন্তর্ভব করেছিলেন তারই স্বীকৃতি এ ছবিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। কমনীয় মুখে কি স্নেহ কি করুণা! এ একজন দেশদিকপতির ছবি নয়, এ একজন ঘরোয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গের ছবি! নিজের হাতে ছবিতে দস্তখৎ করে সজ্ঞানে যোগস্বাপন করে দিলেন। বললেন, ‘কিন্তু জেনো, সবাই আমরা সেই রবীন্দ্রনাথের। গঙ্গারই ঢেউ হয়, ঢেউয়ের কখন গঙ্গা হয় না।’

এমনি ধরনের কথা তিনি আরো বলেছেন। তারই একটা বিবরণ তেরোশ তেজিশের জৈষ্ঠের “কল্লোলে” ছাপা আছে।

‘হাওড়া কি অন্য কোথাও ঠিক মনে নেই, একটা চোট-মতন সাহিত্য-সম্মিলনে আমাকে একজন বললেন, আপনি যা লেখেন তা বুঝতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না, বেশ ভালোও লাগে। কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না—কি যে তিনি লেখেন তা তিনিই জানেন। ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন তাঁর এই কথা শুনে নিজেতে অতঃকৃত মনে করে আমি খুব খুশি হব। আমি উত্তর দিলুম, রবিবাবুর লেখা তোমাদের তো বোঝবার কথা নয়। তিনি তো তোমাদের জন্তে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্তে রবিবাবু লেখেন, তোমাদের মত যারা পাঠক তাদের জন্তে আমি লিখি।’

এ বিবরণটি সংগ্রহ করে আনেন সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। সংগ্রহ করে আনেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থেকে। কানপুর প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁকে সভাপতি করে ধরে নিয়ে যাবার জন্তে গিয়েছিল সত্যেন। শরৎচন্দ্র তখন আর শিবপুরে নন, চলে গেছেন রূপনারায়ণ ধারে, কিন্তু তা হলেও অপরিচিত অত্যাগতকে সংবর্ধনা করতে এতটুকু তাঁর অন্তথা নেই।

কিন্তু সত্যেনের কথাটাই বলি। এত বড় মহার্ঘ প্রাণ আর কটা মেখেছি আশেপাশে? সত্যেন সাহিত্যিক নয়, জার্নালিস্ট, কিন্তু সাহিত্যরসবুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ

তৎপর। প্রত্যাহের জীবনের সঙ্গে শুধু খবরের কাগজের সম্বন্ধ—ভেতন জীবনে সে বিশ্বাসী নয়। মাস্তবের সম্বন্ধে সমস্ত খবর শেষ হয়ে যাবার পরেও যে একটা অলিখিত খবর থাকে তারই সে জিজ্ঞাস্য। যতই কেননা খবর শুদ্ধক, আসল সংবাদটি জানবার জন্যে সে অলক্ষিতে একেবারে অন্তরের মধ্যে এসে বাসা নেয়। আর অন্তরে প্রবেশ করবার পক্ষে কোন মুহূর্তটি নিভৃত-প্রশস্ত তা খুঁজে নিতে তার দেরি হয় না।

প্রেমরসোচ্ছলিত প্রভৃষ্ট প্রাণ। স্বগঠিত স্বাধ্যসমৃদ্ধ চেহারা—স্বচাক্ষুর্দর্শন প্রাণখোলা প্রবল হাসিতে নিজেকে প্রসারিত করে দিত চারপাশে। “কল্লোলের” দল যখন হোলির হল্লায় রাস্তায় বেরুত তখন সত্যোন্মকে না হলে যেন ভরা-ভরতি হত না। “কল্লোলের” প্রতি এই তার অহুরাগের রং সে তার চারপাশের কাগজেও বিকীর্ণ করেছে। বালিতে-চিনিতে মিশেল সব লেখা। স্বরদূষণ সমালোচকের দল বালি বেচেছে, আর সত্যোন্মের মত যারা সত্যসম্বন্ধ সমালোচক—তারা রচনা করেছে চিনির নৈবেদ্য। সে সব দিনে কল্লোলদলের পক্ষে প্রচারণের কোনো পত্রিকা-পুস্তিকা ছিল না, তদবির করে সভায় সভাপতিত্ব নিয়ে নিজের পেটোগ্রাফের বা নিজের পাবলিশিং হাউসের বিজ্ঞাপন দেবার হুঁসীতি তখনো আসেনি বাংলা-সাহিত্যে। সম্বল শুধু আত্মবল আর সত্যোন্মের স্বভাবিতাবলী। কল-কাতার সমস্ত দৈনিক সাপ্তাহিক তার আয়ত্তের মধ্যে, দকে-দিকে সে লিখে পাঠাল আধুনিকতার মঙ্গলাচরণ। দেখা গেল দায়ত্ববোধযুক্ত এমন সব পত্র-পত্রিকাও আছে যারা কল্লোলের দলকে অহুমোদন করে, অভিনন্দন জানায়। সেই বালির বাধ কবে নশ্রাং হয়ে গেল, কিন্তু চিনির স্বাদটুকু আজও গেল না।

চক্ষের পলকে চলে গেল সত্যোন্ম। বিখ্যাত সংবাদপরিবেশক প্রতিষ্ঠানে উঠে এসেছিল উচ্চ পদে। কিন্তু সমস্ত উচ্চের চেয়েও যে উচ্চ, একদা তারই ডাক এসে পৌঁছল। অপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললে, ‘খেতে দাও, খিদে পেয়েছে।’

বলে পোশাক ছাড়তে গেল সে শোবার ঘরে। স্ত্রী স্বস্তিত্ব হাতে খাবার তৈরি করতে লাগল। খাবার তৈরি করে স্ত্রী ক্ষুদ্র পায়ে চলে এল রান্নাঘর থেকে। শোবার ঘরে ঢুকে দেখে সত্যোন্ম পুরোপুরি পোশাক তখনো ছাড়েনি। গায়ের কোটটা শুধু খুলেছে, আর গলার টাইটা আধ-খোলা। এত শ্রান্ত হয়েছে যে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়।

‘ও কি, শুয়ে পড়লে কেন ? তোমার খাবার তৈরি । ওঠো ।’

কে কাকে ডাকে ! বেশভ্যাগ করবার আগেই বাসভ্যাগ করেছে সত্যেন ।

আবার নতুন করে আঘাত বাজে যখন ভাবি সেই সৌম্য্য সৌম্য হাস্তদীপ্ত মুখ আর দেখব না । কিন্তু কাকেই বা বলে দেখা কাকেই বা বলে দেখতে না পাওয়া ! মাটি থেকে পুতুল তৈরি হয় আবার তা ভাঙলে মাটি হয়ে যায় । তেমনি যেখান থেকে লব আসছে আবার সেখানেই সব লীন হচ্ছে । লীন হচ্ছে সব দেখা আর না-দেখা, পাওয়া আর না-পাওয়া ।

সত্যেনের মস্তই আরেকটি প্রিয়দর্শন ছিলে—বয়সে অবশিষ্ট কম ও কায়স্থও কিঞ্চিৎ কৃশভর—একদিন চলে এল “কল্লোলের” কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দোকানে । তার আগে তার একটি কবিতা বেরিয়েছিল হয়তো “কল্লোলে”—“নিকব কালো আকাশ তেলে,” হয়তো বা সেই পরিচয়ে । এল বটে কিন্তু কেমন যেন একা-একা বোধ করতে লাগল । তার সঙ্গী তার বন্ধুকে যেন কোথায় সে ছেড়ে এসেছে, তাই স্বপ্ন-স্বপ্ন হতে পারছে না । চোখে ভর বটে, কিন্তু তারো চেয়ে বেশি, সে-ভয়ে বিশ্ব মেশানো । আর যেটি বিশ্ব সেটি সর্বকালের কবিতার বিশ্ব । যেটি বা রহস্য সেটি সর্বকালের রুচির-রম্যতার রহস্য ।

সত্যেনের সঙ্গে অজিতকুমার দত্তের নাম করছি, তারা একসময় একই বাসার বাসিন্দে ছিল । আর অজিতের নাম করতে গিয়ে বুদ্ধদেবের নাম আনছি । এই কারণে, তারা একে-অন্যের পরিপূরক ছিল, আর তাদের লেখা একই সঙ্গে একই সংখ্যায় বেরিয়েছিল “কল্লোলে” ।

বুদ্ধদেবকে দেখি প্রথম কল্লোল আফিসে । ছোটখাটো মাহুটি খুব সিগারেট খায় আর মুক্ত মনে হাসে । হাসে সংসারের বাইরে দাঁড়িয়ে, কোনো বিধি-বাধা নেই । তাই এক নিশ্বাসেই মিশে যেতে পারল “কল্লোলের” সঙ্গে—এক কালস্রোতে ! চোখে মুখে তার যে একটি সলজ্জতার ভাব সেটি তার অন্তরের পবিত্রতার ছায়া, অকপট স্ফটিকসচ্ছতা । বড় ভাল লাগল বুদ্ধদেবকে । তার অনতিবর্ধ শরীরে কোথায় যেন একটা বজ্রকঠোর দাঁড়্য লেখা রয়েছে, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, অগ্রমের অধ্যবসায় । যখন তনুলাম ভবানীপুরেই উঠেছে, একসঙ্গে এক বাস-এ ফিরব, তখনই মনে মনে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম ।

বললাম, “বল লেখা আছে আপনার কাছে ?”

এর আগে বজ্রিশের ফাস্তনের “কল্লোলে” সুকুমার রায়ের উপরে সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে । বাংলাদেশে সেটাই হয়তো প্রথম প্রবন্ধ যেটাতে সুকুমার

স্বাক্ষরকে সত্যিকার মূল্য দেবার সংচেষ্টা হয়েছে। ‘আবোলতাবোলের’ মধ্যে শ্রবণে যে কতটা গভীর ও দূরগত তারই মৌলিক বিশ্লেষণে সমস্তটা প্রবন্ধ উজ্জল। প্রবন্ধের গন্ত্য যার এত সাবলীল তার গল্পও নিশ্চয়ই বিস্ময়কর।

‘আছে !’ একটু যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

‘দিন না কল্লোলে।’

তবুও যেন প্রথমটা বিস্ফারিত হল না বুদ্ধদেব। বাংলাসাহিত্যে তখন একটা কথা নতুন চালু হতে শুরু করেছে। সেই কথাটারই সে উল্লেখ করলে : ‘গল্পটা হয়তো মর্বিড।’

‘হোক গে মর্বিড। কোনটা রুগ্ন কোনটা স্বাস্থ্যসূচক কোন বিশায়ন তা নির্ণয় করবে। আপনি দিন। নীতিধ্বজদের কথা ভাববেন না।’

উৎসাহের আভা এল বুদ্ধদেবের মুখে।

বললাম, ‘নাম কি গল্পের?’

‘নামটি সুন্দর।’

‘কি?’

‘রজনী হল উত্তলা।’

ষোলো

‘মনে হ’ল প্রকৃতি চলতে-চলতে যেন হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেছে—যেন উৎসুক আগ্রহে কার প্রতীক্ষা করছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উঠবার আগ-মুহূর্তে দর্শকরা কেমন হঠাৎ স্থির, নিঃশব্দ হয়ে যায়, সমস্ত প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃশব্দ হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিঝিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপচে না, রাতে যে সমস্ত অজুত, অকারণ শব্দ দৈনন্দিক থেকে আসতে থাকে, তা যেন কার ইচ্ছিতে মৌন হয়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—এমন কি বাতাসও যেন আর চলতে না পেয়ে ক্রান্ত পশুর মত নিষ্পন্দ হয়ে গেছে—অমন সুন্দর, অমন মধুর, অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শাস্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজানতে অশ্রুট কণ্ঠে বলে উঠলুম—কেউ আসবে বৃষ্টি?’

অমনি আমার ঘরের পর্দা সরে গেল। আমার শিরের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল তা যেন একটু নড়ে চড়ে সহসা নিবে গেল—আমি যেন

কিছু দেখছি না, শুনছি না, ভাবছি না—এক তীব্র মাদকতার চেউ এসে আমাকে
ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর...

তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে জিনিস এসে
পড়ল—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মত
কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মত দুটি চোঁটে, চিবুকটি কি কমনীয় হয়ে
নেমে এসেছে, চাক্কণ্ঠটি কি মনোরম, অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল
দুটি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সেই স্বথ—তা তুমি বুঝবে না
নীলিমা!

তারপর ধীরে ধীরে হৃৎখানি বাহুলতার মত আমাকে বেঁটন করে ধরে যেন
নিজেকে পিষে চূর্ণ করে ফেলতে লাগল—আমার সারা দেহ থেকে-থেকে কঁপে
উঠতে লাগল—মনে হল আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে রক্তের শ্রোত
বুঝি এখনি ছুটে থাকবে!

আমার মনের মধ্যে তখনো কোঁতুল প্রবল হয়ে উঠল—এ কে? কোনটি?
এ, ও, না, সে,? তখন সব নামগুলো জপমালার মত মনে-মনে আউড়ে
গেছলুম, কিন্তু আজ একটিও নাম মনে নেই। অইচ টিপবার জন্তে হাত বাড়াতেই
আরেকটি হাতের নিষেধ তার উপর এসে পড়ল।

তোমার মুখ কি দেখাবে না?

চাপা গলার উত্তর এল—তার দরকার নেই।

কিন্তু ইচ্ছে করছে যে!

তোমার ইচ্ছে মেটাবার জন্তেই তো আমার হৃষ্ট! কিন্তু ঐটি বাদে।

কেন? লজ্জা?

লজ্জা কিসের? আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে
দিয়েছি।

পরিচয় দিতে চাও না?

না। অপরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক।

আমার বিছানায় তো চাঁদের আলো এসে পড়েছিল—

আমি জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।

ও! কিন্তু আবার তা খুলে দেওয়া যায়!

তার আগে আমি ছুটে পালাব।

যদি ধরে রাখি?

পারবে না।

জোর ?

জোর খাটবে না।

একটু হাসির আওয়াজ এল। শীর্ণ নদীর জায়গেন একটুখানি কুলের মাটি ছুঁয়ে গেল।

তুমি যেটুকু পেয়েছ, তা নিয়ে কি তুমি তৃপ্ত নও ?

বা চেয়ে নিইনি, অর্জন করিনি, দৈবাৎ আশাতীতরূপে পেয়ে গেছি, তা নিয়ে তো তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথা ওঠে না।

তবু ?

তোমার মুখ দেখতে পাওয়ার আশা কি একেবারেই বৃথা ?

নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্মেই ?

না, তা হবে কেন ? তা যে অকুরন্ত স্থার আধার।

তবে ?

আমি হার মানলুম।...

নলিমা বললে, এইখানেই কি তোমার গল্প শেষ হল ?

মাল্টারের কাছে ছাত্রের পড়া-বলার মত করে জবাব দিলুম—না, এইখানে থক হল ! কিন্তু এর শেষেও কিছু নেই—এই শেষ করতে পারো।...

পরের দিন সকালে আমার কি লাঞ্ছনাটাই না হল ! রোজকার মত ওরা সব চারদিক থেকে আমার ঘিরে বসল—রোজকার মত ওদের কথার স্রোত বইতে লাগল জলন্তরঙ্গের মত মিষ্টি সুরে, ওদের হাসির রোল ঘরের শান্ত হাওয়াকে আকুল করে ছুটতে লাগল, হাত নাড়বার সময় ওদের বালা-চুড়ির মিঠে আওয়াজ রোজকার মতই বেজে উঠল—সবাকার মুখই ফুলের মত রূপময়, মধুর মত লোভনীয় ! কিন্তু আমার কণ্ঠ মৌন, হাসির উৎস অবরুদ্ধ ! গত রাত্রির চিহ্ন আমার মুখে আমার চোখের কোণে লেগে রয়েছে মনে করে আমি চোখ তুলে কারো পানে ভাকাতে পারছিলাম না। তবু লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রত্যেকের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলুম—যদি বা ধরা যায় ! যখন যাকে দেখি, তখনই মনে হয় এই বুঝি সেই ! যখনি যার গলার স্রব শুনি, তখনই মনে হয়, কাল রাত্রিতে এই কণ্ঠই না ফিসফিস করে আমার কত কি বলছিল ! অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলুম না, বা দেখে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় ! সবাই হাসচে, গল্প করচে। কে ? কে তা হলে ?...

ভেবেছিলুম সমস্ত রাত জেগে থাকতে হবে। মনের সে অবস্থায় সচরাচর ঘুম আসে না। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনার ফলেই হোক বা পায়ে হেঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর দরুন শারীরিক ক্লান্তিবশতই হোক, সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমে আমার সারা দেহ ভেঙে গেল—একেবারে নবজাত শিশুর মতই ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমান, নিরুপস্থ অবস্থা দেখতে গেলুম—আবার আমার ঘরের পর্দা সরে গেল—বাতাস সোঁরতে মুচ্ছিত হয়ে পড়ল—জ্যোছনা নিবে গেল—আবার দেহের অণুতে-অণুতে সেই স্পর্শস্থলের উদ্ভাবনা—সেই মধুময় আবেশ—সেই ঠোঁটের উপর ঠোট কইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙে দেওয়া—তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ—সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন—তারপর ভোরবেলার শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টিবিনিময়—”

এই ‘রজনী-হল উভলা’! হালের মাপকাঠিতে হয়তো ফিকে, পানসে। কিন্তু এরই জন্তে সেদিন চারদিকে তুমুল হাহাকার পড়ে গেল,—গেল, গেল, সব গেল—সমাজ গেল, সাহিত্য গেল, ধর্ম গেল, স্ত্রীশ্রীতি গেল! জর্নেকা সম্ভ্রান্ত মহিলা পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপলেন—স্ত্রীলতার সীমা মানলেন না, দাওয়াই বাতলালেন লেখককে। লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়িতে থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট। তৃতীয় বিকল্পটা কিন্তু ভাবলেন না। অর্থাৎ লেখক যদি বিবাহিত হয় আর স্ত্রী যদি সন্নিহিতা হয়েও বিমুখা থাকে তা হলে কর্তব্য কি? সেই কর্তব্য নির্দেশ করলেন আরেকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—প্রায় সম্ভ্রান্ত্রীশ্রীণী। তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, আতুড-ঘরেই এ সব লেখকদের ছুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল। নির্মলীকরণ নয়, এ একেবারে নিমূলীকরণ।

আগুনে ইস্কন জোগাল আমার একটা কবিতা—‘গাব আজ আনন্দের গান’ ‘রজনী হল উভলা’র পরের মাসেই ছাপা হল ‘কল্লোলে’;

মুময় দেহের পায়ে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ

গান আজ আনন্দের গান।

বিশ্বের অমৃতরস যে আনন্দে করিয়া মগ্ন

গড়িয়াছে নারী তার স্পর্শোদ্দেশ তপ্ত পূর্ণ স্তন;

লাবণ্যাললিততনু বোঁবনপুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে

রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে

সংসার-শিরে—

যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধনন্দিত স্নিগ্ধ চুষনতৃষ্ণার
বক্ষিম গ্রীবার ভঞ্জে, অপাঞ্জে, জজ্বায়,
লীলায়িত কটিতটে, ললাটে ও বটু ভ্রুকুটিতে

চম্পা-অঙ্গুলিতে—

পুরুষপীড়নতলে যে আনন্দে কস্ত্র মূহমান

গাব সেই আনন্দের গান ।

যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্যধ্বনি

যে আনন্দে হয় সে জননী ॥

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর দন্তদণ্ড নির্ভীক বর্বর
ব্যাকুল বাহুর বক্ষে কুন্দকান্তি সুন্দরীয়ে করিছে জর্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়

যে আনন্দ সন্তোগম্প্রহার—

যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান

গাব সেই আনন্দের গান ॥

পরের মাসে বেরোল যুবনাশ্বর ‘পটলভাঙার পাঁচালি’, যার কুশীলব হচ্ছে
কুঠে বুড়ি, নফর, ফকরে, সদি, গুবরে, হুলো আর খেদি শিসি ; স্থান পটলভাঙার
ভিথিরী পাড়া, প্যাচপেচে পাঁকের মধ্যে হোগলার কুড়েঘর । আর কথাবার্তা,
যেমনটি হতে হয়, একান্ত অশাস্ত্রীয় । তারপরে, তত দিনে, তেরোশ তেত্রিশ
সালের বৈশাখে, “কালি-কলম” বেরিয়ে গেছে—তাতে ‘মাধবী প্রলাপ’ লিখেছে
নজরুল :

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি

ভয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি ।

তার নিধুবন—উন্নন

ঠোটে কাঁপে চুষন

বুকে পীন যৌবন

উঠিছে ফুঁড়ি,

মুখে কাম কণ্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি ।

করে বসন্ত বনভূমি স্তব্ধ কেলি
 পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি
 ফুরে আলু-খালু কামিনী
 জেগে সারা যামিনী,
 মল্লিকা ভামিনী
 অভিমানে ভায়,
 কলি না-ছুঁতেই কেটে পড়ে কাঁঠালি চাপার ।

আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা
 হ'ল অশোক শিমূলে বন পুষ্পরজা ।
 তার পাংগু চীনাংগু
 হল রাঙা কিংগু
 উৎসুখ উন্মুখ
 ঘোবন তার
 নাচে লুষ্ঠন-নির্মম দম্ভ্য তাতার ।

দূরে শাদা মেঘ ভেসে যায়—খেত সারসী
 ওকি পত্নীদেয় তরী, অপ্সরী-আরসী ?
 ওকে পাইয়া পীড়ন-জালা
 তপ্ত উরসে বালা
 খেতচন্দন লাল
 করিছে লেপন ?

ওকি পবন খসায় কার নীবি বন্ধন ?

এতভেঙে আন্তি নেই। কয়েক মাস যেতে না যেতেই “কালি-কলমে”
 নজরুল আরেকটা কবিতা লিখলে—‘অনামিকা’। নামের সীমানায় নেই অথচ
 কামের মহিমায় বিরাজ করছে যে বিশ্বরমা তারই স্তবগান :

“বা কিছু স্থলর হেরি করেছি চূষন
 বা কিছু চূষন দিয়া করেছি স্থলর—

সে সবার মাঝে যেন তব হ্রস্ব
 অহুভব করিয়াছি। ছুঁয়েছি অধর
 তিলোত্তমা, তিলে-তিলে ! তোমাতে যে করেছি চুম্বন
 প্রতি তরুণীর ঠোঁটে। প্রকাশ-গোপন।...
 তরু, লতা, পশু-পাখী, সকলের কামনার সাথে
 আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্বকামনাতে !
 বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি,
 সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি !
 যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
 সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
 আমি কাম তুমি হলে রতি
 তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি !...
 বায়ে-বায়ে পাইলাম—বায়ে-বায়ে মন যেন কহে—
 নহে এ সে নহে !
 কুহেলিকা ! কোথা তুমি ? দেখা পাব কবে ?
 জন্মেছিলে, জন্মিয়াছ, কিম্বা জন্ম লবে ?”

চূড়া স্পর্শ করল বৃন্দাবনের কবিতা, ‘বন্দীর বন্দনা’—কাল্কনের “কল্লোলে”
 প্রকাশিত :

“বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত ঘোবন
 দুর্দম বেদনা তার ফুটনের আগ্রহে অধর।
 রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ-উপবাসী শূদ্রারের হিয়া
 রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি।
 তাদের মিটাতে হয় আত্মবঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
 আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,
 হিংস্র প্রেমপাজে হোন হিংসাদর্প গুপ্ত আছে ;
 আনন্দ-নন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন
 জিহ্বাংসার কুটিল কুশ্রিতা।...
 জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতির্হীন বন্দীশালা হতে
 বন্দনা-সংগীত গাহি তব।

স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়
 লাহিত বাসনা দিয়া অর্থ্য ভব রচি আমি আজি
 শাস্ত্র সংগ্রামে মোর বিক্ষুব্ধ বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা
 হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার সহ মহা আজি ।

বিধাতা, জানোনা তুমি কী অপার পিপাসা আমার
 অমৃতের তরে ।

না হয় ভুবিয়া আছি কৃষি-বন পক্ষের সাগরে,
 গোপন অন্তর মম নিরন্তর স্তম্ভার তৃষ্ণায়
 শুষ্ক হয়ে আছে তবু ।

না হয় রেখেছ বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
 উধাও আগ্রহভরে উদ্বলিত উঠিবারে চায়
 অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে ।...

তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমা-বাজ্রি সম
 তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুখা মম ।...

তুমি যারে সজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি
 সে তোমার দুঃস্বপ্ন দাক্ষণ ;

বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
 আমারে রচেছি আমি ; তুমি কোথা ছিলে অচেতন
 সে মহা-স্বপ্নকালে—তুমি শুধু জান সেই কথা ।

এত সব ভীষণ দুষ্কাণ্ড এর প্রতিকার কি ? সাহিত্য কি ছায়েথারে যাবে,
 সমাজ কি যাবে রসাতলে ? দেশের ক্ষাত্রশক্তি কি তিতিকার ব্রত নিয়েছে ?
 কখনো না । সুপ্ত দেশকে জাগাতে হবে, ডাকতে হবে প্রতিঘাতের নিমন্ত্রণে ।
 সবাসরি মার দেওয়ার প্রথা তখনো প্রচলিত হয়নি—আর, দেখতেই পাচ্ছ, কলম
 এদের এত নিবীৰ্য নয় যে মারের ভয়ে নির্বাক হয়ে যাবে । তবে উপায় ?
 গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাই এস । সে-পথ তো অনাতি কাল থেকেই প্রশস্ত,
 তার জন্তে ব্যস্ত কি । একটু কূটনীতি অবলম্বন করা যাক । কি বলো ? মুখে
 মোটা করে মুখোশ টানা থাক—পুলিশ-কনস্টেবলের মুখোশ । ভাবখানা এমন
 করা যাক যেন সমাজস্বাস্থ্যরক্ষার ভার নিয়েছি । এমনিতে খেউ-খেউ করলে

লোকে বিরক্ত হবে, কিন্তু যদি বলা যায়, পাহারা দিচ্ছি, চোর তাকাজি, তা হলেই মাথায় করবে দেখো। ধর্মধ্বজের তান করতে পারলেই কর্ম কতে। কর্মটা কী জানতে চাও? নিশ্চয়ই এই আত্ম-আরোপিত দায়বহন নয়। কর্মটা হচ্ছে, যে করেই হোক, পাদপ্রদীপের সামনে আসা। আর এই পাদপ্রদীপ থেকেই শিরঃসূর্যের দিকে অভিযান।

আসলে, আমিও একজন অতি-আধুনিক, শৃঙ্খলমুক্ত নবযৌবনের পূজারি। আমার হচ্ছে কংসরূপে কৃষ্ণপূজা, রাবণ হয়ে রামারাদনা। নিন্দিত করে বন্দিত করছি ওদের। ওরা সৃষ্টিযোগে, আমি রিষ্টিযোগে। ওদের মন্ত্র, আমার তন্ত্র। আমাদের পথ আলাদা কিন্তু গন্তব্যস্থল এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মন্ত্র ঢোকে সদর দরজা দিয়ে আর তন্ত্র ঢোকে পায়খানার ভেতর দিয়ে। আমার পৌছুনো নিয়ে কথা, পথ নিয়ে নয়।

সুতরাং গুরুবন্দনা করে শুরু করা যাক। গুরু যদি কোল দেন তো ভালো, নইলে তাঁকেও বোল খাইয়ে ছাড়ব। বোল খাইয়ে কোল আদায় করে নেব ঠিক।

তেরোশ তেত্রিশ সালের ফাল্গুনে “শনিবারের চিঠি”র সজ্ঞনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করলেন। যেন তিনি কত বড় অধিকারী, সমাজের পক্ষ থেকে কত বড় ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে—এই মামলায় এইটুকুই আসল রসিকতা।

শ্রীচরণকমলেশু

“প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত ‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলম’ নামক দু’টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অতীত পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানেনা। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনভাব সমাজভাব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যারা লেখেন

তাঁরা Continental Literature-এর ঘোঁরাই পাড়েন। যারা এগুলি পড়ে
 বাহবা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাকীশদের সাহিত্য বলে
 দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা জী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক
 সম্পর্কে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন
 ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কারশ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করবার একটা চেষ্টা
 দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী।
 Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার
 চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত
 বুদ্ধদেব বহুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাথ' লিখিত কয়েকটি
 গল্প, এই মাসের (কাল্জন) "কল্লোলে" প্রকাশিত বুদ্ধদেব বহুর কবিতাটির
 (অর্থাৎ 'বন্দীর বন্দনা'), 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও
 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অগ্রান্ত কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে
 পারে। আপনি এ সব লেখার-দু-একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি
 বিজ্ঞপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে
 লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ
 লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল শ্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে,
 কোনো প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন
 আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে
 আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে
 আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর
 কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা
 ব্যাঙ্গভাষা না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে
 সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই
 এই ধরনের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা।
 সেইজন্তে আপনার মতামতের জন্তে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে
 বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা
 প্রয়োজন।... ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষ্যা বলে
 হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর মাই বলুক, ঈর্ষ্যার অপবাদ কেউ দেবে
 না। আমার প্রণাম জানবেন। প্রণত শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস।"

রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি। লিখলেন :

“কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাকসংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আঁক ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে স্বীকৃতি বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এখানে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হ’লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদ্ভ্রান্ত, পাণগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব—তাই এখন বাগবাত্যার ধুলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার বা বলবার বলব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শুভাকাজ্ঞী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

একদিন রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ আর ‘ঘরে বাইরে’ নিয়েও এমনি রোষপ্রকাশ হয়েছিল, উঠেছিল হরিত-হুনীতির অভিযোগ। “পারিবারিক সম্পর্ক”কে অসম্মান করার আর্তনাদ! সে যুগের সজ্ঞানীকান্ত ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। কিন্তু এ যুগের সজ্ঞানীকান্ত ‘নষ্টনীড়’ আর ‘ঘরে বাইরে’ সম্বন্ধে দিব্যি সার্টিফিকেট দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। ঐ চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : “ঠিক ষতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে সব জিনিস নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিসই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ‘একরাজি’ ‘নষ্টনীড়’ ও ‘ঘরে বাইরে’ এরা লিখলে কি ষত—ভাবতে সাহস হয়না।” যুগে যুগে সজ্ঞানীকান্তদের এই একই রকম প্রতিক্রিয়া, একই রকম কাণ্ডজ্ঞান। আসন্ন যুগের সজ্ঞানীকান্তরা এরি মধ্যে হয়তো চিঠি লিখছেন বুদ্ধদেবকে আর নজরুল ইসলামকে—“ঠিক ষতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন ততটুকুর বেশি আপনারা কখনো যাননি। অথচ যে সব জিনিস নিয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিসই আধুনিক লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত ভাবলে

শিউরে উঠতে হয়। ‘বন্দীর বন্দনা’ ‘মাধবী প্রাণ’ ও ‘অনারিকা’ এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয় না।”

সেই এক ভাষা। একই “প্রচলিত রীতি”।

সত্তেরো

সাহিত্য তো হচ্ছে কিন্তু জীবিকার কি হবে। আর্ট হয়তো প্রেমের চেয়েও বড়, কিন্তু সবার চেয়ে বড় হচ্ছে ক্ষুধা। এই সাহিত্যে কি উদ্যোগের সংস্থান হবে ?

“আমি আর্টকে প্রিয়্যার চেয়েও ভালবাসি—এই কথাটি আজ কদিন ধরে আমার মনে আঘাত দিচ্ছে।” আমাকে লেখা প্রেমেনের আরেকটা চিঠি ; “মনে হচ্ছে আমি সুবিধার খাতিরে প্রিয়্যাকে ছোট করতে পারি, কিন্তু আর্ট নিয়ে খেলা করতে পারি না। আমার প্রিয়্যার চেয়েও আর্ট বড়। আমি বাকে তাকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু আর্টকে শুধু নামের বা অর্থের প্রলোভনে হীন করতে পারি না—অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে। সেই আদিম যুগে উলঙ্গ অসভ্য মানুষ সৃষ্টি করবার যে প্রবল অন্ধ প্রেরণার নারীকে লাভ করবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে সেই প্রেরণাই আজ রূপান্তরিত হয়ে আর্টিস্টের মনকে দোলা দিচ্ছে। এই দোলার ভেতর আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রহতারার দুর্বার অগ্নিনৃত্যবেগ, সূর্যের বিপুল বহিঃজ্বালা, বিধাতার অনাদি অনন্ত কামনা—সৃষ্টি, সৃষ্টি—আজ আর্টিস্টের সৃষ্টি শুধু নারীর ভেতর দিয়ে সৃষ্টির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বলেই প্রিয়্যার চেয়ে আর্ট বড়। সৃষ্টির ক্ষুধা সমস্ত নিখিলের অণু-পরমাণুতে, প্রতি প্রাণীর কোষে-কোষে। সেই সৃষ্টির লীলা মানুষ অনেক রকমে করে এসে আজ এক নতুন অপকূপ পথ পেয়েছে। এ পথ শুধু মানুষের—বিধাতার মনের কথাটি বোধহয় মানুষ এই পথ দিয়ে সব চেয়ে ভালো করে বলতে পারবে ; স্বপ্ননকামনার চরম ও পরম পরিতৃপ্তি সে এই পথেই আশা করে ! অন্তত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই আর্ট সেই আদিম অনাদি সৃষ্টি-ক্ষুধার রূপান্তরিত বিকাশ।

অতক্ণ এত কথা বলে হয়ত কথাটাকে জটিল করে ফেললাম, হয়ত কথাটার একদিক বেশি স্পষ্ট করতে গিয়ে আর একদিক সযত্নে ভুল ধারণা করবার সুযোগ দিলাম।...

নারীর মধ্যে প্রিয়্যাকে চাই প্রিয়্যার মধ্যে প্রেমকে চাই। যার কাছে

ভালবাসার প্রতিদান পাব তারি মাঝে এ পৰ্বন্ত যত নারীকে ভালবেসেছি ও পেয়েছি ও হারিয়েছি বা ভালবেসেছি ও পাইনি সকলে নতুন করে বাঁচবে—এই আমার মত। জানি এ মত অনেকের কাছে বিতৃষ্ণায় লাগবে, এ-মত অনেকের কাছে হৃদয়হীনতার পরিচায়কও লাগবে হয়ত! কিন্তু হৃদয়হীন হতে রাজী নই বলেই এই আশাত-হৃদয়হীন মত আমি নিজে পোষণ করি! প্রেম খুঁজতে গিয়ে শ্রিয়ার নারীত্ব আমাকে আঘাত দিয়েছে বলে আমি নারীর মধ্যে প্রেম পাবার আশা ত্যাগ করব না। নিজের কথাই বলছি তোর কথা বলতে গিয়ে।

আমার এখন দৃঢ় ধারণা হয়েছে ছেলেবেলা থেকে একটা রূপকথা শুনে আসছি—সে রূপকথা যেমন অসত্য তেমনি সুন্দর। রূপকথাটাকে আমরা কিন্তু তাই রূপকথা ভাবি না, ভাবি সেটা সত্য। মানুষের প্রেম সত্যি করে একবার সত্য জাগে এই কথাটাই রূপকথা। প্রেম অমর এটা সত্য হতে পারে কিন্তু অমর প্রেম লাভ করবার আগে প্রেমের অনেক আশ্বাস ও আভাস আসে যাকে আমরা তাই বলে ভুল করি।

এক গরীব চাষা অনেক তপস্বী করে এক দেশের এক রাজকন্যাকে পাবার বর পেয়েছিল। কিন্তু রাজকন্যা আসবার সময় প্রথম যে দাসী এল খবর দিতে, সে তাকেই ধরে রেখে দিলে। সে যখন জানলে সে রাজকন্যা নয়, তখন সে ভগবানকে ডেকে বলল, ‘তোমার বর ফিরিয়ে নাও, আমার দানীই ভাল।’ তারপর যখন সত্যিকারের রাজকন্যা এল তখন কী অবস্থাটা হল বুঝতেই পারিস।

আমাদের রাজকন্যাকে. দুঃখের বিষয়, সনাক্ত করবার কোনো উপায় নেই। কোনদিন সে আসবে কিনা তাই জানিনা, আর এসেও কখন অসাবধানতায় ফসকে যায় এই ভয়ে আমরা সারা। তাই আমরা প্রথম অগ্রদূতীকেই ধরে বলি অনেক সময়, “বর ফিরিয়ে নাও ভগবান!” ভগবানকে আমরা যতটা সজাগ ও সদয় মনে করি, তিনি বোধহয় ততটা নন, কারণ তিনি মাঝে-মাঝে বলেন “তথাস্তু”। আর আমাদের সত্যিকারের রাজকন্যা হয়ত একদিন আসে, যদিও মাঝে-মাঝে অগ্রদূতীর ছদ্মবেশ খুলে আসল রাজকন্যা বেরিয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে কিন্তু তিনি বর ফিরিয়ে নেন না, এবং অনেক সময় সদয় হয়েই। তোর জীবনে ভগবান এবার “তথাস্তু” বলেন না কেন কে জানে। যে প্রেমের নীড় মানুষ অটুট করে রচনা করে তার মাঝে থাকে সমস্ত অগ্রদূতীর প্রেমের ছায়া।”

“কল্লোসের” এমন অবস্থা নয় যে লেখকদের পরশা দিতে পারে। শুধু শৈলজা আর নুপেনকেই পাঁচ-দশ টাকা করে দেওয়া হত, ওদের অনটনটা কষ্টকর ছিল বলে। আর সবাই লবডকা। আমরা শুধু মাটি পাট করছি। হাঁড়ি গড়তে হবে, চিল-বালি সব বের করে দিচ্ছি। সাধু গাঁজা তৈরি করছে, তার সাজতে-সাজতেই আনন্দ। আমাদেরও প্রায় তেমনি। লেখবার বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছি। এতেই আমাদের ক্ষুতি। ঢালছি আর সাজছি, দম যখন জমবে তখন দেখা যাবে। চকমকির পাথর যদি কাক থাকে তবে যা মারলেই আগুন বেরবেই বেরবে।

তবু একেক দিন দীনেশদা হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়তেন। শূন্য বুক-পকেটে একটি টাকা টুপ করে কখন খসে পড়ত। এ টাকাটা দানও নয়, উপার্জনও নয়, শুধু স্বপ্নে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি অভাবিত স্নেহস্পর্শের মত—এমনি অমূল্যব করতাম। নিশ্চিন্ত হতাম, আরো দিন চারেক আড্ডা চালাবার জন্তে ট্র্যাম চলবে।

কিন্তু প্রেমেন শৈলজার অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত। তাই তারা ঠিক করলে আলাদা একটা কাগজ বের করবে। সেই কাগজে ব্যবস্থা করবে অশনাচ্ছাদনের। সঙ্গে স্মরণ মুরলীধর বহু। তত্ত্বধারক বরদা এজেন্সির শিশির নিয়োগী।

বেকল “কালি-কলম”—তেরশ তেত্রিশের বৈশাখে। ছোটো বিশেষত্ব প্রথমেই চোখে পড়ল। এক, সাধাসিধে ঝকঝকে নাম : ছই, একই কাগজের তিনজন সম্পাদক—শৈলজা প্রেমেন আর মুরলীদা। আর প্রথম সংখ্যায় সব চোখে উজ্জ্বলযোগ্য রচনা মোহিতলালের ‘নাগাজুর্ন’।

“ত্বরিতে উঠিয়া গেহু মন্তবলে স্বরণের আলোক-তোরণে,

—প্রবেশিহু অকম্পিত নিঃশব্দ চরণে।

অমর মিথুন যত ঘূরছিল মহাভয়ে—স্নেহ হল প্রিয়া-আলিঙ্গন।

কহিলাম, “ওগো দেব, ওগো দেবীগণ,

আমি সিদ্ধ নাগাজুর্ন, জীবনের বীণায়জে সকল মূর্ছনা

হানিয়াছি, এবে তাই আসিয়াছি করিতে অর্চনা

তোমাদের রতিরাগ ; দাও মোরে দাও ত্বর করি

কামতুষা স্বরতির দুঃখধারী এই মোর করপাত্র ভরি।”

—মানব-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান
 অমৃত পায়স তার মনে হল ক্ষার-কটু প্রলেহ সমান ।
 জগৎ ঈশ্বরে ডাকি কহিলাম, “ওগো ভগবান !
 কি করিব হেথা আমি ? তুমি থাক তোমার ভবনে,
 আমি যাই ; যদি কভু বসিতাম তব সিংহাসনে,
 সকল ঐশ্বর্য মোর লীলাইয়া নিতাম খেলায়ে—
 বাঁকায় বিছাৎ-ধহু, নভো-নাভি-পূর্বমুখে হেলায়ে হেলায়ে
 গড়িতাম ইচ্ছানুখে নব-নব লোক লোকান্তর ।
 তবু আমি চাহি না সে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির একেশ্বর ।
 মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী-সূর্য তোমার কন্দুক ?
 আমারও খেলনা আছে—প্রেরণীর সূচাক চূচক !
 স্তোত্র-স্তুতি ভাগ্য তব, তবু কহ শুধাই তোমারে—
 কভু কি বেসেছ ভালো মুদিতাক্ষী যশোধারা,
 মদিরাক্ষী বসন্তসেনারে ?”

এই কবিতায় অবশ্য কোনোই দোষ পায়নি “শনিবারের চিঠি” কারণ
 মোহিতলাল যে নিজেই ঐ দলের মণ্ডল ছিলেন । শুনেছি কৃত্তিবাস ওঝা নাকি
 ওঁরই ছদ্মনাম ! “শনিবারের চিঠিতে” “মরসগতী” নাম দিয়ে সরস্বতী-বন্দনাটি
 বিচিত্র ।

সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটার ধরেছে গুণ—
 মা’র অঁঠরেও কাম-বাতনায় জলিছে ভ্রূণ !
 শুকদেব যথা করেছিল বেদ-অধ্যয়ন—
 গর্ভে বসেই শেষ করে তার বাৎস্তায়ন !

বুলি না ফুটিতে চুরি ক’রে চায়—মোহন ঠাম !
 ভাষা না শিথিতে লেখে কামায়ন—কামের সাম ।
 জ্ঞান হলে পরে মারেরে দেখে যে বারাজনা !
 তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপণা !

এদেরি পূজায় ধরা দিয়েছ যে সরস্বতী,
 চিনি নে তোমায়, কোন বলে তুমি আছিলে, সতী ?

দেখি ছুঁই তধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুঠও বুঝি ওঠে-গালে।”

“কালি-কলম” বেরবার পর বাইরে থেকে দেখতে গেলে, “কল্লোলের” লংহুতিতে যেন চিড় খেল। প্রথমটা লেগেছিল তাই প্রায় প্রিয়বিচ্ছেদের মত। একটু ভুল-বোঝার ভেলকিও যে না ছিল তা নয়। কেউ কেউ এমন মনে করেছিল যে “কল্লোলের” রীতিমত লাভ হচ্ছে, দীনেশনাথ ইচ্ছে করেই মুনকার ভাগ-বাঁটোয়ারা করছেন না। এ সন্দেহে যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তার কারণ “কালি-কলম” নিজেও ব্যবসার ক্ষেত্রে ফেল মারল। এক বছর পরেই প্রেমেন সটকান দিলে, দু’ বছর পরে শৈলজা। মূলদীনা আরো বছর তিনেক এক পায়ে দাঁড়িয়ে চালিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মূলদীনাও ক্ষীণভর হতে-হতে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে বরদা থাকলেও ভাগ্যে বরদাজী জোটে না সব সময়।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল, সত্যিকার সিরিয়স পত্রিকা চালিয়ে তা থেকে জীবিকানির্বাহ করা সাধ্যাতীত। বেশির ভাগ পাঠকের চোখ টাউসগুলোর দিকে, নয়তো খিস্তি খেউড়ের দিকে। “কল্লোল” তো শেষের দিকে সুর বেশ খাধে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল, জনরঞ্জন প্রলোভনে। কিন্তু তাতে ফল হয় না। অবশিষ্ট ভক্তরাও রুষ্ট হয় আর নিকলক ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। “কল্লোল” তাই “কল্লোলের” মতই মরেছে। ও যে পাতকো হয়ে বেঁচে থাকেনি ওটাই ওর কীর্তি।

টাকা থাকলেই বড়লোক হওয়া যায় বটে, কিন্তু বড় মানুষ হওয়া যায় না। বড় মানুষের বাড়ির একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সব ঘরেই আলো থাকে। “কল্লোল” সেই বড় মানুষের বাড়ি। তার সব ঘর আলো করা।

তবু সেদিন “কল্লোল” ভেঙে “কালি-কলমের” সৃষ্টিতে নূপেনের বিক্ষোভের বোধহয় অন্ত ছিল না। সে ধরল গিয়ে শৈলজাকে, সুখোমুখি প্রচণ্ড ঝগড়া করলে তার সঙ্গে। এমন কি তাকে বিশ্বাসহস্তা পর্যন্ত বললে। শৈলজা বিন্দুমাত্র চঞ্চল হল না। তার স্বাভাবিক সন্মিত গাভীর বজায় রেখে বললে ‘ব্যস্ত নেই, তোকেও আসতে হবে।’

বস্তুত কল্লোল-কালি-কলমের মনে কোনো দলাদলি বা বিরোধ-বিপর্যয় ছিল না। যে “কল্লোলে” লেখে সে “কালি-কলমে”ও লেখে আর যে “কালি-কলমের” লেখক সে “কল্লোলের”ও লেখক। যেমন জগদীশ গুপ্ত, নজরুল,

প্রবোধ, জীবনানন্দ, হেম বাগচি। গ্রেমেন ফের “কল্লোজে” গল্প লিখল, আমিও “কালি-কলমে” কবিতা লিখলাম। কোথাও ভেদ-বিচ্ছেদ রইল না, পাশাপাশি চলবার পথ মসৃণ হয়ে গেল। বরং বাড়ল আর একটা আড্ডার জায়গা। “কল্লোজ” আর “কালি-কলম” একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা!

কিন্তু নূপেন প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হয়নি। “কালি-কলমে” লেখা তো দেয়ইনি, বোধহয় কোনদিন যাবওনি তার আপিসে-আড্ডায়।

মনটা বুদ্ধদেবের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এবং তোরোশ তেত্রিশের এক চৈত্রেয় রাতে ঢাকা রওনা হলাম।

ক্ষিতীন সাহা বুদ্ধদেবের বন্ধু, কলকাতায় মেসে থেকে পড়ে, বাড়ি ঢাকায়। চঠাৎ তার কঠিন অস্থ্য হয়ে পড়ল, ঢাকায় বাপ-মার কাছে যাবার দরকার, পথে একজন সঙ্গী চাই। আমি বললাম, আমি যাব।

তার আগে পূজোর ছুটিতে বুদ্ধদেব চিঠি লিখেছিল: “আপনি ও নেপেন্দা এ ছুটিতে কিন্তু একবার ঢাকায় আসবেনই। আপনাদের দু’জনকে আমি প্রগতি সমিতির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি। যদিও পাথেয় পাঠাতে আমরা বর্তমান অবস্থায় অক্ষম, তবে এখানে এলে আতিথেয়তার ক্রটি হবে না। আপনার পকেট আন্তরোপ্য গর্ত হয়ে উঠুক।...এ নিমন্ত্রণ আমাদের স্বাকার,—আমার এশাস নয়। আমাদের সম্মিলিত সম্ভাবণ ও আমার ব্যক্তিগত অফরাণ জ্ঞাপন করি।”

ক্ষিতীনের তার বাড়িতে পৌছে দিয়ে সাতচল্লিশ নম্বর পুন্না পল্টনে এসে পৌছলাম। বুদ্ধদেবের বাড়ি। বুদ্ধদেব তো আকাশ থেকে পড়ল! না, কি, উঠে এল আকাশে! এ কী অবাক কাণ্ড!

আমাকে দেখে একজন বিস্মিত হবে আর তার বিস্ময়টুকু আমি উপভোগ করব এও একটা বিস্ময়!

‘আরে, কী ভয়ানক কথা, আপনি?’

‘হ্যাঁ, আর ঢাকা থাকে গেল না—চলে এলাম।’

খুশিতে উছলে উঠল বুদ্ধদেব। ‘উঠলেন কোথায়?’

‘আর কোথায়?’

‘দাঁড়ান, টুমুকে খবর পাঠাই, পরিমলকে ডাকি।’

সাধারণ একখানা টিনের ঘর, বেড়া দিয়ে ভাগ করা। প্রান্তের ঘরটা বুদ্ধদেবের। সেই ঘরেই অধিষ্ঠিত হলাম। পাশালো একটা তক্তাগোশ আর গাড়া-গাড়া কাঠের দু-একটা টেবিল-চেয়ার সমস্ত ঘরের সম্পদ, আর বই-ভরা

কাঠের একটা আলমারি। দক্ষিণে ফাঁকা মাঠ, উধাও-ধাওয়া অফুরন্ত হাওয়া। একদিকে যেমন উদ্দাম উন্মুক্তি, অন্যদিকে তেমনি কঠোরব্রত কড়ু। একদিকে যেমন খামখেয়ালের এলোমেলোমি, অন্যদিকে তেমনি আবার কর্মোদ্যাপনের সংকল্পস্বৈৰ্য। আড্ডা হল্লা, তেমনি আবার পরীক্ষার পড়া—তেমনি আবার সাহিত্যের শুষ্কবা। সমস্ত কিছু মিলে একটা বর্ধন-বিস্তারের উত্ততি।

প্রায় দিন-পনের ছিলাম সে-যাত্রায়। প্রচুর সিগারেট,—সামনের মুদ্রি-দোকানে এক সিগারেটের বাবদই এক বুদ্ধদেবের তখন বাট-সত্তর টাকা দেনা—আর অটেল চা—সব সময়েই বাড়িতে নয়, চায়ের দোকানে, যে কোনো সময়ে যে কোনো চায়ের দোকানে। আর সকালে-সন্ধ্যায় টহল, পায়ে হেঁটে কখনো বা ঢাকার নাম-করা পংখীরাজ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। সঙ্গে টুহু বা অজিত দত্ত, পরিমল রায় আর অমলেন্দু বহু। আর গল্প আর কবিতা, ছড়া আর উচ্চ হাসির তারতর। শুধু পরিমলের হাসিটাই একটু শ্লেষাশ্লিষ্ট। সেই সঙ্গে কথায়-কথায় তার ছড়ার চমক স্মৃতিতে আরো ধারালো করে তুলত। ‘গেনে পাঞ্জাবে, জেলে জান যাবে’ কিংবা ‘দেশ হয়েছে স্বাধীন, তিন পেয়ালা ১১ দিন’,—সেই সব ছড়ার দু’-একটা এগনো মনে আছে। ক্রমে-ক্রমে দলে নামিল হল এসে যুবনাথ বা মণীশ ঘটক, তার ভাই হৃদীশ ঘটক, আব অনিল ভট্টাচার্য, ছাব্বর জগতের আলফাবিটা—আর সর্বোপরি ভৃগু। নবগ্রহের সভা গুলজার হয়ে উঠল মনে হল যেন বোহিমিয়ায় এসে বাসা নিয়েছি।

সলা বাহুল্য নিভৃততম ছিল বুদ্ধদেব মুক্ত উঠানে পিঁড়িতে বসে একমগ্নে স্নান, পাশাপাশি আসনে বসে নিত্য ভূরিভোজ নিত্যকালের জিনিষ হয়ে রয়েছে। সমস্ত অনিষম ক্ষমা করে বুদ্ধদেবের মার। অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগে হবার পর দিদিমাকেই বুদ্ধদেব মা বলত) যে একটি অনিষম স্নেহ ছিল চারপাশে, তারই নীরব স্পর্শ আমাদের নৈকট্যকে আরো যেন নিবিড় করে তুলল। একটা বিরাট মশারির তলায় দু’জনে শুতাম একই তক্তপোশে। কোনো কোনো দিন গল্প করে কাব্যলোচনা করে সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতাম। কোনো কোনো রাতে অজিত এসে জুটত, সঙ্গে বানিল কিংবা ভৃগু। তাস খেললেই রাত ভোর করে দেওয়া হত। বুদ্ধদেব তাস খেলত না, সমস্ত হল্লা-হাসি উপেক্ষা করে পড়ে-পড়ে ঘুমুত এক পাশে।

সে সব দিনে মশারি টাঙানো হত না। লঠনের আলোতে বসে স্বদীর্ঘ রাত্রি তাসখেলা—এক পরসী যেখানে স্টেক নেই—কিংবা দুই বা ততোধিক বহু

মিলে শুদ্ধ কাব্যলোচনা করে রাত পোহানো—সেটা যে কি প্রাণনায় সেদিন
সম্ভব হত আজকের হিসেবে তা অনির্ণয়। যে-যেদিন মশারি ফেলা হত সে-
সেদিনও তাকে বাগ মানিয়ে রাখা সাধ্য ছিল না। শেষরাত্রির দিকেই বাতাস
উঠত—সে কি উত্তাল-উদ্যম বাতাস—আর আমাদের মশারি উড়িয়ে নিয়ে
যেত। সবুজ ভোরের আলোয় চোখ চেয়ে মনে হত দুইজনে যেন কোন পাল-
তোলা ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে কোন নির্জন নদীতে পাড়ি দিয়েছি।

এক হুপ্রবেলা অজিত, বুদ্ধদেব আর আমি—আমরা তিনজনে মিলে মুখে-
মুখে একটা কবিতা তৈরি করলাম। কবিতাটা ঢাকাকে নিয়ে, নাম ‘ঢাকা-
চিকি’ বা ‘ঢাকা-ঢকা’। কবিতার অহুপ্রাস নিয়ে “শনিবারের চিঠির” বিজ্ঞপের
প্রভুস্বর। অহুপ্রাস কতদূর যেতে পারে তারই একটা চূড়ান্ত উদাহরণ :

কান্তনের গুণে ‘সেগুনবাগানে’ আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের ‘ঠাঠারিবাঝারে’ ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক ;
ঢাকার ঢেকিতে ঢাকের ঢেকুর ঢিটকারেতে ঢোঙে,
সং ‘বংশালে’ বংশের শালে বংশে সৈধেছে শিক।

ভূয়া ‘উয়ারির’ কুয়ার ধুঁয়ার চুঁয়ায় গুগার গুঁয়া,
বাছা ‘এছাকের’ কাছার কাছেতে কাছিমের কাছি আছে ;
‘চকের’ চাকু চাকায় চিকা চকচকি চাখে চুয়া
‘সাঁচিবন্দরে’ মন্দোদরীয়া বন্দী বান্ধিয়াছে।

পাষণ্ড ঐ ‘মৈহুণ্ডির’ মুণ্ডে গগুগোল,
‘স্বজাপুরের’ স্বজধরের পুজেরা কাংরায়,
‘লালবাগে’ লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা-লোল
‘জিন্দাবাহার’ বৃন্দাবনেতে নিন্দিছে সঙ্কায় !

‘বসন্তীবাঝারে’ বাসন্তে নস্সা মকশো একশোবার,
রমা রমণীয়া ‘রমনায়’ রমে রম্যা রজ্জাসম ;
‘একরামপুরে’ বিজি মাকড়ি লাকড়ি গুরুবার,
গছে অঙ্ক ‘নারিন্দ্যা’ যেন বিন্দু ইন্দুপন্ন।

চর্মে ঘর্মে ‘আর্মেনিটোলা’ কর্মে বর্ষাদেশ,
 টাকে-টিকটিকি-টিকি ‘টিকাটুলি’ টিকার টিকিট কাটে,
 ‘তীতিবাজারের’ তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিতোশ,
 ‘গ্যাণ্ডারিয়ার’ তঙ গুণ্ডা চঙ চণ্ড চাটে ॥

ঢাকায় হুঁজন পৃষ্ঠপোষক পাওয়া গেল। এক পরিমলকুমার ঘোষ, প্রোফেসর; হুই কণীভূষণ চক্রবর্তী, বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ আছেন আমাদের স্বপক্ষে, সেইটেই তখন প্রকাণ্ড উপার্জন।

একদিন হুপুরে আকাশ-কালো-করা প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। জ্ঞান করে উঠে ঠিক খাবার সময়টায়। দাঁড়াও, আগে বৃষ্টি দেখি, পরে খাওয়া যাবে। কিন্তু সাধ্য নেই সর্বভঞ্জন সেই প্রভঞ্নের সামনে জ্ঞানলা খোলা যায়। ঘরে লঠন জ্বলে হুঁজনে—বুদ্ধদেব আর আমি—ভাত খেলায় অদ্ভুত অবিস্মরণীয় পরিবেশে। হাওয়া যখন পড়ল তখন জ্ঞানলা খুলে চেয়ে দেখি, সর্বনাশ। অন্ধের নড়ি, আমার একমাত্র কাউন্টেন পেনটি টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এর পর আর ঢাকায় থাকার কোনো মানে হয় না।

বুদ্ধদেবের ক’টা চিঠির টুকরো :

“আপনি যদি ওর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করেন তা হলে খুব ভেবে-চিন্তে স্তম্ভের করে লিখবেন কিন্তু। কারণ এইসব চিঠি যে ভবিষ্যতে বাঙলা দেশের কোনো অভিজ্ঞাত পত্রিকা-বিশেষ গৌরবের সহিত ছাপবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু মেরেটি আপনার হাতের লেখা পড়তে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি অন্ততঃ আপনাকে এইটুকু অহরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাকে চিঠি লেখবার সময় কলমে যেন বেশি করে কালি ভরে নেন এবং অক্ষরগুলোকে ইচ্ছে করে অত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র না করেন। কারণ আমরা ভাক পাই গোধূলি-লগ্নে তখন ঘরেও আলো জ্বলে না, আকাশের আলোও দ্বান হয়ে আসে। কাজেই আপনার চিঠি পড়তে রীতিমত কষ্ট হয়।”

“অচিন্ত্যাব্যবস্থা, আষাঢ় মাস থেকে আমরা “প্রগতি” ছেপে বার করছি। মস্ত দুঃসাহসের কাজ, না? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল। এখন আর ফেরা যায়

না। একবার ভালো করেই চেষ্টা করে দেখি না কি হয়। প্রেমনবাবুকে এ খবর দেবেন।”

“আসাদ” মানে তেরোশ তেজিশের আবাচ আর “ছেপে” মানে আগে “প্রগতি” হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা ছিল।

“আপনি হুঃখ ও নৈরাশ্রের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন ভেবে আমারও সত্যি-সত্যি মন খারাপ লাগে। কি হয়েছে? এ সব প্রশ্ন করা সত্যি অসঙ্গত—অস্বস্ত চিহ্নিত। কিন্তু আপনার হুঃখের কারণ কি তা জানতে সত্যি ইচ্ছে করে—অলস কৌতূহলবশত নয় কেবল—আপনাকে বন্ধু বলে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তাই। আপনাব প্রতি হুঃখহুঃখের সঙ্গে আমি নিজেকেও যনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করি। আপনি কি চান? আসবেন? আসুন না। আমার যতদূর বিশ্বাস ঢাকা আপনার ভালো লাগবে—পন্টনের এই খেলা মাঠের মধ্যেই একটা মস্ত শান্তি আছে। আপনি এলে আমাদের যে অনেকটা ভালো লাগবে তা তো জানেনই।”

“প্রগতি আগামী বছর চলবে কিনা এখনো ঠিক করিনি। মাঝ তো আকাশের মত প্রকাণ্ড, কিন্তু পুঁজিতে যে কুলায় না। এ পর্যন্ত এর পেছনে নিজেদের যত টাকা ঢালতে হয়েছে তার হিসেব করলে মন খারাপ হয়ে যায়। এভাবে পুরোপুরি লোকসান দিয়ে আর এক বছর চালানো সম্ভব নয়। এখনো অবিশ্টি একেবারে হাল ছেড়ে দিইনি। গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ায় একবার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের চেষ্টায় কলকাতায় যাব। যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে প্রগতি চলবে। বখাসাধ্য চেষ্টায় ফলেও যদি কিছু না হয়, তাহলে আর কি করা? আপনি আর প্রেমনবাবু মিলে একটা নতুন উপগ্রাস যদি লেখেন তা দ্বিতীয় বর্ষের আবাচ থেকে আরম্ভ করা যায়।

আপনি কবে কলকাতা থেকে বেরোবেন? ঢাকায় কি আসবেন না একেবারে? শীত প্রায় কেটে গিয়েছে—আর কয়েকদিন পরেই পন্টনের বিস্তৃত মাঠ অতিক্রম করে বহু করে জোয়ারের জলের মত দক্ষিণা বাতাস এসে আমার ঘরে উজ্জ্বলিত হয়ে পড়বে—যে বাতাস গত বছর আপনাকে মুগ্ধ করেছিল, যে বাতাস আপনার কলম ভেঙেছিল। এবারো কি একবার আসবেন না? যখন ইচ্ছে। You are ever welcome here.”

“প্রগতিক টিকিয়ে রাখা সত্যিই বোধহয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না—কুসংস্কারগ্রস্ত মনের মত miracle-এ বিশ্বাস করবার দিকে ঝুঁকে পড়ছি। প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে vacuum আসবে তা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করবার মত নয়—সেই হিসেবেই সব চেয়ে খারাপ লাগছে। ‘কালি-কলম’ কি আর এক বছর চলবে ?

এবারকার ‘কল্লোলে’ শৈলজার ছবি দিয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে বাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করার সময় বোধহয় এসেছে। তাহলে কিন্তু এবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয়। কারণ আজকের দিনে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ, কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন মোহিতলাল—নয় কি ?”

“নজরুল ইসলাম এখানে দিন-কতক কাটিয়ে গেলেন। এবার তাঁর সঙ্গে ভালো-মত আলাপ হল। একদিন আমরা দর এখানে এসেছিলেন ; গানে, গল্পে, হাসিতে একেবারে জমাট করে রেখেছিলেন। এত ভালো লাগলো ! আর গুঁর গান সত্যি অদ্ভুত ! একবার শুনে সহজে ভোলা যায় না। আমাদের ছুটো নতুন গজল দিয়ে গেছেন, স্বরলিপি হৃদয় ছাপবো...নাট্যমন্দির এখানে এসেছে। তিনরাত অভিনয় হবে। আমি আজ যেতে পারলাম না—একদিনও যেতে পারবো না হয়তো। অর্থাভাব। যাক—একবার তো দেখেছিছি। এর পর আবার স্টার আসছে। ঢাকাকে একেবারে লুটে নেবে।

প্রগতি সত্যি-সত্যি আর চললো না। কোনোমতে জ্যৈষ্ঠটা বের করে দিতে পারলেই বেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তবু—যদি কখনো অর্থাগর হয়, আবার কি না বার করবো ?...আপনার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন।”

আঠারো

কোন এক গোরা টিমকে ছ-ছটা গোল দিলে মোহনবাগান। রবি বোস নামে নতুন এক খেলোয়াড় এসেছে ঢাকা থেকে এ তারই কারুকার্য। সেইবার কি ? না, যেবার বন্য দস্ত পর-পর তিনটে কর্নার-শট থেকে হেড করে পর-পর তিনটে গোল দিলে ডি-সি-এল-আইকে ? মোটকথা, ঢাকার লোক যখন এমন একটা অসাধ্যসাধন করল তখন মাঠ থেকে সিধে ঢাকায় চলে না যাওয়ার

কোনো মানে হয় না। যে দেশে এমন থেলোয়াড় পাওয়া যায় সে দেশটা কেমন দেখে আসি দরকার।

সুতরাং থেলায় মাঠ থেকে সোজা শেয়ালদা এসে ঢাকার ট্রেন ধরল তিনজন। দীনেশরঞ্জন, নজরুল আর নৃপেন। সোজা বুদ্ধদেবের বাড়ি। সেইখানে অতিরিক্ত আকর্ষণ, আমি বসে আছি আগে থেকে।

“দে গরুর গা ধুইয়ে”—মোহনবাগান-মাঠের সেই চিংকার বুদ্ধদেবের ঘরের মধ্যে ফেটে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিনিদাদ।

সেই সব ছন্নছাড়াব, আজ গেল কোথায়? যারা বলত সমস্বরে—

আমরা স্নেহের স্নীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাজ
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ,
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

ছিল ভৃগুকুমার গুহ। স্বাস্থ্য নেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই, অথচ মধুবর্ণী হাসির প্রসবণ। বিমর্ষ হবার অজস্র কারণ থাকলেও যে সদানন্দ। যদি বলতাম, ভৃগু, একটু হাসো তো, অমনি হাসতে শুরু করত। আর সে হাসি একবার শুরু হলে সহজে থামতে চাইত না। প্রবন্ধ লেখবার ঝকঝকে কলম ছিল হাতে, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশি টানত তা তার হৃদয়ের চাকচিক্য। ছিল অনিল ভট্টচাক। নিজের কল্পনার কোশলে যে দুঃস্বতাকেও শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে! বাঁশি বাজায় আর সিগারেটের ধোঁয়ায় থেকে-থেকে চক্ররচনা করে। মনোজ-মধুর সঙ্গস্পর্শের সুখা বিলোয়। ছিল সুধীশ ঘটক। যেন কোন অগ্নিলোকে নিরুদ্দেশের অভিযাত্রী। সব যেন লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনের যুবরাজ।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে
ভাঙা কুলোয় করক পাখা তোমার যত ভূত্যাগণে।
দঙ্কতালে প্রলয়শিখা দিক না এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকন্যা ছিন্নবাস;
হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস!

“তাই অচিন্ত্য,

বহুকাল পরে আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম। আজ সকালেই তোমাকে এক কার্ড লিখেছি, তবু আবার না লিখে পারলাম না।

‘প্রগতি’ নিশ্চয়ই পেয়েছে—আগাগোড়া কেমন লাগল জানিয়ে। তোমার কাছ থেকে ‘প্রগতি’ যে স্নেহ ও সহায়তা পেল তার তুলনা নেই। এই ব্যাপারে আমরা কত নিঃস্ব ও নিঃসহায়—ভেবে-ভেবে এক-এক সময় আশ্চর্য লাগে। লাভের মধ্যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি ও আরো প্রচুর লোকনিষ্ঠা—একটি লোক নেই যে সত্যি-সত্যি আমাদের আদর্শের প্রতি সংগ্রহ-ভূতিসম্পন্ন। তবু কেন চালাচ্ছি? আমাদের মধ্যে যে surplus energy আছে, তা এইভাবে একটা outlet খুঁজে নিয়েছে। খেয়ে-পরে-ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারব না, বিধাতা আমাদের এ অভিশাপ দিয়েছেন। তাই একটা কিছু করতে হয়, কোনো একটা নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে হয়। আমরা তো মনে হয় আমাদের জীবনে ‘প্রগতির’ প্রয়োজন ছিল। যে শক্তি আমাদের ভিতর আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার না করলেই অগ্রায় হত। তবে অর্থসংকটটাই বিশেষ করে পীড়াদায়ক। হাত একেবারে রিক্ত—কি করে চলবে জানিনে। তবু আশা করতে ছাড়িনে। তবু দমে যাই না। কেমন যেন বিশ্বাস জন্মেছে যে ‘প্রগতি’ চলবেই—যেহেতু চলাটা আমাদের পক্ষে দরকার।

তুমি যদি ‘বিচিন্তা’র চাকরি পাও, তাহলে খুবই সুখের কথা। অর্থের দিকটাই সবচেয়ে বিবেচনা করবার। পঞ্চাশ টাকা এমন মন্দই বা কি। তার উপর টিউশনি তো আছেই। তবে ‘বিচিন্তা’র একটা anti-আধুনিক feeling আছে, কিন্তু তাতে কতটুকুই বা যাবে আসবে? তোমার ‘ল’ final কবে? ওটা পাশ করলে পর স্থায়ীভাবে একটা কিছু কাজ করলেই নিশ্চিন্ত হতে পারো।

তোমার চিঠিটা পড়ে অবধি আমার মন কেমন যেন ভারি হয়ে আছে—কিছু ভালো লাগছে না। শুধু ভাবছি, এও কি করে সম্ভব হয়? তুমি যে-সব কথা লিখেছ তা যেন কোনো নিত্যন্ত conventional বাঙালি উপজাতির শেষ পরিচ্ছেদ। জীবনটাও কি এমনি মায়ুলি ভাবে চলে? আমাদের গুরুজনেরা আমাদের যা বলে উপহাস করেন, তাঁদের সেই সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিই কি টিকে থাকবে? আমাদের সমস্ত idealism সব স্বপ্নই কি মিথ্যা? দাঁড়ে কি পাগল ছিল? আর শেলি বোকা? পৃথিবীতে কি কোথাও কবিতা নেই? কবিতা

যারা লেখে তারা কি এমনি ভিন্ন জাতের লোক যে তারা সবাইকে শুধু ভুলই বুঝবে? কবির চোখে পরমহুন্দরের যে ছায়া পড়েছে আর কেউ কি তা দেখতে পাবে না? পৃথিবীর সব লোকই কি অন্ধ?

কী প্রচুর বিশ্বাস নিয়ে আমরা চলি, এর জ্ঞাত কত ত্যাগ স্বীকার করি, কত দুঃখবরণ করে নিই। এ কথা কি কখনো ভাববার যে এর প্রতিদান এই হতে পারে? আমরা যে নিজেকে একান্তভাবে ঢেলে দিয়ে ফতুর হয়ে থাকি সে দেয়ার কোনো কূলকিনারা থাকে না। সেই দান যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহলে আবার নতুন করে জীবন গড়ে তুলতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের থাকে না। এটা কি আমাদের প্রতি মন্তব্য আচার করা হয় না—জন্মের জীবনকে এমন ভাবে নিষ্ফল করে দেয়ার কি অধিকার আছে? ইতি তোমাদের বুদ্ধদেব।’

একবার একসঙ্গে ফিরলাম দু’জনে ঢাকা থেকে—বুদ্ধদেব আর আমি। ইন্সটিমারে সাধারণ ডেকের যাত্রী—যে-ডেকে পাশে বাগ্মতোরঙ্গ রেখে সন্তরঙ্গি বিছিয়ে হয় ঘুম, নয় তো তামখেলাই একমাত্র সুকাজ। কিন্তু শুদ্ধ গল্প কবেই যে বাশি-বাশি মুগ্ধ মুহূর্ত অপব্যয় করা যায় তা কে জানত। সে গল্পের বিষয় লাগে না, প্রস্তুত লাগে না। পরিবেশ লাগে না। যা ছিল আজীবাজে, অর্থাৎ আজ-বাদে-কাল যা বাজে হয়ে যাবে, তাতেই ছিল চিরকালের বাজনা।

একটানা জলের শব্দ—আমাদের কথার তোড়ে তা আর লক্ষ্যের মধ্যে আসছে না! কিন্তু স্টিমার যখন ভাঁ দিয়ে উঠত, তখন একটা গভীর চমক লাগত বুকের মধ্যে। যতক্ষণ না ধ্বনিটা শেষ হত, কথা বন্ধ করে থাকতাম। কোনো স্টেশনের কাছাকাছি এলে বা ছেড়ে যাবার উপক্রম করলেই স্টিমার বাশি দিত। কিন্তু যখনই বাশি বাজত, মনে হত এটা যেন চলে যাবার স্বর, ছেড়ে যাবার ইশারা। ট্রেনের সিটির মধ্যে কি-রকম একটা কর্কশ উল্লাস আছে, কিন্তু স্টিমারের বাশির মধ্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন বিবাদ। স্থির স্থলকে লক্ষ্য করে চঞ্চল জলের যে কারা, এ যেন তারই প্রতীক।

আমার বাসা তখন তিরিশ নম্বর গিরিশ মুখার্জি রোড। সংক্ষেপে তিরিশ গিরিশ। তারই এক তলার এক ছোট কুঠুরিতে আমি সর্বময়। সেই কুশ-কুপন ঘরেই উদার হৃদয়তায় আতিথ্য নিয়েছে বহুরা। বুদ্ধদেব আর অজিত, কখনো বা অনিল আর অমলেন্দু। সেই ছোট বন্ধ ঘরের দেওয়াল যে কি করে সরে-সরে মিলিয়ে যেত দিগন্তে, কি করে সামান্য শূন্য বিশাল আকাশ হয়ে উঠত,

আজ তা স্বপ্নের মত মনে হয়। জড়য় যে পৃথিবীর সমস্ত স্থানের চেয়ে বিস্তারময়
তা কে না জানে।

“ভাই অচিন্ত্য,

নারায়ণগঞ্জে কয়েক ঘণ্টা halt করে আজ সন্ধ্যায় বাড়ি এসে পৌঁচেছি! টুহু আগেই এসেছিল। মা আমার সঙ্গে এলেন না, আপাতত তিনি দিনকতক নারায়ণগঞ্জেই কাটাবেন। এতে আমারই হল মুশকিল। মা না থাকলে এ বাড়ি আমার কাছে শূন্য, অর্থহীন। শারীরিক অসুবিধে, আত্মস ইত্যাদি ছাড়াও মা-র অভাব আমার কাছে অনেকখানি। মা না থাকলে মনে হয় না যে এ বাড়িতে আমার সত্যিকার স্থান আছে। ছুটির বাকি ক’টা দিন খুব সুখে কাটবে এমন মনে হচ্ছে না। এখন আশলোস হচ্ছে এত শিগগির চলে এলাম বলে। ভাবছি, আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে এলে কান্নার কিছু ক’র্তি হত না— এক তোমার ছাড়া;—তা তোমার ওপর জোর কি আবার চলে বইকি। কল-কাতায় এই দিনগুলি যে কি ভরপুর আনন্দে কেটেছে এখন বুঝতে পারছি। তোমাদের প্রত্যেকের কথা কী গভীর স্নেহের সঙ্গেই না স্মরণ করছি। বিশেষ করে সুধীশকে মনে পড়ছে। আসবার সময় স্টেশনে গুর মুখখানা তারি মলিন দেখেছিলাম।

ঢাকা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে—পথঘাট নির্জন। পরিমল বাড়ি চলে গেছে, থাকবার মধ্যে অমল আর অনিল। সন্ধ্যাবেলায় ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরলাম—টুহুও ছিলো। এখানে এখন কিছুই ঘেম করার নেই। আমার ঘরটা নোঙরা, অগোছাল হয়ে আছে—মার হাত না পড়লে শোধরাবে না। এখন পর্যন্ত জিনিসপত্রও খুলিনি—তারি ক্লান্ত লাগছে অথচ ঘুম আসছে না! কাল দিনের বেলায় সব সিঁজিলমিছিল করে গুছিয়ে বসতে হবে। তারপর একবার কান্নের মধ্যে ডুব দিতে পারলেই হ-হ করে দিন কেটে যাবে।

‘কল্লোলে’র সবাইকে আমাদের কথা বোলো। তোমাদের সঙ্গে আবার যে কবে দেখা হবে তারি দিন গুনছি। ইতি। চিরাহুয়ন্ত বুদ্ধদেব”

“ভাই অচিন্ত্য,

D. R. “স্বদেশী-বাজারের” গল্প পড়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন গল্প চেয়ে। প্রত্যুত্তরে আমি একটি গল্প পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকার কথা খোলাখুলি লিখেছি

—সেটাই ভালো। লেখাটা in itself আর আমার life-এর কোন point নয়, অর্থাগমের সম্ভাবনা না দেখলে আর লিখবো না—লিখতে ইচ্ছাও করে না। এই ক্ষুদ্রই মাসখানেকের মধ্যে এক লাইনও কবিতা লিখিনি। আত্ম-সম্মর্শনকল্পে D. R.-কে অনেক কথা লিখতে হয়েছে। আশা করি সে চিঠি ও গল্প তুমি পড়েছ।

এখন পর্যন্ত যে ব্যবস্থা আছে তাতে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো, আশা করি। কলেজে ছুটি হবার আগেই পালাবো, কারণ তা না হলে অসম্ভব ভিড়ে পথিমধ্যেই প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। ক্যাপ্টেন ঘোষ নেবুতলায় বাসা নিয়েছেন, তাঁর ওখানে এবার উঠবো। তোমার ‘ল’-র কথা আমিও ভেবে রেখেছি। রোজ বিকালে দেখা হলেই চ-বে। ছুগুও কলকাতায় আসবে। টুন্সর ঠিক নেই, ওর first class পাওয়া এখন সব চেয়ে দরকার। শীতের ছোট দিন—মিষ্টি রোদ—ছ’-রজন বকু, সময়ের আবার ডানা গজাবে, চোটখাট জিনিস নিয়ে খুশির আর অলু থাকবে ন’

‘প্রগতি’ তুলে দিলাম। অসম্ভব—অসম্ভব—আর চালানো একেবারে অসম্ভব। আমার ইহকালে-পরকালে, অন্তরে-বাহিরে, বাকো-মনে আর আপনার বলে কিছু রইলো না। কত আশা নিয়েই যে শুরু করেছিলাম, কত উচ্চাভিলাষ, স্নেহ, আনন্দ—কী প্রকাণ্ড idealism ই যে এব পেছনে ‘হলো! যাক, এখন বাজারে যা কিছু ধার আছে তা একটু-একটু করে শোধ করে উঠতে পারলেই স্বস্তির নিখাস কেলে বাঁচি। অত্যন্ত প্রিয়জনও দীর্ঘকাল বিধম রোগে ভুগলে যেমন তার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে, ‘প্রগতি’ও শেষের দিকে তেমনি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ‘প্রগতি’র মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় ব্রডকাস্ট করে দিয়ে। তুমি আমার প্রাণপূর্ণ ভালোবাসা নাও। ইতি। তোমার বুদ্ধদেব”

“অচিন্ত্য,

শেষ পর্যন্ত ‘প্রগতি’ বোধহয় উঠে গেলো না। ভূম বলবে অমন প্রাণান্ত করে চালিয়ে লাভ কি? লাভ আছে।

গরিমলবাবুর (ঘোষ) সঙ্গে আজ কথা করে এলাম। তিনি পঁচিশ টাকার মত মাসিক সাহায্য জুটিয়ে দিতে পারবেন, আশ্বাস দিলেন। আমি কলকাতায় দশের ব্যবস্থা করেছি। সবসময় পঞ্চাশ টাকার মত দেখা যাচ্ছে। আরো কিছু পাবো আশা করা যাচ্ছে। তার ওপর বিজ্ঞাপনে দুটো-পাঁচটা টাকা কি আর

না উঠবে! উপস্থিত ঋণ শোধ করবার মত উপায়ও পরিমলবাবু বাথলে দিলেন।
এবং কাগজ যদি চলেই, কিছু ঋণ থাকলে যার আসে না।

তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাই। পাঁচটা টাকা তুমি সহজেই spare করতে পারো। সম্পূর্ণ নিজেদের একটা কাগজ থাকা—সেটা কি কম স্ব্থের? আধুনিক সাহিত্যের আন্দোলনটা আমরা কয়েকজনে মিলে control করছি, এ কথা ভাবতে পারার luxury কি কম? কিন্তু তোমার সঙ্গে argue করেই বা কি লাভ? তোমার কাছে শুধু মিনতি করতে পারি।

মনে হচ্ছে কাকে যেন হারাতে বসেছিলাম, ফিরে পেতে চলেছি। শরীর যদিও অত্যন্ত খারাপ, মন ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি আমাকে নিরাশ কবে না। With love, B.”

“কল্লোল” থেকে কচিং যেতাম আমরা চীনে পাড়ার হেস্টরীতে। তখন নানকিন ক্যান্টন আর চ্যাংগোয়া তিনটেই চীনে-পাড়ার মধ্যেই ছিল, একটাও বেরিয়ে আসেনি কুলচ্যুত হয়ে। ব্রাক আর বার্ন দুটো কথাই কদাকার, কিন্তু ব্র্যাকনার্ন একত্র হয়ে যখন একটা গলির সংকেত আনে তখন স্বপ্ন-দেখা একটা রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয়।

শহরের কৃত্রিম এফব্লেমির মধ্যে থেকে হঠাৎ যেন একটা ছুটির সংবাদ। রুক্ষ রুটিনের পর হঠাৎ যেন একটু সুন্দর অসম্বদ্ধতা—সুন্দর অস্বভাবিতা। দেশের মধ্যে বিদেশ—কর্তব্যের মধ্যখানে হঠাৎ একটু দিব্যস্বপ্ন।

এলেই চট করে মনে হয় আর কোথাও যেন এলেছি। শুধু আলাদা নয়, বেশ একটু অচেনা-অচেনা। সমস্ত শহরের ছুটোছুটির ছন্দের সঙ্গে এখানকার কোনো মিল নেই। এখানে সব টিলে-ঢালা, ডিম্বে-তেতাল। খাটো-খাটো পোশাকে বৈটে-বৈটে কতকগুলি লোক, আর পুতুলের মত অগুনতি শিশু। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চোখে হাসিমুখ! একেকটা হরফে একেকটা ছবি এমন সব চিত্রিত সাইনবোর্ডে বিচিত্র দোকান। ভিতরের দিকটা অন্ধকার, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, কারা হয়ত ঠুকঠাক কাজ করছে আপন মনে, কারা হয়তো বা চুপচাপ জুয়ো খেলছে গুম হয়ে আর দীর্ঘ নলে প্রচণ্ড ঘুমপান করছে। যারা চলেছে তারা যেন ঠিক চলে যাচ্ছে না, ঘোরাফেরা করছে। ভিড়ে-ভাড়ে যতটা গোলমাল হওয়া দরকার তার চেয়ে অনেক নিঃশব্দ। হয়তো কখনো একটা রিকশার টুং-টাং, কিংবা একটা ফিটনের খুঁটখাট। সবই যেন আন্তে-স্ব্থে গড়িষি করে চলেছে। এদের চোখের মত গ্যাসপোস্টের আলোও যেন

কেমন ঘোলাটে, মিটিমিটি। ভয়ে গা-টা বেন একটু ছমছম করে। আর ছমছম করে বলেই সব সময়েই এত নতুন-নতুন মনে হয়। কোনো জিনিসের নতুনত্ব বজায় রাখতে পারে শুধু দুটো জিনিস—এক ভয়, আরেক ভালোবাসা।

সরু গলি, আবছা আলো, অকুলীন পাড়া,—অথচ এরি মধ্যে জাঁকালো রেশমী, সাজসজ্জার ঢালাঢালি। হাতির দাঁতের কাঠিতে চাউ-চাউ খাবে, না সপ-হুই? না কি আস্ত-সমস্ত একটি পক্ষীনীড়? এ এমন একটা জায়গা যেখানে শুধু ঝঠেরই থিদে মেটে না, চিস্তের উপবাস মেটে—যে চিন্তা একটু হৃদয় কবিতা, হৃদয় বন্ধুতা, আর হৃদয় পরিবেশের জগ্রে সমুৎসুক।

তখন একটা বাগভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। এ পর্যন্ত রাম বললে, রাম খেল, রাম হাসল ছিল—এখন শুরু হল রাম বলে, রাম থায়, রাম হাসে। সর্বনাশ, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম যে, “শনিবারের চিঠি” ব্যঙ্গ শুরু করল। অথচ সজ্জনীকান্তর প্রথম উপন্যাস “অজয়ে” এই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ। একবার এক ডাক্তার বলন্তের প্রতিবেদকরূপে টিকে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালায়। সভা করে-করে সকলকে জ্ঞান বিলোয়, টিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এমনি এক টিকাবর্জন সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে ডাক্তার, এমনি ভিড়ের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল: তুমি তোমার আস্তিন গুটোও দেখি। আস্তিন গুটিয়ে দেখা গেল ডাক্তারের নিজের হাতে টিকে দেওয়া।

তেমনি আরেকটা চলেছিল বানানভঙ্গি। সংস্কৃত শব্দের বানানকে বিমুগ্ধ রেখে বাংলা বা দেশজ শব্দের বানানকে সরল করে আনা; নীচ যে অর্থে নিকট তাকে নীচই রাখা আর যে অর্থে নিম্ন তাকে নিচে কেলা। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পত্ন-বৃত্ত-বিধানকে উড়িয়ে দেওয়া—তিনটে স-কে একীভূত করার সূত্র খোঁজা। রবীন্দ্রনাথ যে কেন চষমা বা জিনিষ বা পুষতু লিখবেন তা তো বুঝে উঠা যায় না। রানি বলতেই বা মূর্খতা ব লোপ করবেন তা দীর্ঘ দৈ-কার কেন লোপ করবেন না তা কে বলবে। কিন্তু সব চেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল মূর্খতা ব-এর সঙ্গে ট-এর সম্মিলন। নষ্ট-ভেঁ-পাট করে লেখ, আপত্তি নেই, কিন্তু ক্রিয়ার স্টেশন আগস্ট ক্রিস্টমাসের বেলায় মূর্খতা ব-এ ট দেবার যুক্তি কি? একমাত্র যুক্তি দম্ভ্য স-এ ট-এর টাইপ নেই ছাপাখানায়—যেটা কোনো যুক্তিই নয়। টাইপ নেই তাই দম্ভ্য স-র হসন্ত দিয়ে লেখা যাক। যথা স্টিমার স্টেশন স্ট্যাম্প আর স্টেথিসকোপ। নিম্নকেরা ভাবলে এ

আবার কী নতুন রকম শুরু করলে। লাগে হসন্তের পিছনে। হসন্ত খসিয়ে দিয়ে তারা কথাগুলোকে নতুন রূপসজ্জা দিলে—গটিয়ার আর লটেশন—আহা, কি সটাইল রে বাবা।

সজ্জনীকান্ত একদিন কল্লোল-আপিসে এসে উপস্থিত হল। আড্ডা জমাতে নয় অবিভি, ক'খানা পুরানো কাগজ কিনতে নগদ দামে। উদ্দেশ্য মহৎ, সাধ্যমত প্রচার করতে কাউকে। ভাবখানা এমন একটু প্রভ্রম পেলেই যেন আড্ডার ভোজে পাত পেড়ে বসে পড়ে। আসলে সজ্জনীকান্ত তো “কল্লোলেরই” লোক, ভুল করে অন্য পাড়ায় ঘর নিয়েছে। এই রোয়াকে না বসে বসেচে অন্য রোয়াকে। তেমনি দীনেশ্বরজনও “শনিবারের চিঠির” হেড পিয়াদা! “শনিবারের চিঠির” প্রথম হেডপিস, বেজহস্ত বণ্ডারার্কে ছবিটি তাঁরই আঁকা। সবই এক ব্যাকের কই, এক সানকির ইয়ার, শুধু টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। নইলে একই কর্মনিষ্ঠা। একই ভেজ। একই পুরুষকার।

প্রেমেন শুয়েছিল তরুপোশে। বললুম, ‘আলাপ করিয়ে দিই—’

টানা একটু প্রশ্ন দিলেই সজ্জনীকান্তকে অনায়াসে চেয়ার থেকে টেনে এনে শুইয়ে দেওয়া যেত তরুপোশে—অটেল আড্ডার চিলেমিতে। কিন্তু কলির ভীমের মত প্রেমেন চঠাৎ ছমকে উঠল : ‘কে সজ্জনী দাস?’

এ একেবারে দরজার খিল চেপে ঘর বন্ধ করে দেওয়া! আলো নিবিয়ে মাথার উপরে লেপ টেনে দিয়ে ঘুমুনো। প্রশ্নের উত্তর থাকলেও প্রশ্নকর্তার কান নেই। আবার শুয়ে পড়ল প্রেমেন।

সজ্জনীকান্ত হাসল হয়তো মনে মনে। ভাবখানা, কে সজ্জনী দাস, দেখাচ্ছি তোমাকে।

টেকনিক বদলাল সজ্জনীকান্ত। অত্যন্তকালের মধ্যে প্রেমেনকে বন্ধু করে কেবল।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলজা। ক্রমে-ক্রমে নজরুল। পিছু-পিছু নূপেন।

শক্তিধর সজ্জনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিহেও।

পুত্রীতে বেড়াতে গিয়েছি, সঙ্গে বুদ্ধদেব আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কাকর হাতে বিবভাওও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর কেউ নয়, স্বয়ং সজ্জনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গভীর মধ্যে। একই
হাস্যপরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজ্জনীকান্ত বললে, শুধু বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু
হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।

তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু আমরাও যদি বন্ধু হয়ে যাই তবে ব্যবসা চলবে
কি দিয়ে? কাকে নিয়ে থাকবে? গালাগালের মধ্যে ব্যক্তি-বিদ্বেষ একটু
মেশাতে হবে তো? বন্ধু করে ফেললে ঐটুকু ঝাঁজ আনবে কোথেকে?
তোমায় ব্যবসায় মন্দা পড়বে যে।

কথাটা ঠিকই বলেছ। তোমাদের সাহিত্য, আমাদের ব্যবসা। সাহিত্যিকরা
রাজহাঁস আর ব্যবসায়ীরা পাতিহাঁস! পাতিহাঁসের খাত জল-কাদা, রাজহাঁসের
খাত দুধ। কিন্তু গালাগাল সহিতে পারবে তো?

গালাগাল দিচ্ছ কে বলছে? দস্যু রত্নাকরও প্রথমে ‘মরা’ ‘মরা’ বলেছিল।
মরার বাড়া গাল নেই। সবাই ভেবেছিল বুঝি গাল দিচ্ছে। কিন্তু, জানো
তো, ‘ম’ মানে ঈশ্বর, আর ‘রা’ মানে জগৎ—আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। তবে
গেল রত্নাকর। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন, প্রথমেই বললেন, অচিন্ত্যং
স্বযাক্তং অনন্তং অব্যয়ং! আর বুদ্ধদেব,—তিনি তো ভগবান তথাগত—
‘নামোচ্চারণভেষজাৎ’ তুমিও পার হয়ে যাবে দেখো।

আর তোমরা?

আমরা তো ভালো দলেই আছি। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু
করে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত সবায়ের সঙ্গে আমরাও নিন্দার এক পঙক্তিতে বসেছি
—আমাদের ভয় নেই!

তথাস্তু! তবে একটা নব সাহিত্য-বন্দনা শোন :

“জয় নব সাহিত্য জয় হে

জয় শাস্ত, জয় নিত্যসাহিত্য জয় হে।

জয় অধুনা-প্রবর্তিত বঙ্গ

রহ চিরপ্রচলিত বঙ্গ

শ্রমিকের, ধনিকের, গণিকার, বণিকের

সাম্যের কাম্যের, শাস্ত স্বণিকের—

অড় ও পাবাণের

ভদ্র ও শূন্যের

আন্তার্কট্টে যাহা ফেলি উদ্ভূত হে

সকল অভিনব-সাহিত্য জয় হে।

প্রগতি-কল্লোল-কালিকলয়
 অন্তর ক্ষতেতে লেপিলে মলয়
 রসের নব নব অভিব্যক্তি
 উত্তরা ধূপছায়া আত্মশক্তি—
 প্রেম ও পীরিতির নিত্য গদগদ সলিলে অভিব্যক্তি
 জয় নব সাহিত্য জয় হে
 জয় হে জয় হে জয় হে
 প্রাচীন হইল রসাতলগত, তরুণ হল নির্ভয় হে
 জয় হে জয় হে জয় হে ।”

হেম বাগচির সঙ্গে আলাপ হয় বলাই সিঙ্গি লেন-এর মেসে। জীবনানন্দের
 বেলায় যেমন, ওর বেলায়ও ওর ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ওকে বার করি। নতুন
 লেখক বা শিল্পী খুঁজে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করাতে দারুণ উৎসাহ,
 বিশেষত সে যদি মর্মজ্ঞ হয়। হেম হচ্ছে তেমন কবি যার সান্নিধ্যে এসে এসলে
 মনে হয় নিবিড়নিষ্ক বৃক্ষছায়াতলে এসে বসেছি। সব-বিংশাল চেহারা, চোখ
 দুটি দীর্ঘ ও শীতল—স্বপ্নময়। ভীষ্মতার চেয়ে প্রশান্তি, গাঢ়তার চেয়ে গভীরতার
 দিকে দৃষ্টি বেশি। প্রথম যখন ওকে পাই তখন ওর জীবনে মৃত্যু মাতাব্যয়োগ-
 ব্যথার ছায়া পড়েছে—সেই ছায়ায় ওর জীবনের সমস্ত ভঙ্গিটি কমনীয়! সেই
 লাবণ্যটি সমস্ত জীবনে সে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লাগন করেছে, তাই তার
 কবিতায় এই স্তিতি এই স্নিগ্ধতা। হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থেকে হেম যখন ‘ল’ পড়ে
 তখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় চারতলার উপরে তার বরে আড্ডা দিতে গিয়েছি, দৈত
 কলকুজন ছেড়ে পরে চলে এসেছি বহুবননের “কল্লোলে”। কোনো উদ্ভাসতায়
 হেম নেই, সে আছে নির্মল স্বৈর্যে; কোনো তর্কতীক্ষ্ণতায় সে নেই, সে আছে
 উত্তপ্ত উপলব্ধিতে। নিকবকবিত সোনার মতই সে মহার্ঘ।

কিন্তু প্রবোধকুমার সাত্তাল অল্প জাতের মানুষ। ক্রিতি-অপ-তেজ হয়তো
 ঠিকই আছে, কিন্তু মরুৎ আর ব্যোম যেন অল্প জগতের। মুক্ত হাওয়ার মুক্ত
 আকাশের মানুষ সে, আর সেই হাওয়া আর আকাশ আমাদের এই বন্ধ জলার
 জীবনে অল্পদৃষ্ট। তাকে খুঁজে নিতে হয় না, সে আপনা থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে
 ছড়িয়ে পড়ে। “কল্লোলে” প্রথম বছরেই তার গল্প বেরোয়, কিন্তু সশরীরে সে
 দেখা দেয় চতুর্থ বর্ষে। আর দেখা দেওয়া মাত্রই তার সঙ্গে রক্তের রাধিবন্ধন

হয়ে গেল। প্রবোধের চরিত্রে একটা প্রবল বস্তুতা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল একটা আশ্চর্য স্বৈৰ ও দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি। বাসা ভেঙে দিতে পারে প্রবোধ, কিন্তু কোনোদিন আশ্রয় তুলে দেবে না কিছুতেই। বিচ্ছেদ আছে প্রবোধের কাছে, কিন্তু বিয়োগ নেই। সমস্ত চাঞ্চল্য-চাপল্য সব্বোত্তর তার হৃদয়ে একটা বলিষ্ঠ ঐদার্ব আছে, সমস্ত উত্থানে-পতনে তার মধ্যে জেগে আছে ঘরছাড়া সদাতৃপ্ত সন্ন্যাসী। দুর্বিপাকে পড়েও তার এই উদারতা ঘোচে না। শত ঝড়েও মুছে যায় না তার মনের নীলাকাশ। আর সকলের সঙ্গে বুদ্ধির ও বিজ্ঞার যোগাযোগ, প্রবোধের সঙ্গে একেবারে অন্তরের সংস্পর্শ। ওর মাঝে মেঘ এলেও মলিনতা আসে না। ‘রম্ভা’ সাধু আর ‘বহতা’ জল, মানে যে সাধু ঘুরে বেড়ায় আর যে জলে নিরন্তর শ্রোত বয়, তা কখনো মলিন হয় না।

উনিশ

ঘর ছোট কিন্তু হৃদয় অসীমব্যাপ্ত। প্রবেষ্টা সংকীর্ণ কিন্তু বস্তুতা অকুতোভয়। লেখনীতে কুণ্ঠা কিন্তু অন্তরে অকাপট্যের তেজ।

যেহেতু আমরা সাহিত্যিক সেহেতু আমরা সমগ্র বিশ্বজনের আত্মজন এমনি একটা গব ছিল মনে-মনে। সমস্ত রসপিপাসু মনের আমরা প্রতিবেশী। আমাদের জন্তে দেশের ব্যবধান নেই, ভাবার অন্তরায় নেই। আমাদের গতি-বিধি পরিমিত, সকলের মনের নিজনে আমাদের নিত্যকালের নিমন্ত্রণ। পৃথিবীর সমস্ত কবি ও লেখকের সঙ্গে আমরা সমবেত হয়েছি একই মন্দিরে, সম্মিলিত হয়েছি উপাসনায়। আসনের তারতম্য আছে, ভাবণের গুণভেদ—কিন্তু সন্দেহ কি, সত্যের দেবালয়ে স্তম্ভের বন্দনায় একত্র হয়েছি সকলে, এক সাময়িক! সমস্ত পৃথিবী আমাদের স্বদেশ, সমস্ত মনুষ্য আমাদের ভাই—সেই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে।

সুদূর বাংলার নবীন লেখক বিশ্বের দরবারে কীর্তিমানদের সঙ্গে সমানধর্মিতা দাবি করছে—সাহস আছে বটে। কিন্তু “কল্লোলের” সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। শুধু সূত্রপাতের সাহস নয়, সম্পূর্ণের সাহস। সেই সাহসে একদিন আমরা বিশ্বের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মিত্রতা দাবি করে বসলাম, নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের যজ্ঞসভায়। আমাদের এই শুপুরি-নারকেল খান-পাটের দেশকে যিনি বিশ্বের মানচিত্রে চিত্রিত করেছেন

সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচায়ক। ভাষার উদ্ভাপ ছিল, ছিল ভাবের আন্তরিকতা, অনেকেই প্রত্যাভিবাদন করলেন “কল্লোলকে”।

ইতিপূর্বে ডক্টর কালিদাস নাগ গোকুলের সঙ্গে “জঁ” ক্রিস্তফ্” অম্ববাদ শুরু করেছেন। গোকুল মারা যাবার পর শাস্তা দেবী হাত মেলালেন অম্ববাদে। কালিদাসবাবুই বল্লার আত্মিক দীপ্তির প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে এলেন “কল্লোলে”। ফ্রান্সে ছিলেন শিক্ষাসূত্রে, আর ছিলেন বল্লার সঙ্গসান্নিধ্যের স্নেহচ্ছায়ায়। তাই প্রথম আমরা বল্লাকেই চিঠি লিখলাম। চিঠির ইতিভে প্রথমে সই করল দীনেশরঞ্জন—যজ্ঞের পুরোধা, পরে আমরা—যজ্ঞভাগীরা।

মহাপ্রাণ বল্লী মহামানবের ভাষায় সে চিঠির উত্তর দিলেন। করাসিতে লেখা সেই চিঠি ইংরিজিতে তর্জমা করেছেন কালিদাসবাবু :

February 8, 1925

Dear Sir,

I have received two of your kind letters—the letter which you collectively addressed to me with your collaborators and that of 15th January accompanying the parcel of your Review. I beg to thank you cordially for that.

I am happy that my dear friend Dr. Kalidas Nag presents my “Jean Christophe” to the readers of Kallol and that my vagabond child—Christophe starts exploring the routes of India after having traversed through the heart of Europe. He carries in his sack a double secret which seems contradictory : *Revolt* and *Harmony*. He learnt the first quite early. The second came to him only after years from the hands of *Grazia*. May every one of my friends meet *Grazia* (real or symbolical) !

I have sent to you a few days ago one of my photographs as you have asked and I have written on the back of it a few lines in French : for I don't write English. And it is absolutely necessary that you should learn a little French or one of the Latin languages which are much nearer to your language (Bengali) by the warm and musical sonority than the English language.

Now I in my turn demand certain things from you. While you do me the honour of translating Jean Christophe in Bengali, some of my European friends desire to be familiar with your modern literature—novels, (romance) short stories, essays, etc. from the Indian writers, which may be published gradually by Emil Roninger of Zurich who has already taken the initiative in publishing the works of Gandhi. What is wanted is the translation of your contemporary publications, as for example, we shall be happy to know the works of Saratchandra Chatterjee whose small volume of *Srikanta* translated by K. C. Sen and Thompson, has struck our imagination by his art and original personality. Is it possible to arrange for the translation of some of the prose works of your most distinguished living authors? That would be a work which will glorify your country, for they would be translated and spread in different countries of the west.

I would request the young writers of India to publish in English the *biographies* of the great personalities of India : Poets, Artists, Thinkers, etc. on the same models as my lives of Bethoven, Michael Angelo, Tolstoy and Mahatma Gandhi. Nothing is better qualified to inspire the admiration and love for India in the heart of Europe which knows them not : Europe is strongly individualistic, she will always be struck more by a *Figure*, by a *Person* than by an idea. Show her your great men—Sages and your Heroes.

I submit to you these suggestions and I request you dear Dinesh Ranjan Das and your collaborators of Kallol, to believe me to be your cordial and devoted friend.

ROMAIN ROLLAND.

যে ফটোগ্রাফটি পাঠিয়েছিলেন তার পিঠেও ফরাসিতে লিখে দিয়েছিলেন কয়েক লাইন। তার ইংরিজি অনুবাদ এইরূপ :

To my Friends of India :

Europe and Asia form one and the same vessel. Of that

the prow is Europe. And the chamber of watching is India, Empress of Thought, of innumerable eyes. Light to thee, mine eyes. For thou belongs to me. And mine spirit is Thine. We are nothing but one indivisible Being.

ROMAIN ROLLAND.

রলান্‌র বোন কিন্তু ইংরিজিতে চিঠি লিখলেন, আর সব চেয়ে আশ্চর্য, হৃদয় বিদেশে থেকেও বাঙলা ভাষা তিনি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন—শুধু পড়া নয়, লেখাও। তাঁর চিঠিটা দীনেশরঞ্জনর গল্পের বই “মাটির নেশা”কে অবলম্বন করে লেখা—কিন্তু, আসলে, বাঙলা সাহিত্যের প্রতি মমতাপ্রেরিত। মূল চিঠিটাই তুলে দিচ্ছি :

February 10/26,
Villa Olga.

Dear Mr. Das,

I did not thank you sooner for the books you sent to my brother and to me with such kind messages inscribed, on them, because—as I wrote to Dr. Nag last month, I wanted to peruse at least part of their contents before acknowledging your gift.

In spite of my limited knowledge of your language I was able to understand and enjoy fully the stories I read in your মাটির নেশা. Of course I may have missed many a nice shade and I do not pretend to judge the literary merit of the style ! But I can appreciate the *substance* of them. And পার্বত্যর piety and motherly love for the foundling, the poor cobbler হুলাল's misfortunes in the city, the domestic scenes in the story কমল মধু awoke in me a twofold interest : making me once more aware of the oneness of human nature and setting up before my western eyes a vivid picture of Eastern customs of every day life.

I thank you too for Gokulchandra Nag's works. I was deeply moved by মাদুরী. But I shall write later on to his brother about it.

I want also to tell you in my brother's name and my own, how much we appreciate the gallant effort of কল্লোল. My wish is to grow more able to follow closely what it publishes (I am still a slave to my dictionary and plod on wasting much precious time) so that I may deserve at last a small part of the praise Dr. Nag gave me in the পৌষ number and of which I am quite unworthy.

Sending you my brother's best greetings, you, dear Mr. Das, most sincerely.

Yours,
MAUDLINE ROLLAND.

চিঠিটার মধ্যে লক্ষিতব্য বিষয় হচ্ছে, বাংলা কথাগুলো ভাঙা-ভাঙা বাংলা হরফে লেখা।

তেমনি চিঠি লিখল জাসিস্তো বেনাভাতে, যোগান বোয়ার আর কুট হামসুনের পক্ষে তাঁর জী। চিঠিগুলো অবিশিষ্ট মামুলি—সেটা বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে তাঁদের সৌজন্য, তাঁদের মিত্রতার স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতিতেই তাঁরা মূল্যবান।

Mr. Dinesh Ranjan Das,
Dear Sir,

Thank you with all my heart for your letter. I send you the photo you ask for. Some of my works are published in America (English translation) but I have not the volumes.

My best salutation to your friends and believe yours

JACINTO BENAVENTE.
Madrid, Spain 6/25.

Hvalstad, 2-4-25 (Norway).

To

Kallol Publishing House
and
my friends in Calcutta.

It is with the greatest pleasure I have lately received your

greetings. Please accept my best wishes and my fraternal compliments.

Sincerely,
JOHAN BOJER

Grimstad, Norway.

Dear Sir,

My husband asks me to thank you very much for the friendly letter.

Respectfully yours,
MRS. KNUT HAMSUN.

উপরের তিনটি চিঠিই ইংরিজিতে লেখা—স্বহস্তে। একমাত্র রম'্যা বলাই পরভাষায় লেখেন না দেখা যাচ্ছে। আর রবার্ট ব্রিজেন-এর পক্ষ থেকে পাওয়া গেল এই চিঠিটা :

Chilswell,
Boar's Hill,
Oxford, July 15.

Dear Sir,

I write at Mr. Robert Bridges' request to send you in response to your letter of June 18 a photograph.

He also suggests that I should send you a copy of the latest tract brought out by the *Society of Pure English*, which he thinks will interest the Group that you write of.

Yours faithfully,
M. M. BRIDGES

কিন্তু এইচ জি ওয়েলসের চিঠিটা সারবান। সোনার অক্ষরে বাঁধিয়ে রাখার মত।

Eston Glebe,
Dunmow

Warmest greetings to your friendly band and all good wishes to *Kallol*. An Englishman should be a good English-

man and a Bengali should be a good Bengali but also each of them should be a good world citizen and both fellow workers in the great Republic of Human Thought and Effort.

Feb. 14th, 1925

H. G. WELLS

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মাগ-বয়েগ্যকেই অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। উপরিউক্তরা ছাড়া অবশিষ্টগণ কেউ হয়তো পাননি চিঠি, কেউ হয়তো বা উপেক্ষা করলেন। কিন্তু সব চেয়ে প্রাণ স্পর্শ করল ইয়োন নোগুচি। সোজা-সুজি কবিতা পাঠিয়ে দিলে একটা। হৃদয়ের ব্যাকুলতার উত্তরে হৃদয়ের গভীরতা। কবিতাটি ইংরিজিতে লেখা—মূল না অহুবাদ বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু কবিতাটি অপূর্ণ।

I followed the Twilight :

I followed the twilight to find where it went—

It was lost in the day's full light.

I followed the twilight to find where it went—

It was lost in the dark of night.

Last night I wept in a passion of joy

To-night the passion of sorrow came

O light and darkness, sorrow and joy,

Tell me, are ye the same ?

YONE NOGOCHI

কালিদাস নাগ “কল্লোলের” জ্যেষ্ঠতুল্য ছিলেন—শুধু গোকুলের অগ্রজ হবার সম্পর্কেই নয়, নিজের স্নেহবলিষ্ঠ অভিভাবকত্বের গুণে। অনেক নিপদে নিজে বুক এগিয়ে দিয়েছেন। যখনই নৌকো ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে, হাল তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। ঘোরালো মেঘকে কি করে হাওয়া করে দিতে হয় শিথিয়ে দিয়েছেন সেই মধুময়। দুঃখের মধ্যে নিজে মাতুষ্য হয়েছেন বলে শিথিয়ে দিয়েছেন সেই কুজ্জ্বলিতকুজ্জ্ব, বাধাকে বশীভূত করার তপঃপ্রতাপ। নিজে লেখনী ধরেছেন “কল্লোলের” পৃষ্ঠায়—শুধু স্বনামে নয়, দীপকরের ছদ্মনামে। দীপকরের কবিতা দীপোজ্জ্বলা।

সব চেয়ে বড় কাজ তিনি কল্লোলের দলকে “প্রবাসী”তে আসন করে

দিলেন। সংকীর্ণ গিরিসংকট থেকে নিয়ে গেলেন প্রশস্ত রাজপথে। তখনকার দিনে “প্রবাসী”ই বাংলা সাহিত্যের কুলীন পত্রিকা, তাতে জায়গা পাওয়া মানেনি জাতে ওঠা, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বা দক্ষিণার খুদকণা। আমাদের তখন কলা বেচার চেয়ে রথ দেখাই বড় কাম্য। কিন্তু দেখা গেল রথের বাহকরা আমাদের উপর ভারি খাঙ্গা। কিন্তু কালিদাসবাবু দমলেন না—একেবারে রথের উপরে বসিয়ে ছাড়লেন।

ওদিকে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল “ভারতবর্ষ”—কাঁটতির জনশ্রুতি পরিষ্কার। আশাতীতরূপে সেখানে একদিন ডাক দিলেন জলধর সেন। সর্বকালের সর্ব-বয়সের চিরন্তন দাদা। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বলে কোনো ভীক সংস্কার তো নেইই বরং যেখানে শক্তি দেখলেন সেখানেই স্বীকৃতিতে উদার-উচ্ছল হয়ে উঠলেন। শুধু পত্রিকায় জায়গা করে দেয়া নয় একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। মুঠো ভরে শুধু দক্ষিণা দেয়া নয়, হৃদয়ের দক্ষিণা দেয়া। প্রণাম করতে গিয়েছি, হুঁহাত দিয়ে তুলে ধরে বুকের মধ্যে পিষে ধরেছেন। এ মামুলি কোলাকুলি নয়—এ আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বাধন। একজন রায়বাহাদুর, প্রখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক, সর্বোপরি কৃতার্থস্বগ্র সাহিত্যিক—অথচ অহংকারের অবশেষ নেই। ছোট বড় কৃতী-অকৃতী—সকলের প্রতি তাঁর অপক্ষপাত পক্ষপাতিত্ব। বাংলা সাহিত্যের সংসারে একমাত্র জলধর সেনই অজাতশত্রু।

গ্রীষ্মের হুপুয়ে ভারতবর্ষের আপিসে খালি গায়ে হাঁজচেয়ারে শুয়ে আছেন, মুখে অর্ধদণ্ড চুফট, পাশে টেবিল-ক্যান চলছে—এই মূর্তিটিই বেশি করে মনে আসছে। তাঁকে চুফট ছাড়া দেখেছি বলে মনে পড়ে না—আর সে চুফট সর্বদাই অর্ধদণ্ড। সম্পাদকের লেখা প্রত্যেকটি চিঠি তিনি স্বহস্তে জবাব দিতেন—আর সব চেয়ে আশ্চর্য, ছানিকাটানো চোখেও প্রফ দেখতেন বর্জাইস টাইপের। কানে খাটো ছিলেন—সে শ্রবণশক্তির নানারকম মজার গল্প প্রচলিত আছে—কিন্তু প্রাণে খাটো ছিলেন না। প্রাণে অপরিমেয় ছিলেন।

হয়তো গিয়ে বললাম, ‘আমার গল্পটা পড়েছেন?’

জলধরদাদা উত্তর দিলেন : ‘কাল লালগোলায় গিয়েছিলুম।’

‘কেমন লাগল গল্পটা?’

‘হরিদাসবাবু? নিচেই আছেন—দেখলে না উঠে আসতে?’

‘যদি টাকাটা—’

‘ভারতবর্ষ ? কাল বেরুবে।’

চৈচিয়ে বলছিলুম এতক্ষণ যাতে সহজে শোনেন। হঠাৎ গলা নামালুম, কর্ণধর ক্ষীণ করলুম, আর, আশ্চর্য, অমনি শুনতে পেলেন সহজে। খবর পেলুম গল্প পড়া ছাড়া ছাপা শেষ হয়ে গেছে। কাল কাগজ বেরুবে তা বেরোক, আজ যখন এসেছ আজকেই টাকাটা নিয়ে যাও।

জলধরের মতই শ্রামস্তিক। বর্ষার জল শুধু সমুদ্র-নদীতেই পড়ে না, দরিদ্রের খানা-ডোবাতেও পড়ে। অকিঞ্চনতমও নিমন্ত্রণ করলে বয়সের শত বাধাবিল্ল অতিক্রম করে জলধরদাদা সর্বাগ্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন—সে কসবাতেই হোক বা কালীপুরেই হোক। মনে আছে, বেহালায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবিবাসরের সন্ধ্যায় জলধরদাদা এসেছেন। সেখানে হঠাৎ এক প্রতিবেশী তত্ত্বলোক এসে উপস্থিত—জলধরদাদাকে ‘মাস্টারমশাই’ সম্বোধন করে এক শ্রদ্ধাপূত প্রণাম। কোন সূদূর অতীতে শিক্ষকতা করেছিলেন, তবু জলধরদাদা প্রাক্তন ছাত্রকে চিনতে পারেন। চিনতে পারল তাঁর চক্ষু তত্ত্ব নয় যত তাঁর প্রাণ। পরের বাড়িতে বসে ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না জলধরদাদা। তাই পরদিন আবার বেহালায় সেই ছাত্রের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন নিরিবিবি।

কুড়ি

আমাদের পূর্বাগতদের প্রায় সকলেরই স্পর্শ পড়েছিল “কল্লোলে”। “ভারতী”র দল বলতে যাদেরকে বোঝায় তাদেরই মুখপাত্রদের। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাক্ষর আতখী, নরেন্দ্র দেব। বিখ্যাত “বারোয়ারী” উপন্যাসের গৌরবদীপ্ত পরিচ্ছেদ। সৌরীন্দ্রমোহন ও নরেন্দ্র দেব উপন্যাস লিখেছেন “কল্লোলে”, হেমেন্দ্রকুমার কবিতা আর প্রেমাক্ষর গল্প। পুরোনো চালে ভাত বাড়ে তারই আকষণে ও-সব ভাণ্ডারে মাঝে-মাঝে হাত পাততো দীনেশরঞ্জন, স্বজন-পালনের খাতিরে ওঁরাও কার্পণ্য করতেন না, অব্যাহত হতেন। তবু “কল্লোলে” ওঁদের লেখা প্রকাশিত হলেও ওঁদের লেখায় “কল্লোল” প্রকাশিত হয়নি।

সবার চেয়ে নিকট ছিলেন নরেন্দ্র। প্রায় জলধরদাদারই দোসর, তাঁরই

মত সৰ্বতোভদ্র, তাঁৰই মত নিঃশঙ্ক। আর-আরয়া কল্লোল-আপিসে কদাচিৎ আসতেন, কিন্তু নৱেনদাকে অমনি কালে-ভজ্জের ঘৰে কেলা যায় না। প্ৰেমান্তৰ আতৰ্ণী, ওৱফে বুড়োদা, খুব একজন কইয়ে-বইয়ে লোক, ফুঁতিবাজ গল্পে, হেমেদা আবার তেমনি গন্তীয়, গন্তীয়সংখ্যারী। মাঝখানে নৱেনদা, পৰিহাস-প্ৰসঙ্গ, যে পৰিহাস সৰ্ব অবস্থায়ই মাধুৰ্যমাজিত। “কল্লোলে” প্ৰকাশিত তাঁৰ উপন্যাসে তিনি এক চমকপ্ৰদ উক্তি কৰেন। ঠিক তিনি কৰেন না, তাঁৰ নায়ককে দিয়ে কৰান। কথাটা আসলে ‘নিৰ্দোষ নিরীহ, কিন্তু সমালোচকরা চমকে ওঠে বলেই চমকপ্ৰদ। “Cousins are always the best targets.” সমাজ-তত্ত্বের একটা মোটা কথা, যার বলে বৰ্তমানে হিন্দু বিবাহ-আইন পৰ্যন্ত সংশোধিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু সেকালে ঐ সৰল কথাটাই সমালোচকের বিচাৰে অশ্লীল ছিল। যা কিছু চলতি মতের পক্ষী নয় তাই অশ্লীল।

“শনিবারের চিঠি” প্ৰতি মাসে ‘মণিমুক্তা’ ছাপত। খুব যত্ন কৰে আহৰণ কৰা রত্নাবলী। অৰ্থাৎ কোনখানে কোথায় কি বিকৃতি পাওয়া যায় তাই বেছে বেছে কুড়িয়ে এনে সাজিয়ে-গুছিয়ে পৰিবেশন কৰা। বেশিৰ ভাগই প্ৰসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন, খাপছাড়া ভাবে খানিকটা শিথিল উদ্ধৃতি। তাই ও-সবকে শুধু-মণি না বলে মধ্যমণিও বলা চলে। একখানা “কল্লোল” বা “কালিকলম”, “প্ৰগতি” বা “ধূপছায়া” কিনে কি হবে, তাৰ চেয়ে একখানা “শনিবারের চিঠি” কিনে আনি। এক খালার বহু ভোজ্যৰ আশ্বাদ ও আত্মাণ পাব। সঙ্গে সঙ্গে বিবেককেও আশ্বাস দিতে পায়ব, সাহিত্যকে শ্লীল, ধৰ্মকে খাটি ও সমাজকে অটুট রাখবার কাজ কৰছি। একেই বলে ব্যবসায় বাহাদুৰি। বিষ যদি বিবেক ওবুধ হয়, কণ্টক যদি কণ্টকের, তবে অশ্লীলতার বিৰুদ্ধে অশ্লীলতাই বা ব্যবহার কৰা যাবে না কেন? আর কে না জানে, যদি একটু ধৰ্মের নাম একটু সমাজস্বাস্থ্যের নাম ঢোকানো যায় তবে অশ্লীলতাও উপাদেয় লাগে।

এই সময় “হসন্তিকা” বেৰোয়। উত্তোক্তা “ভাৰতী”র দলের শেষ রথীয়া। স্তনতে মনে হয় হাসিৰ পত্ৰিকা, কিন্তু হসন্তিকাৰ আসল অৰ্থ হচ্ছে ধুহুচি, অগ্নিপাত্ৰ। তাৰ মানে, সে হাসাবেও আবার দগ্ধও কৰবে। অৰ্থাৎ এক দিকে “শনিবারের চিঠিকে” ঠুকবে অল্প দিকে আধুনিক সাহিত্যের পিঠ চাপড়াবে। মতলব যাই থাক ফল দাঁড়াল পানশে। “শনিবারের চিঠি” তুলনায় অনেক জোৰো আর হালকা। অত জোৰাজোৰো নয়ই, অমন নিৰ্জলাও নয়।

“শনিবারের চিঠির” মণিমুক্তার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করছে “হসন্তিকা” :

“আমরা সখের মেথর গো দাদা, আমরা সখের মূর্দফরাস
মাথায় বহিয়া ময়লা আনিয়া সাজাই মোদের ঘরের ফরাস ।
শকুনি গৃধিনী ভাগাড়ের চিল, টেকা কে দেয় মোদের সাথ ?
যেখানে নোংরা, হৌ যারিয়া পড়ি, তুলে নিই অবা ভরিয়া হাত ।
গলা ধসে যত বিকৃত জিনিস কে করে বাছাই মোদের মতো ?
আমরা জহুরি পচা পকের যাচাই করা তো মোদের ব্রত !
মোদের ব্যাসাতি ময়লা-মাণিক আস্তাকুড় যে ক্ষেত্র তার,
নর্দমা আর পগার প্রভৃতি লয়েছি কায়েমী ইজারা তার !”

আর যাই হোক, খুব জোরদার ব্যঙ্গ কবিতা নয়। আর প্রত্যুত্তরে
“শনিবারের চিঠির” ব্যঙ্গ হল কবিতাটাকেই মণি-মুক্তার নথিভুক্ত করা।

বুদ্ধদেবের চিঠি :

“তোমার চিঠিখানা পড়ে ভারি আনন্দ হল। এক একবার নতুন করে
প্রগতির প্রতি তোমার যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাই—আর বিশ্বাসে ও
আনন্দে মনটা ভরে যায় ! আমরা নিজেরা দু’চারজন ছাড়া প্রগতিকে এমন
গভীরভাবে কেউ cherish করে না একথা জোর করে বলতে পারি। প্রথম
যখন প্রগতি বার করি তখন আশা করিনি তোমাকে এতটা নিকটে পাওয়ার
সৌভাগ্য হবে।

চিঠিতেই প্রায় one-third গ্রাহক ছেড়ে দিয়েছে, ভি পি তো হবে
পাঠালাম—ক’টা ফেরৎ আসে বলা যায় না। আরম্ভ মোটেই promising
নয়। তবু একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই বোধহয়। নতুন গ্রাহকও
দু’চারজন করে হচ্ছে—এ পর্যন্ত চারজনের টাকা পেয়েছি—আরো অনেকগুলো
promise পাওয়া গেছে। মোটমোট গ্রাহক-সংখ্যা এবার বাড়বে ব’লেই আশা
করি—গত বছরের সংখ্যার অন্তত দেড়গুণ হতে বাধ্য শেষ পর্যন্ত। তা ছাড়া
advt. ও বেশ কিছু পাওয়া যাচ্ছে। ও বিজ্ঞাপনটা নরেন দেব দিয়েছেন—ওঁর
নিজের বইগুলোর। আগে ইচ্ছে ছিল বিনি পয়সায় ছাপানোর—পরে মাসে
পাঁচ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। মন্দ কি ?

হসন্তিকা পড়েছি। তুমি যা বলেছ সবই ঠিক কথা। এক হিসেবে

শনিবারের চিঠির চাইতে হৃদয়ঙ্গম করে নিকট ধরনের কাগজ হয়েছে। শনিবারের চিঠি আর যা-ই হোক sincere—ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু হৃদয়ঙ্গমকার এই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসার প্রবৃত্তিটা অতি জঘন্য। কিছু না বুঝে এলোপাখাড়ি বাজে সমালোচনা—কতখানি মানসিক অধঃপতন হলে যে এ সম্ভব জানিনে। তার ওপর, আগাগোড়া ওদের patronising attitudeটাই সব চেয়ে অসহ্য। আমাদের যেন অভ্যস্ত কুপার চোখে দেখে! এর চেয়ে শনিবারের চিঠির sworn enmity অনেক ভালো অনেক সুসহ।”

হাসির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় দা-ঠাকুরকে। দা-ঠাকুর মানে শরৎ পণ্ডিত মশাই। যিনি কলকাতাকে ‘কেবল ভুলে ভরা’ দেখেছেন—সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো জগৎ-সংসারকেও। ‘নিমন্তলার ঘাটের নিমগাছটা’র কথা যিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অবিরত। মাঝে-মাঝে আসতেন কল্লোলের দোকানে। কথার পিঠে কথা বলার অপূর্ব দক্ষতা ছিল, আর সে সব কথার চাতুরী যেমন মাদুরীও তেমনি। তাঁর হাসির নিচে একটি প্রচ্ছন্নদর্শন বেদনা ছিল। যে-বেদনা জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন দর্শনে। খালি গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে আসতেন। প্রচণ্ড শীত, খালি গায়ে উপরে তেমনি একখানি পাতলা চাদর দা-ঠাকুরের। কে যেন জিগগেস করল আশ্চর্য হয়ে, এই একটা সামান্ত চাদরে শীত মানে? ট্যাক থেকে একটা পয়সা বার করলেন দা-ঠাকুর, বললেন, ‘পয়সার গরম!’

চৌষটি দিন রোগভোগের পর তাঁর একটি ছেলে মারা যায়। যেদিন মারা গেল সেইদিনই দা-ঠাকুর “কল্লোলে” এলেন। বললেন, ‘চৌষটি দিন ড় রেখেছিলাম, আজ গোল দিয়ে দিলে।’

রাধারাণী দেবী “কল্লোলে” লিখেছে—তিনি কল্লোল যুগেরই কবি। ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যার কবিতায় বিপ্লব আভাস হয়েছে। তখনো তিনি দত্ত, দেবদত্ত হননি। এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাগৃহে আধুনিক সাহিত্যের যে বিচার-সভা বসে তাতে ফরিদাঙ্গী পক্ষে প্রথম বক্তা রাধারাণী। সেদিনকার তাঁর সেই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়।

হেমেন্দ্রলাল রায় ঠিক ভারতীয় যুগে পড়েন না, আবার “কল্লোল”—এরও দল-ছাড়া। তবু কল্লোল-আপিসে আসতেন আচ্ছা দিশে। স্বভাবসম্মত সৌজন্দ্যে সকলের সঙ্গে মিশতেন সত্যার্থের মত। “কল্লোল” যখন মাঝে-মাঝে বাইরে চড়াইভাতি করতে গিয়েছে, হয় বোটানিক্সে নয় তো কৃষ্ণনগরে, নজরুলের বা আকবরুলের বাড়িতে, তখন হেমেন্দ্রলালও লক্ষ নিয়েছেন। উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে

ছিলেন না কিন্তু আনন্দে-আহ্লাদে ছিলেন। হৈ-হল্লাতে সামর্থ্য না থাকলেও সমর্থন ছিল। উন্মুক্ত মনের মিজভা ছিল ব্যবহারে।

কল্লোল-আপিসে একবার একটা খুব গম্ভীর সভা করেছিলাম আমরা। সেই ছোট, ধন, মায়াময় ঘরটিতে অনেকেই একত্র হয়েছিল সেদিন। কালিদাস নাগ, নরেন্দ্র দেব, দীনেশরঞ্জন, মুরলীধর, শৈলজা, প্রেমেন, সুবোধ রায়, পবিত্র, নূপেন, ভূপতি, হরিহর এবং আরো কেউ-কেউ। সেদিন ঠিক হয়েছিল “কল্লোলকে” ঘিরে একটা বলবান সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ প্রেরণা ও বৃহৎ প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য শ্রীম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। একটা কিছু বড় রকমের সৃষ্টি, বড় রকমের প্রজ্ঞা। সমস্ত বাধা বিপদ ও বার্ষ বিতর্ক উপেক্ষা করে একাগ্রসাধন।

দেখি সে সভায় কখন হেমেন্দ্রলাল এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিঃশব্দে রয়েছেন কোণ ঘেঁষে। হেমেন্দ্রলাল “কল্লোলের” তেমন লোক থাকে কল্লোলের সভার নিয়ন্ত্রণ না করলেও যোগ দিতে পারেন অনায়াসে।

যনে আছে সেদিনের সেই সভার চৌহদ্দিটা মিজভার মাঠ থেকে ক্রমে-ক্রমে অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে ছোট করে আনা হয়েছিল। দীনেশদাকে ঘিরে সেদিন বসেছিলাম আমরা ক’জন। স্থির করেছিলাম, সাহিত্যিক সিদ্ধিও যোগজ সিদ্ধি—কেউ তাই বিয়ে করব না। অনন্তচেতা হয়ে বহুপদ্যাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব। শুধু তাই নয়, থাকব একসঙ্গে, এক ব্যারাকে, এক হাঁড়িতে! সকলের আয় একই লক্ষীর ঝাঁপিতে জড়ো হবে, দর বুঝে নয় দরকার বুঝে হবে তার সমান বাঁটোয়ারা। সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন করব।

নূপেন তো প্রায় তখনি ব্যারাকের জায়গা খুঁজতে ছোটো। প্রেমেন গ্রাসের পক্ষপাতী। দীনেশদা বললেন, যেখানেই হোক, নদী চাই, গঙ্গা চাই।

সুরতরঙ্গিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা।

এই সময়কার চিঠি একটা দীনেশদার :

“আমরা কি প্রত্যেকদিন ভাবি না, আমি শ্রান্ত ক্লান্ত, আর পারি না। অধচ আমরাই শ্রান্তিকে অবহেলা করে শান্তি লাভ করি।

সর্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের—এ সবগুলিকে একাগ্র ও একায়ত্ত করে নিতে হবে। আমাদের ‘আমাকে’ স্বীকার করতে হবে। নিজেকে পূর্ণ করে নিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলে আমাদের তৃপ্তি হয় না, সন্তোষ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব বলেই এই অসীম শক্তি নিয়ে এসেছি। আমরা কে? আমরা তারা

যারা রণোন্মত্ত বীরের মত উন্মুক্ত অসি নিয়ে মরণকে আহ্বান করে না—তারা, যারা অসীম ধৈর্য ও করুণায় অক্ষয় শক্তি ও আনন্দ নিয়ে মৃত্যুকে বরাভয় দেয়। আমরা অভয়—অভয়া সন্তান। অমর বলে আমরা বলীয়ান—আমরা এক—বহুর অল্পপ্রেরণা। আমরা হর্বলের ভরসা—দুর্যোধনের ভীতি। মহা-রাজোৎসবের অমৃতলোকের রথী আমরা—আমরা তাঁর কিঙ্কর-কিঙ্করী নই।

অবসাদ-অভিমান আমাদের আসে, কিন্তু সকলকে তাড়িয়ে নয়, এ সকলকে ঘাড়ে করে উঠে দাঁড়াই আমরা। যত দুর্বার পথ সামনে পড়ে তত দুর্জয় হই। তাই নয় কি? আমরা যে এসেছিলাম, বেঁচেছিলাম, বেঁচে থাকবও—এ কথা পৃথিবীকে স্বীকার করতে হয়েছে, করতে হচ্ছে, হবে-ও।

ছিন্নভিন্ন এই হৃদয় আমাদের সাতখানে ছুটে বেড়ায়। এই ছোট্টার মধ্যেই আমরা সত্যের সন্ধান পাই। সত্যের যুগয়া করে আমাদের মন আবার ধ্যান-লোকে ফিরে আসে। আমরা হাসি-কাদি, জীবনকে শতধা করে আমরাই আবার ভাঙা হাড় জোড়া লাগাই। এই ভাবটাই আমার আজকের চিন্তা, তোমাকে লিখলাম। প্রকাশের অক্ষমতা মার্জন্য করো।

চারদিকে প্রলয়ের মেঘ, অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে ব’সে আছি, তবু মনে হয়, আশুক প্রলয়, তার সহস্র আক্রোশের শেষ পাওনাও তো আমার।

সকলে ভাল। আজ বিদায় হই। তোমরা খবর দিও। জেগে ওঠ, বেঁচে ওঠ, হেঁইয়ো বলে ভেড়ে ওঠ—দেখবে কাঁধের বোঝা বুকে করে চলতে পারছ।
D. R.”

কিছুকাল পরে বুদ্ধদেবের চিঠি পেলাম :

“হঠাৎ বিয়ে করা ঠিক করে ফেললে যে? আমার আশঙ্কা হয় কি জানো? বিয়ে করে তুমি একেবারে তৈলশিদ্ধ সাধারণ ঘরোয়া বাঙালী না বনে যাও। ‘গৃহশান্তিনিকেতনের’ আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু সেটা পাখিব—এবং কবিপ্রতিভা দৈব ও শতবর্ষের তপস্শ্রাব ফল। বাধা পড়ার আগে এই কথা ভালো করে ভেবে নেবে তো?”

“কল্লোলে” আসবার আগেই হেমেন্দ্রলালের দেখা পাই। প্রেমেন আর আমি দু’জনে যুক্তভাবে প্রথম উপন্যাস লিখছি। কাঁচা লেখা বলেই বইয়ের নাম ‘বাকালেখা’ ছিল তা নয়, জীবনের যিনি গ্রন্থকার তিনিই যে কুটিলাক্ষর—ছিল এমন একটা গভীর বক্রোক্তি। তখন হেমেন্দ্রলালের সম্পাদনায় “মহিলা” নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুত, শৈলজা আমাদের নিয়ে গেল সেখানে।

শৈলজার উপভাস ‘বাংলার মেয়ে’ ছাপা হচ্ছিল “মহিলায়”—সেটা শেষ হইতেই শুক হয়ে গেল ‘বাঁকালেখা’। ক্রমে বইটা গ্রন্থাকারিত হল। মূলে সেই হেমেন্দ্রলালের সহযোগ।

মেসবদিন নায়ক-নায়িকার জন্মপত্রের ছক কেটে-কেটে আমাদের দিন যেত—প্রেমেনের আর আমার। কোন কক্ষে কোন চরিত্রের স্থিতি বা সঞ্চার এই নিয়ে গবেষণা। বাড়িতে বৈঠকখানা থাকবার মত কেউই সম্ভ্রান্ত নয়, তাই কালিঘাটের গঙ্গার ঘাটে কিংবা হরিণ পার্কের বেঞ্চিতে কিংবা এমনি রাস্তায় টহল দিতে দিতে চলত আমাদের কুটুর্ক। যত লিখতাম তার চেয়ে কাটাকুটি করতাম বেশি—আর যদি একবার শেষ হল, গোটা বই তিন-তিনবার কপি করতেও পেছ-পা হলাম না। প্রথম উপভাস ছাপা হচ্ছে—সে উৎসাহ কে শাসন করে!

কিছু টাকা-কড়ি পাব এ আশাও ছিল হয়তো মনে মনে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত তা আর হাতে এল না, হাওয়াতে মিলিয়ে গেল।

এমনি অবাধ্য প্রত্যেকের পায়ে-পায়ে ফিরেছে। সাপের নিঃশ্বাস ফেলেছে স্তব্ধতায়। হাঁড়ি চাপিয়ে চালের সন্ধানে বেরিয়েছে—প্রকাশক বলেছে, কেটে-ছেটে ছোট করুন বই, কিংবা হয়তো বায়না ধরেছে কেনিয়ে-কাপিয়ে ফুলিয়ে তুলুন। আয়ের স্থিরতা না থাকলে কাম্যকর্মে ধৈর্য আসবে কি করে? অব্যবস্থ মন কি করে একাগ্র হবে? সর্বক্ষণ যদি দারিদ্র্যের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া থাকে তবে সর্বানন্দ সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় বা সংগঠনের সাক্ষ্য?

শৈলজা খোলা বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রফ দেখেছে। নূপেন টিউপানি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে। আর-আররা কেউ নির্বাক যুগের বাস্তবক্ষেপে টাইটেল তজমা করেছে, রাজানহারাজার নামে গল্প লিখে দিয়েছে, কখনো বা হোমরাচোমরা কারুর সভাপতির অভিভাষণ। যত বকমের ওচা মামলা। যদি সূদিনের দেখা পাই—যদি মনের মুক্ত হাওয়ায় এসে গভীর উপলব্ধির মৌনে সত্যিকারের কিছু সৃষ্টি করতে পারি একদিন।

বুদ্ধদেবের একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

“এখানে কিছুই যেন করবার নেই—সন্ধ্যা কি করে কাটবে এ সমস্তা বোজ নতুন বিভীষিকা আনে। সন্ধ্যা যে যার কাজে ব্যস্ত : এমন কি টুহুও পরীক্ষা নিয়ে লেগেছে। প্রথমত, টাকা নেই। রাত নটা-নাগাদ বাড়ি ফিরি—দেখি

সমস্ত পাড়াটাই নিঃকাম হয়ে গেছে ;—অঙ্ককার একটা ঘর ; নিজহাতে আলো জ্বালাতে হয়,—ঠাণ্ডা ভাত, ঠাণ্ডা বিছানা । কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি যেন পাগল হয়ে গেছি । ঘুমের ঘোরে চোঁচিয়ে উঠেছিলাম ;—পরে জেগে, বতরুণ আমার ঘুম না এল ভাবি ভয় করতে লাগলো । যা নেই, সেইজন্যই বোধহয় এত বেশি খারাপ লাগছে । নিজের হাতে চা তৈরি করতে হয়, সেইটে একটা torture, এদিকে আবার প্রেস সোমবারের মধ্যে নিদেন একশো টাকা চেয়েছে, —ওদের দোষ নেই, অনেকদিনের পাওনা, মোট ১৮০ টাকা । এতদিন কোনোমতে আজ-কাল করে চালিয়ে আসছি ;—এবারে না দিতে পারলে credit থাকবে না । কাগজের দোকানো চের পাবে ; এমাসের কাগজ নগদ দাম ছাড়া আনা যাবে না । কি করে যে টাকার যোগাড় হবে কেউ জানে না । নিষ্কৃতির সহজ পন্থা হচ্ছে প্রগতির মহাপ্রয়াণ ;—কিন্তু প্রগতি ছেড়ে দেবো, এ কথা ভাবতেও আমার সারা মন যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে । প্রগতির অভাব যেন প্রিয়ার বিরহের চেয়েও শত লক্ষ গুণে মর্মান্তিক ও দুঃসহ । এক-মাত্র উপায়—ধার ;—কিন্তু আমাকে কে ধার দেবে ? মার এমন কোনো গয়না-টয়নাও নেই যা কাজে লাগাতে পারি ;—যা ছিলো আগেই গেছে । তবু চেষ্টার ক্রটি করবো না, কিন্তু কোথাও পাবো কি-না, আমার এখন থেকেই সন্দেহ হচ্ছে । শেষ পর্যন্ত কি যে হবে, তা ভাবতেও আমার গা কালিয়ে আসে । যাক—এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারলাম কিনা, পরের চিঠিতেই জানতে পাবে ।

এই বিবাদ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে এক-এক সময় হচ্ছে করে ভয়ানক desperate একটা কিছু করে ফেলি—চুরি বা খুন বা বিয়ে ! কিন্তু হায় ! সেটুকু সৎসাহসও যদি থাকতো !”

প্রবোধ যখন “কল্লোলে” এল তখন “কল্লোল” আরো জমজমাট হয়ে উঠল । গায়নে-বায়নে জুটল এসে আরেক ওস্তাদ । ছিল আটচল্লিশ, একের যোগে হয়ে দাঁড়াল উনপঞ্চাশ বায়ু । তেমনি খেয়াল-খুশিতে ভেসে-আসা হাওয়া, তেমনি ছন্দ-ছাড়া, তেমনি নিকিঞ্চন । দলে পুরু হয়ে উঠলার । এক মুহূর্তও মনে হল না প্রবোধ চার বৎসর অস্থপস্থিত ছিল—এক মুহূর্তে এমনি আপন হবার মতন সে আপনজন । স্বাস্থ্যে ও স্মৃতিতে টগবগ করছে, কলমের মুখেও সেই আগুনের হলকা । এমন দরাজ মনে কাউকে হাসতে শুনি নি উচ্চরোলে । কত দিন যে শুধু হাসব বলে ওকে হাসিয়েছি তার ঠিক নেই ।

সে হাসি হিসেব করে হাসে না, কোনো কিছু লুকিয়ে রাখে না মনের মধ্যে । এক ধাক্কা মনের জানলা-কপাট খুলে দেয় । প্রবোধের ঘরে তিলাব জ্বায়গা নেই, তবু যদি গিয়ে বসেছি, প্রবোধ, থাকব এখানে, তকুনি ও জ্বায়গা করে দিয়েছে । হৃদয়ের মধ্যে যার জ্বায়গা আছে তার ঘরের মধ্যেও জ্বায়গা আছে ।

আমার প্রথম একক উপন্যাসের নাম “বেদে” আর প্রবোধের “যাযাবর” । এই নিয়ে “শনিবারের চিঠি” একটা সুন্দর রসিকতা করেছিল । বলেছিল, একজন বলছে : বে দে, আর অমনি আরেকজন বলে উঠছে : যা যা বর । শোকটার বিষে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু সন্তা ছেড়ে চলে যে যাননি তাতে সন্দেহ কি । মুকুট না জুটুক, পিঁড়ি আঁকড়ে বসে আছে সে ঠিক ।

এক দিকে যত ব্যঙ্গ, অন্য দিকে তত ব্যঙ্গনা । মিথ্যার পাশ কাটিয়ে নয় মিথ্যার মূলোচ্ছেদ করে সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াও । পাখায় না গিয়ে শিকড়ে বাও, কৃত্রিম ছেড়ে আদিমে, সমাজের গায়ে যেখানে যেখানে সিন্ধের ব্যাঙেজ আছে তার পবিহাসটা প্রকট করো । যারা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, তাদেরকে বাঁচায় করে তোলো । নতুনের নামজাবি করো চারদিকে । কি লিখবে শুধু নয়, কেমন করে লিখবে, গঠনে কি সৌন্দর্য দেবে, সে সম্বন্ধেও সচেতন হও । ঘোলা আছে জল, স্রোতে-স্রোতে পারিপ্লব হয়ে যাবে । শুধু এগিয়ে চলো, সম্ভরণে সিন্ধুগমন অনিবার্য ।

ওরা যত হানবে তত মানবে আমাদের । চলো এগিয়ে ।

বস্তুত বিরুদ্ধ পক্ষের সমালোচনাও কম প্রয়োচনা জোগাত না । ভঙ্গিতে কিছু ত্বরা ও ভাষায় কিছু অসংযম নিশ্চয়ই ছিল, সেই সঙ্গে ছিল কিছুটা শক্তিময় স্বকীয়তা । প্রতিপক্ষ শুধু বোসাহুযিই কুড়িয়েছে, সার-শস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দেয়নি । নিন্দা করবার অধিকার পেতে হলে যে প্রশংসা করতেও জানতে হয় সে বোধ সেদিন তুলভ ছিল । এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠি লেখেন । সে চিঠি তেরোশ চৌত্রিশের মাঘ মাসের “শনিবারের চিঠিতে” ছাপা হয় । তার অংশবিশেষ এইরূপ :

“সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো । আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিরুদ্ধি উত্তেজনা পাচ্ছে । যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গির দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া

বিশেষতঃ ধাক্কা মেয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এ-তে বেড়েই যায়। তাই যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনো প্রাণদণ্ডের বিধান আছে, প্রাণহত্যাও খামচে না।

ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তে আর্টের দাবি আছে। শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অঙ্গশালায় তার স্থান—নব নব হাশ্বক্সপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বল' যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফবিহীন।

আর একটা কথা যোগ ক'রে দিই। যে সব লেখক বে-আক্ৰ লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংস করলে তাতে নিন্দা করবার অনিল্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।”

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথ নবযৌবনের ‘উদ্বোধন’ গাইলেন।

“বাধন ছেড়ার সাধন তাহার

সৃষ্টি তাহার খেলা।

দস্যুর মতো ভেঙে-চূরে দেয়

চিরাত্যাসের মেলা।

মূল্যহীনেরে সোনা করিবার

পরশ পাথর হাতে আছে তার,

তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে

উদ্ধত অবহেলা ॥

বলো ‘জয় জয়’ বলো ‘নাহি ভয়’—

কালের প্রয়াণ পথে

আসে নির্দয় নব যৌবন

ভাঙনের মহাপথে ॥”

এই ভাঙনের রথে আরো একজন এসেছিলেন—তিনি জগদীশ গুপ্ত। সতেজ-সজীব লেখক, বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখেছেন। বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও যেটা দোষ সেটাও এ

তাকণোর দোষ—হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার। কিন্তু আসলে যে তেজী তাকে কখনো দোষ অর্শে না। “তেজীস্যাং ন দোষায়।” যেখানে আগুন আছে সেখানেই আলো জলবার সম্ভাবনা। আগুন তাই অর্শনীয়।

জগদীশ গুপ্ত কোনো দিন কল্লোল-অপিনে আসেননি। মফস্বল শহরে থাকতেন, সেখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসে সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেননি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন। স্বস্থানসংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।

অনেকের কাছেই তিনি, অদেখা, হয়তো বা অল্পপস্থিত। নদী বেগধারাই ঝাঁক পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ। লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের মানুষ্যটি, চোখে বেশি পাওয়ারের পুরু চশমা, চোখের চাউনি কখনো উদাস কখনো ভীকু—মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু ঠোঁটের উপর কালো গৌফজোড়াটি বেশ জমকালো। “কালি-কলমকে” তিনি অফুরন্ত সাহায্য করেছেন গল্প দিয়ে, সেই সম্পর্কে মুরলীদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে দ্বন্দ্ব। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তার আরেক প্রমাণ।

বিখ্যাত ‘জাপান’-এর লেখক জুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পুরোপুরি ভারতীয় দেশের লোক। অথচ আশ্চর্য, পুরোপুরি কল্লোল-যুগের বাসিন্দে। একটি ভাগ্যবত সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী। “কল্লোল” বার হবার পর থেকেই “কল্লোলে” যাতায়াত করতেন। “কালি-কলম” বেঞ্চলে একদিন নিজের থেকেই সোজা চলে এলেন “কালি-কলমে”। আধুনিক সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তাঁর সক্রিয় সহায়ত্ব—কেননা—“কালি-কলমে” নিজেই তিনি ঐপন্থাস লিখলেন “চিত্রবহা”—তা ছাড়া নবাগতদের মধ্যে যখন যেটুকু শক্তির অভাব দেখলেন অভ্যর্থনা করলেন। চারদিকের এত সব জটিল-কুটিলের মধ্যে এমন একজন সহজ-সরলের দেখা পাব ভাবতে পারিনি।

সঙ্গে এল তাঁর বন্ধু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। কাগজী নাম আনন্দসুন্দর ঠাকুর। চেহারায় ও চরিত্রে সত্যিই আনন্দসুন্দর। অন্তর-বাহিরে একটি রুচির পরিচ্ছন্নতা। রসধন প্রবন্ধ লিখতেন মাঝে-মাঝে, প্রচ্ছন্নচারী একটি পরিহাস থাকত অন্তরালে। জীবনের গভীরে একটি শান্ত আনন্দ লালন করতেন তাঁর মুখকানি দেখলেই মনে হত। কিন্তু যখনই কল্লোল-অপিনে ঢুকতেন, মুখে একটি করুণ আতি কুটিয়ে শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে উঠতেন—সব বুঝি যায়!

‘সব বুঝি যায়!’ সে এক অপূর্ব স্লেষোক্তি। সেই বক্তোক্তিই অননুকারণীয়।
কথাটা বোধহয় “কল্লোলের” প্রতিই বিশেষ করে লক্ষ্য করা। সমালোচকের
যেটা কোপ তাকেই তিনি কাতরতায় রূপান্তরিত করেছেন।

কিছুই যায় না। সব ঘুরে-ঘুরে আসে। শুধু ভোল বদলায়।

কিন্তু কে জানত ভারতীয় দলের একজন প্রবীণ লেখকের উপন্যাসকে ক্ষমা
করে কালি-কলম-আপিসে পুলিশ হানা দেবে! শুধু হানা নয়, একেবারে
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। কার বিরুদ্ধে? সম্পাদক মুরলীধর বসু
আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগীর বিরুদ্ধে।
অপরাধ? অপরাধ অশ্লীল-সাহিত্য-প্রচার।

আমরা সার্চ করব আপিস। সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে। বললে জাল-পাগড়ি।
দুস্ত্র লেখাটা কি?

লেখা কি একটা? দুটো। স্বরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘চিত্রবৎস
আর নিরুপম গুপ্তর গল্প ‘শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে’। নিন, বার করুন সংখ্যাগুলো—
মনে মনে হাসলেন মুরলীদা। নিরুপম গুপ্ত! সে আবার কে?

নিরুপম গুপ্ত ছদ্মবেশী। চট করে তাঁকে চিনে ফেলতে সকলেরই একটু
দেয়ি হবে।

লেখকরাজ সামন্ত শৈলজার ছদ্মনাম। “কালি-কলমে” প্রকাশিত ত্য্য
গল্প ‘দিদিমণি’ আর প্রেমেনের গল্প ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ সম্বন্ধে কাশীর মহেন্দ্র
রায় আপত্তি জানান। তাঁর আপত্তি, লেখা দুটো অশ্লীল, প্রকাশ-অযোগ্য।
তেমনি তাঁর আপত্তি নজরুলের ‘মাধবী প্রলাপ’ ও মোহিতলালের ‘নাগাজুনের’
বিরুদ্ধে। এই নিয়ে মুরলীদার সঙ্গে পক্ষে দীর্ঘকাল তাঁর তর্কবিতর্ক হয়।
মুরলীদা বলেন, আপনার বক্তব্য শুঁচিয়ে প্রবন্ধ লিখুন একটা। মহেন্দ্র রায়
আধুনিক সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লেখেন। তার পালটা জবাব দেন সত্যসঙ্গ
সিংহ। সত্যসঙ্গ সিংহ ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছদ্মনাম।

শুধু প্রবন্ধ লিখেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না মহেন্দ্রবাবু। তিনি একটা গল্পও
লিখলেন। আর সেই গল্পই ‘শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে’।

এক ভাগ্যের রসিকতা! যিনি নিজে অসত্যতার বিরোধী তাঁরই লেখা
অশ্লীলতার দায়ে আইনের কবলে পড়বে!

ভাগ্যের রসিকতা আরো তৈরি হচ্ছে নেপথ্যে। নিন, আপনার দু’জনকে
—মুরলীধর বসু ও শিশিরকুমার নিয়োগীকে—গ্রেপ্তার করলাম। ভয় নেই,

নিয়ে যাব না দড়ি বেঁধে। আমার নিজের দায়িত্বে কয়েক ঘণ্টার জন্তে আপনাদের 'বেল' দিয়ে যাচ্ছি। কাল বেলা এগারোটার মধ্যে আপনারা হাজির হবেন লালবাজারে। ইতিমধ্যে শৈলজীবাবুকেও খবর দিন, তিনিও যেন কাল সঙ্গে থাকেন। ঠিক সময় হাজির হবেন কিন্তু, নইলে—বুঝছেনই তো—আচ্ছা, এখন তবে আসি।

কাছেই বেঙ্গল-কেমিক্যালের আপিসে সুরেশবাবু কাজ করতেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। তখুনি খানা-তল্লাসি আর গ্রেপ্তারের খবরটা নিজে লিখে দৈনিক বঙ্গবাণী আর লিবার্টি পত্রিকায় ছাপতে পাঠালেন।

আর মুরলীদা ছুটলেন কালিঘাটে, শৈলজাকে খবর দিতে।

সব বুঝি যায়!

একুশ

পরদিন সকালে মুরলীধর বহু আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লালবাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীতভয়সূদন শূলপাণিব নাম স্মরণ করতে-করতে।

প্রথমেই এক হোমগ্রাচোমবার সঙ্গে দেখা। বাঙালি, কিন্তু বাংলাতে যে কথা কইছেন এই নিতান্ত কুপাপরবশ হয়ে।

দেখতে তো সুধী-সজ্জনেব মতই মনে হচ্ছে। আপনাদেব এ কাজ?

'পড়েছেন আপনি?'

Darn it—আমি পড়ব ও সব গ্রাফি গ্যাং? কোনো রেসপেকটেবল লোক বাংলা পড়ে?

'তা তো ঠিকই। তবে আমাদেরটাও যদি না পড়তেন—'

আমরা পড়েছি নাকি গায়ে পড়ে? আমাদেরকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে পড়িয়ে ছেড়েছে। আপনাদেরই একুশ শাট। আপনাদেরই এক গোত্র।

'কে? কারা?'

সাহিত্যজগতের সব শূর-বীর, ধন-রত্ন—এক কথায় সব কেঁটবিটু। তাদের কথা কি ফেলতে পারি? নইলে এ সব দিকে নজর দেবার আমাদের ফুরসৎ কই? বোমা বারুদ ধরব, না, ধরব এসব কাগজের ঠোঙা?

পুলিশপুঞ্জব ব্যক্তির হাসি হাসলেন। পরে মনে করলেন, এ ভক্তটা যথার্থ হচ্ছে না। পরমহুর্তেই মেঘগভীর হলেন। বললেন, 'রবিঠাকুর শরণ চাটুজ্জৈ

নরেশ লেন চাক বাঁড়ুষো—কাউকে ছাড়ব না মশাই। আপনাদের কেসটার নিশ্চিন্তি হয়ে গেলেই ও-সব বড় দিকে খাওয়া করব। তখন দেখবেন—’

বিনয়ে বিগলিত হবার মতন কথা। গদগদ ভাবে বললেন মুরলীধর : ‘এ তে অতি উত্তম কথা। পিছুতে পিছুতে একেবারে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। তবে দয়া করে ঐ বড় দিক থেকে শুরু করলেই কি ঠিক হত না?’

‘না’। প্রবলপ্রবর হুংকার ছাড়লেন : ‘গোড়াতে এই এটা একটা টেস্ট কেস হয়ে থাক।’

রাঘববোয়াল ছেড়ে দিয়ে চিরকালই কি চুনোপুঁটিদের দিকে নজর? গাড়ির অধিপতিদের ছেড়ে সামান্য মুদ্দি-মনিহারি?

চালান হয়ে গেলেন পুলিশ-কোর্টে।

সতীশ্রসাদ সেন—আমাদের গোরাবাব—পুলিশ-কোর্টে উদীয়মান উকিল—জামিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মকদ্দমা জোড়াবাগান কোর্টে স্থানান্তরিত হল। তারিখ পড়ল শুনানির।

এখন কি করা!

প্রভাবান্বিত বন্ধু ছিল কেউ মুরলীধরের। তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন ‘বলোঁ তো, তাকে সাধুকে গিয়ে ধরি। তারক যখন তখন নিশ্চয়ই জ্ঞান হয়ে দেবেন। জাহি মাং মধুসূদন না বলে জাহি মাং তারকব্রক্ষণ বলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।’

মুরলীধর হাসলেন। বললেন, ‘না, তেমন কিছুই দরকার নেই।’

‘তা হলে কি করবে? এ সব বড় নোংরা ব্যাপার। আর্টের বিচার আর আদালতের বিচার এক নাও হতে পারে। আর যদি কনভিকশান হয়ে যায় তা হলে শাস্তি তো হবেই, উপরন্তু তোমার ইস্যুনের কাজটি যাবে।’

‘তা জানি। তবু—থাক।’ মুরলীধর অবিচলিত রইলেন। বললেন, ‘সাহিত্যকে ভালবাসি; পূজা করি সেবা করি সাহিত্যের। জীবন নিয়েই সাহিত্য—সমগ্র, অঞ্চল জীবন। তাকে বাদ দিয়েই জীবনবাদী হই কি করে? সু আর কু দুই-ই বাস করে পাশাপাশি। কে যে কী এই নিয়ে ভক। সত্য কতদূর পর্যন্ত সুন্দর, আর সুন্দর কতদূর পর্যন্ত সত্য এই নিয়ে বগড়া। প্রুডা’র আর পর্নোগ্রাফি দুটোকেই ঘৃণা করি। সত্যের থেকে নিই সাহস আর সুন্দরের থেকে নিই সীমাবোধ—আমরা স্রষ্টা, আমরা সমাধিসিদ্ধ।’

ভব্রলোক কেটে পড়লেন।

ঠিক হজ লড়া হবে না মামলা। না, কোনো তদবির-তালাস নয়, নয় ছুটোছুটি হাস্যরাসি। শুধু একটা স্টেটমেন্ট দাখিল করে দিয়ে চূপ করে থাক। ফলাফল যা হবার তা হোক।

গেলেন ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর কাছে। একে সার্থকনামা উকিল, তার উপরে সাহিত্যিক, সর্বোপরি অতি-আধুনিক সাহিত্যের পরাক্রান্ত পরিপোষক। অভিজ্ঞ লেখা ছোটো মন দিয়ে পড়লেন অনেকক্ষণ। বললেন, নট-গিলটি প্লিড করুন।

যতদূর মনে পড়ে, ‘চিত্রবহা’র দু’টি পরিচ্ছেদ নিয়ে নালিশ হয়েছিল। এক ‘যৌবনবেদনা’, দুই ‘নরকের দ্বার’। আর ‘আবণ-ঘন গহন মোহের’ গোটাটাই।

সব চেয়ে আশ্চর্য, ‘চিত্রবহাকে’ প্রশংসা করেছিল “শনিবারের চিঠি”। এমন কি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিল।

এই ভূতের-মুখে-রাম-নাথের কাণ্ড আছে। ঋগ্বেদেবী মোহিতলালের বন্ধু। আর ‘চিত্রবহা’ মোহিতলালের সুপারিশেই ছাপা হয় “কালি-কামে”।

“শনিবারের চিঠি” চিত্রবহা সম্বন্ধে যে কথা হয় :

“...লেখক মানবজীবনের ভাবগোচর হৃদয়-কুৎসিত সকল দিকের মধ্য দিয়ে একটা চরিত্রের বিকাশ ও জীবনের পীড়ন ‘চিত্রিত’ করিয়াছেন। জীবনকে যদি কেহ সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করেন তবেই কিছুই বাদ দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহা হইলে তাহান সর্বশেষ একটা সামন্তস্ব ধরা পড়ে। সু ও সু দুই মিলিয়া একটি অবাধ বাগগীত সৃষ্টি করে, তাহা *morai*ও নয়, *immoral*ও নয়—আরও বড়, আরও বহুসময়।...”

চমৎকার সুস্থ মানুষের মতন কথা। পদ্ধতিবাদের করতে জানে ঠাহলে “শনিবারের চিঠি”! তা জানে বৈকি। দলের হলে বা দলকার হলে করতে হয় বৈকি সুখ্যাতি। অসম্মানস্তু: শুভায় ততু।

নরেশচন্দ্র স্টেটমেন্টের খসড়া করে দিলেন। বললেন, ‘প্রায়শ্চৈ একখানা করে কপি কোর্টে পেশ করে দিন।’

তথাস্তু। কিন্তু উকিলের দল ছাড়া না। বসে, কাইট বন্ধন। দাঁড়িয়ে মার খাবেন কেন?

বুঝবে না কিছুতেই, উলটে বোঝাবে। ব্যাপারটা বুঝুন। এ ছেলেখেলা নয়, জরিমনা। ছেড়ে জেল হয়ে যেতে পারে। ফরোয়ার্ডে না খেলুন গোলে গিয়ে দাঁড়ান। ফাঁকা গোলে বল মেরে পুলিশ জিতে যাবে এক শটে?

মহা বিড়ম্বনা। এক দিকে সমালোচক, অগ্র দিকে পুলিশ, মাঝখানে উকিল। যেন এক দিকে শেরাকুল অগ্র দিকে বাবলা, মধ্যস্থলে থেজুর।

মুরলীধর তবু নড়েন না।

‘এর মশাই কোনো মানেই হয় না। শ্রেফ apologise করুন আর না-হয় আমাদের লড়তে দিন। ফি-র ভয় করছেন, এক পরস্যাও ফি চাই না আমরা। সাহিত্যের জন্তে এ আমাদের labour of love’.

মনে-মনে হাসলেন মুরলীধর। বললেন, ‘ধন্যবাদ’।

ভিড় ঠেলে আদালত-ঘরে ঢুকলেন তিনজনে। সাজেট আর লাল-পাগড়ি, গাটকাটা আর পকেটমার, চোর আর জুয়াড়ি, বেতা আর গুণ্ডা, বাউতুলে আর ভবঘুরে। তারই পাশে প্রকাশক আর সম্পাদক, আর সাহিত্যিক।

ঢুকলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। ক’টা ছেঁড়া মামলার পর ডাক পড়ল “কালি-কলমের”।

কে জানে কেন, কাঠগড়ায় পাঠালেন না আসামীদের। চেয়ারে বসতে সংকেত করলেন।

এলেন মহামায়া পি-পি, হাতে একখণ্ড বাঁধানো “কালি-কলম”। অভিযুক্ত অংশবিশেষ নীল পেন্সিলে মোটা করে দাগানো। বইখানা যে তাঁকে সরবরাহ করেছে সে খে ভিতরের লোক তাতে সন্দেহ কি।

যারা আমাদের মতের ও পথের বিরোধী, অথবা ভিন্নপন্থী ও ভিন্নমত, তাদের অভ্যুদয় দেখলে আমাদের মন সংকুচিত বা অপ্রমুদিত হয়! সেটা মনের আময়, অন্তত্বতা। মনের সেই অপবিত্রতা দূর করার জন্তে ভিন্নপন্থীদের পুণ্য্যাংশ চিন্তা করে মনে মুদিতা-ভাব আনা দরকার। পুষ্পহার ছ’জনকেই প্রশস্ত করে, যে ধারণ করে আর যে ঘ্রাণ নেয়। তেমনি তোমার অজিত পুণ্যের সৌরভে আমিও প্রমুদিত হচ্ছি। এই ভাবটিই বিস্তৃত ভাব।

কিন্তু এ কি সহজ সাধনা? সাহিত্যিক হিসেবে যার আকাজক্ষিত যশ হল না সে কি পারে পরের সাহিত্যধর্মে হৃদয়ে অহুমোদনভাব পোষণ করতে?

পি-পি বক্তৃতার পিণে খুললেন। এরা সমাজের কণ্ঠ, দেশের শত্রু, রাষ্ট্রের আবর্জনা। এদেরকে আর এখন হুঁন থাইয়ে মারা যাবে না, যদি আইন থাকত, লৌহশলাকার বিদ্ধ করতে হত সর্বান্ত।

আসামীদের পক্ষে কি বক্তব্য আছে? কিছু নয়, শুধু এই বিবৃতিপত্র।

শুধু বাক্য থাকলেই কাব্য হয় না। বক্তৃতা দিয়ে রস বোঝানো যায় না অরসিককে।

সেই নামহীন উকিল তবু নাছোড়বান্দা। সে একটা বক্তৃতা ঝাড়বেই আসামীপক্ষে। বিনা পয়সায় এমন হুযোগ বুঝি আর তার মিলবে না জীবনে।

‘আমাদের পক্ষে কোন উকিল নেই।’ বললেন মুরলীধর : ‘একমাত্র ভবিষ্যৎই আমাদের উকিল।’

ম্যাজিস্ট্রেট উকিলকে বসতে বললেন।

তারিখ পালটে তারিখ পড়তে লাগল। শেষে এল রায়-প্রকাশের দিন।

আদালতের বারান্দায় দুই বন্ধু প্রতীক্ষা করে আছে। শৈলজানন্দ আর মুরলীধর। সাহিত্য-বিচারে কী দণ্ড নির্ধারিত হয় তাদের। দারিদ্র্য আর প্রত্যাখ্যানের পর আর কী লাঞ্ছনা।

‘কি হবে কে জানে!’ শুক মুখে হাসল শৈলজা।

‘কি আবার হবে! বড়জোর ফাইন হবে।’ মুরলীধর উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

‘শুধু কাইনও যদি হয়, তাও দিতে পারব না।’

‘অগত্যা ওদের অতিথিই ন! হয় হওয়া যাবে দিন-কতকের জন্তে। তাই বা মন্দ কি!’ মুরলীধর হাসলেন : ‘গল্পলেখার নতুন খোঁজাক পাবে।’

‘সেই লাভ।’ সান্ত্বনা পেল শৈলজা।

দুপুরের পর রায় বেরুল। পি-পি-র সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের আখ্যান-ব্যখ্যান বিশেষ কাজে লাগেনি ম্যাজিস্ট্রেটের। আসামীদের তিনি benefit of doubt দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

আদর্শবাদী মুরলীধর ইস্কুলমাস্টার ছিলেন, কিন্তু সেই সংকীর্ণ বন্দীদশা থেকে মুক্ত ছিলেন জীবনে। নিজে কখনো গল্প-উপন্যাস লেখেননি, গ্রন্থ ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ লিখেছেন—তাঁই ভয় ছিল ঐ সীমিত ক্ষেত্রে না মাস্টারি করে বসেন। কিন্তু, না, চিরন্তন মাতৃষের উদার মহাবিভাগলয়ে তিনি পিপাহ সার্থিত্যকের মতই চিরনবীন ছাত্র। সাহিত্যের একটি প্রশস্ত আদর্শের প্রতি আহিতলক্ষ্য ছিলেন। ভ্রষ্ট হননি কোনদিন, খমতবিধাতক মৌমাংসা করেননি কোনো অবস্থায়। শুধু নির্ণা নয়, নির্ণার সঙ্গে প্রীতি মিশিয়েছেন। আর যেখানেই প্রীতি সেইখানেই অমৃতের আশ্বাদ।

তঁার স্ত্রী নীলিমা বসুও কল্লোল যুগের লেখিকা। এবং অকালপ্রয়াতা। নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার নিয়ে গল্প লিখতেন। বিষয়ের আলোক্যে লিখনভঙ্গিতে একটি স্বচ্ছ সারল্য ছিল। এই সারল্য অনেক নীরব অর্চনার ফল।

“কালি-কলমের” মামলা উপলক্ষ্য করে শচীন সেনগুপ্ত আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে অনেক লিখেছিলেন তঁার “নবশক্তিতে”। তার আগে তঁার “আত্ম-শক্তিতে”। শচীন সেনগুপ্ত নিজেও একজন বিপ্লবী নাট্যকার, তঁার নাটক ‘ঝড়ের পরে’ উপলক্ষ্য করেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগান্ত রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়। নিজেও তিনি ভাঙনের রঙে ভাবনাগুলিকে রাঙিয়ে নিয়েছেন, তাই “কল্লোলের” লেখকদের সঙ্গে তঁার একটা অন্তরের ঐক্য ছিল। দাবিত্র্যের সঙ্গে এক ঘরে বাস করতেন, এক ছিন্ন শয্যা—অলুচর বলতে নৈরাশ্র বা নিরাশ্রাস। তবু সমস্ত শ্রীহীনতার উর্ধ্বে একটি মহান স্বপ্ন ছিল—কষ্টের উত্তরে নিষ্ঠা, উপবাসের উত্তরে উপাসনা। এমন লোকের সঙ্গে “কল্লোলের” আত্মীয়তা হবে না তো কার হবে?

আরো একজন গুপ্ত-হীন গুপ্ত লেখক ছিলেন—অরমিক রায়ের চন্দ্রনামে। খুচরো ভাবে খোঁচা মারতেন, তাকে ধার থাকলেও ভার ছিল না। তখনকার দিনে আধুনিক সাহিত্যকে ‘অপ্লোল’ বলায় ক্যাশান ছিল, যেমন এককালে ফ্যাশান ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখাকে ‘ভূবোধ্য’ বলা। আশীর্বাদ করতেই অনেক সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেক দীর্ঘদর্শিতার। যারা লেখক নন, শুধু সমালোচক, তাঁদের কাছে এই সংলুভুতি, এই দূরব্যাপিতা আশা করা যাবে কি করে? নগদবিদ্যায়ের লেখক হয় জানি, তাঁরা ছিলেন নগদবিদ্যায়ের সমালোচক। তাই যারা আধুনিক সাহিত্যের স্বস্তিবাচন করেছেন—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে রাধাকমল-ধূর্জটিপ্রসাদ পর্যন্ত—তাঁদেরকেও গুণা রেহাই দেননি।

রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ। তিনি একদশদর্শীর মত শুধু দোষেরই সন্ধান নেননি, যা প্রশংসনীয় তাকেও সংবর্ধনা করেছেন। তিনি জানতেন এক লেখা আরেক লেখাকে অতিক্রম করে যায় পারে-বারে, আজ যা প্রতিমা কালকে আবার তা মাটি—আবার মাটি থেকেই নতুনতরো মূর্তি। তাই আজ যা ঘোলা কাল তাই স্থনির্মল। প্রশ্ন হচ্ছে বেগ আছে কিনা স্রোত আছে কিনা—আবদ্ধ থাকলেও আছে কিনা বন্ধনহীনের দৃষ্টিপাত। তাই সেদিন তিনি শৈলজা-প্রেমেন বুদ্ধদেব-প্রবোধ কাউকেই স্বীকার করতে বা সংবর্ধনা করতে কুণ্ঠিত হননি। সেদিন তাই তিনি লিখেছিলেন :

“নব লেখা লুপ্ত হয়, বারবার জিথিবান্ন তরে
 নতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
 কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
 নবীনের তুলিকায়ে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লয়
 সমাপ্তির রেখা-দুর্গ। নবলেখা আসি দর্পভরে
 তার ভগ্ন স্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
 উন্মুক্ত করুক পথ, স্বাবরের সীমা করি জয়,
 নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
 অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
 যুগ-বিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাদ্র হ’লে পরে
 যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়া কয়,—
 ‘ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
 তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরাচবে নতন প্রতিমা,
 প্রকাশবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা’ ॥”

আসলে, কী অভিযোগ এই আধুনিক সাহি ত্যকদের বিরুদ্ধে ?

এই সম্বন্ধে “কল্লোলে” একটা জবানবন্দি বেবোয় নতুন লেখকদের পক্ষে থেকে। সেটা রচনা করে কৃষ্টিবাস ভদ্র, তরফে প্রেমেন্দ্র মিত্র।

“নতুন লেখকেরা নাকি অল্পল।

পৃথিবীতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈতন্যেরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে এ কথা তারা না হয় নাই মানল, মিথ্যা ও পাপকে ধামাচাপা দিলে যে মারা যায় এ কথাও নাকি তারা মানে না।

তাদের পটে নাকি সাধুর মস্তক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায় না, পাষণ্ডকেও নাকি সে পটে মাছুষ বলে ভ্রম হয় ! জ্ঞানের অমোঘ দণ্ড নাকি দেখানে আগা-গোড়া সমস্ত পরিচ্ছেদ সন্ধান করে শেষ পরিচ্ছেদে অভ্রান্তভাবে পাণীর মস্তকে পতিত হয় না !

“নৌকাদুবির” লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কমলাকে রমেশের প্রতি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম থেকে অর্থহীন কারণে বিচ্ছিন্ন করে অপরিচিত স্বামীর উদ্দেশ্যে অসম্ভব অভিমানে প্রেরণ না ক’রে, ‘পথনির্দেশ’-এর রচয়িতা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দু’টি মিলনবাকুল পরস্পরের সান্নিধ্যে সার্থক হৃদয়কে অপরূপ

যথেষ্ট পথ-নির্দেশ না করে তারা নাকি স্বাধীনতার স্বপ্নের সন্ধে নিখিলেশের বিমলাকে আত্মোপলব্ধির স্বাধীনতা দেওয়ার পরম অঙ্গীলতাকে সমর্থন করে, সত্যাপ্রমাণ নিভীক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অভয়র জ্যোতির্ময় নারীত্বকে নমস্কার করে ।

সব চেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না । মুটে মজুর কুলি খালাসী দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি, বাত, শূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাতত অপরিহার্য বলে জীবনেই কোন রকমে ক্ষমা করা যায়—এবং বড় জোড় কবিতায় একবার—‘অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু’ ইত্যাদি বলে আলগোছে হা-হুতাশ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্ন-বিলাসের মধ্যে সে সবও নাকি টেনে আনতে চায় !

তুখু তাই ! বস্তির অন্তরের জীবনধারাকে তারা প্রায় ‘গ্যারেজ’ওয়াল প্রাশাদের অন্তরালের জীবনধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে । এমন কি, তারা মানে যে প্রাসাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সময়ে-সময়ে বস্তির জীবনকে ধরি-ধরিও করে ।

তারা নাকি আবিষ্কার করেছে—পাপী পাপ করে না, পাপ করে মানুষ বা আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের সামান্য ভগ্নাংশ, মানুষের মহত্ত্ব ছুনিয়ার সমস্ত পাপের পাওনা অন্যায়সে চুকিয়েও দেউলে হয় না ।

এ আবিষ্কারের দায়িত্বটুকু পর্যন্ত নিজেদের ঘাড়ে না নিয়ে তারা নাকি বলে বেড়ায়—বুদ্ধ জীষ্ট শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে তারা এগুলি বেমালুম চুরি করেছে মাত্র ।

মানুষের একটা দেহ আছে এই অঙ্গীল কিংবদন্তীতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের নাকি ধারণা যে, এই পরম বহুশ্রম অপক্লপ দেহে অঙ্গীল যদি কিছু থাকে ত সে তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি ।

—ইতি ।

কিন্তু অভিজাত, নিকর্মা মানবহিতৈষী সমাজরক্ষক ‘আটত্রাতারা’ থাকতে ইতি হবার জো নেই ।

এই সব সুস্থ সবল নীতিবলে বলীয়ান মানবজাতির স্বনিযুক্ত দ্রোতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধু ও ঐকান্তিক অধ্যাবসানে আমাদের ঘোরতর আস্থা আছে !

মানুষের এই সামান্য তিন চার হাজার বছরের ইতিহাসেই তাঁদের হিতৈষী হাতের চিহ্ন বহু জায়গায় স্পষ্ট ।

‘কল্লোল’ ও ‘কালি-কলম’ দু’টি ক্ষীণপ্রাণ কাগজের কর্তৃদলন ত সামান্য কথা । কালে হয়ত তারা পৃথিবীর সমস্ত বিদ্রোহী ও বেস্বরে কণ্ঠকেই একেবারে স্তব্ধ করে ধরণীকে শ্রীলতা ও ভব্যতার এমন স্বর্ণ করে তুলতে পারে যে, অতিবড় নিন্দুকেন্দ্রও প্রমাণ করতে সাধ্য হবে না, রামের জ্যামিতিক জীবন থেকে শ্রামের জ্যামিতিক জীবন বিন্দুমাত্র তফাৎ ; এবং মাতা ধবিত্রী এতগুলি ছাঁচে-কাটা স্মৃস্তান ধারণ করবার পরম আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে সৃষ্টির অগ্নিগঠরে পুনঃ-প্রবেশ করে আত্মহত্যা করতে চাইবেন । এতদূর বিশ্বাসও আমাদের আছে ।

তবে মানুষ আসলে সমস্ত শ্রীলতার চেয়ে পবিত্র ও সমস্ত ভব্যতার চেয়ে মহৎ—এই যা ভরসা !”

আমি আরেকটু যোগ করে দিই । যেখানে দাহ সেখানেই তো ছাতির সম্ভাবনা, যেখানে কাম সেখানেই তো প্রেমের আবির্ভাব । স্মরণে স্বীকার করো, আশীর্বাদ করো ।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মূল্যগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিভাষণ থেকে কিছু অংশ তুলে দিলে মন্দ হয় না ।

“এমনই ত হয় ; সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সব চাইতে বড় সাধনা । সে জানে আজকের লাহুনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যেও তার দিন আছে । হোক সে শতবর্ষ পরে, কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল ব্যথিত নর-নারী শত-শক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে ।...আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে তার রচনা আজ অদ্বুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয় । বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমা সীমাবদ্ধ করা যাবে না । গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে । আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছয়নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্ধনার আসন পাতা আছে ।

আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিকল্পে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না ; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয় নি । এটা এলেছে হালে ।...

সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে । নর-নারীর

বহুদিনের পুঞ্জীভূত বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়।... পুরুষের তত মুশকিল নেই, তার ফাঁক দেবার রাস্তা খোলা আছে ; কিন্তু কোনও স্ত্রীই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সত্যত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশ্বক সাহিত্য।...একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নাই, কিন্তু সে যা সহ্যেতে পারে না, তা হচ্ছে ফাঁকি।...সত্যত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সত্যত্বের চেয়ে বড়।...

তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্তদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে কণ্ঠ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের স্থখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।”

এইবার বিরোধী দলের ‘নব-সাহিত্য-বন্দনাটা’ আবার মনে করিয়ে দিই।

“বাজোজ্ঞানে রচিলে বস্তু,
স্বস্তি নব সাহিত্য স্বস্তি,
পথ-কর্দমে ধূলি ও পঙ্ক
ঘোষিলে আপন বিজয়-শঙ্খ,
লাঞ্ছিতা পতিতার উদ্যাটিলে দ্বার
সত্যত্বে তাহারে কৈলে অভিব্যক্ত—
জয় নব সাহিত্য জয় হে।”

“কালি-কলমের” মামলা উপলক্ষ্য করে আরো একজন এগিয়ে এল ‘চিত্রবহা’র জন্তে। সে অল্পদাশঙ্কর। তখন সে বিলেতে, ‘চিত্রবহা’ চেয়ে নিয়ে পড়ল সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর তার প্রশংসায় দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখল। সেটা “নবশক্তি”তে ছাপা হল। লিখলে মুরলীদাকের : ‘মোকদ্দমার রায়ে খুশি হতে পারলাম না। আসল প্রশ্নের মীমাংসা হলো কই? আমাদের সাহিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো কই?’

লগুন থেকে আমাকে লেখা অন্নদাশঙ্করের একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

শ্রদ্ধাংশদেয়

“কল্লোলে”র বৈশাখ সংখ্যার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আপনার “বেদে” পড়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সে কথা মোটের ওপর আমারও কথা। কিন্তু আমার মনে হয় মিথুনাসক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে অত্যধিক প্রধাণ্য দিতে গেল কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখকমাত্রই যেন Keats-এর মতো বলতে চায়, “I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken.” আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। “শোনো শোনো অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্বীর প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুকে জন্ম দেয়, সে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করলে মরণ সম্বন্ধে তোমরা বাঁচবে—তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদের মধ্যে বাঁচবে। আমার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই মার, অনিন্য এই জগতে কেবল সেই প্রবৃত্তিই নিত্য।”—এ যুগের ঋষিরা যেন এই তত্ত্বই ঘোষণা করেছেন। Personal immortality-তে তাঁদের আস্থা নেই—race immortality-ই তাঁদের একমাত্র আশা। এবং race immortality-র কুক্ষিকা হচ্ছে Sex। যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হয়েছিল কিংবা বড় জোর রেস্টোরেশন যুগের ইংলণ্ড বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানাবিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল, সেই বস্তুই আজকের সমস্তাসংকুল বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো উদয় হলো। একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে করা যায় তবে ভুল করা হবে। আসলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিকার। মানুষের গভীরতম প্রকৃতি বহু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে পুনরুদ্ধারের দিন এলো। অনেকখানি আবজনা না সরালে পুনরুদ্ধার হয় না। অথচ আবজনা সরানো কাজটা বড় অকচিকর। Sex সম্বন্ধে ঘাঁটিঘাঁটি সেইজগ্রে বড় বীভৎস ঘোষণা হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা—এই বিপ্রী কোতুহল—এই আধেক ঢেকে আধেক দেখানো—এসব বাসি হয়ে যাবে। Sexকে আমরা বিশ্বয়সহকারে প্রণাম করবো, আদিত্য মানব যেমন করে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতো। এখনো আমরা sophistication কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে বাডাবারি করছি। কিন্তু এমন যুগ আসবেই যখন জন্মরহস্যকে আমরা অলৌকিক অহেতুক অতি বিশ্বয়কর

বলে নতুন ঋত্বেন রচনা করবো, নতুন আবেশতা, নতুন Genesis. ভগবানকে পুনরাবিষ্কার করা বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় কাজ—সেই কাজেরই অঙ্গ সৃষ্টিতত্ত্ব পুনরাবিষ্কার। বিজ্ঞান ভাবীকালের মহাকাব্য রচনার আয়োজন করে দিচ্ছে—এইবার আবির্ভাব হবে সেই মহাকবিদের ষাঁরা অষ্টোত্তর শত উপনিষৎ লিখে সকলের অমৃততত্ত্ব ঘোষণা করবেন। প্রকৃতির সঙ্গে মাতৃশবের সন্ধি হবে তখন। দেহ ও মনের বহুকালীন দ্বন্দ্বটারও নিষ্পত্তি হবে সেই সঙ্গে।...

ভালো কথা, ‘কল্লোলের’ দলের কেউ বা কারা কিছুকালের জন্যে ইউরোপে আসেন না কেন? Parisএ থাকবার খরচ মাসে ৬০।৬৫ টাকা যদি নিজের হাতে রান্না করে খান। একসঙ্গে তিন চার জন থাকলে আরো কম খরচ। গল্প ও প্রবন্ধ লিখে ওর অন্তত অর্ধেক রোজগার করা কি আপনার পক্ষে বা বুদ্ধদেব বহুর পক্ষে বা প্রবোধকুমার সান্মালের পক্ষে শক্ত। বাকি অর্ধেক কি আপনারা-দেরকে বন্ধুরা দেবে না? Parisএ বছর দু’য়েক থাকা যে কত দিক থেকে কত দরকার তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। বাঙালী ছাড়া সব জাতের সাহিত্যিক বাংলা ছাড়া সব ভাষায় ওখান থেকে কাগজ বার করে। ‘কল্লোলের’ আপিস কলকাতা থেকে Parisএ তুলে আনেন না কেন? (Countee Cullen এখন Parisএ থাকেন—দেখা হলো।) আমার নমস্কার! ইতি।

আপনার

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কাউন্টি কালেন সেকালের নিগ্রো কবি। তার ছোটো লাইন এখনো মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে :

Yet do I marvel at this curious thing :

To make a poet black and bid him sing !

বাইশ

জানা নেই শোনা নাই, অন্নদাশঙ্করের হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। বিলেত থেকে লেখা, যখন সে সেখানে ট্রেনিং। চিঠিতে আমার সম্বন্ধে হয়তো কিছু অতিশয়োক্তি ছিল—এহ বাহু—কি লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেইটাই গণনীয়। পত্রের চেয়েও স্পর্শটাই বেশি স্বাদ, বেশি স্বাগত। অন্নদাশঙ্করের সেই হস্তলিপি জীবনের পত্রে জীবনদেবতার নতুনতরো স্বাক্ষর।

বিলেত থেকে এলে তার সঙ্গে মিলিত হলাম। তাকে দেখার প্রথম সেই দিনটি এখনো মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে শুধু রৌদ্রের উজ্জ্বলতা নয়, একটি অনির্ব্যয় তারুণ্যের উজ্জ্বলতা। অন্নদাশঙ্করের “তারুণ্য” কল্লোলযুগের মর্মবাণী।

ক্রমে ক্রমে সেই পরিচয়ের কলি বন্ধুতার ফুলে বিকশিত হয়ে উঠল। লাগল তাতে অন্তরঙ্গতার সৌরভ। ছ’জনে শান্তিনিকেতন গেলাম, রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে। অমিয় চক্রবর্তীর অতিথি হলাম। ক’টা দিন সুখস্বপ্নের মত কেটে গেল। সুখ যায় কিন্তু স্মৃতি যায় না।

অন্নদাশঙ্করের চিঠি :

“বন্ধু,

আমি ভেবেছিলুম তোমার অসুখ বেরেছে, শারীরিক অসুখ। তাই বেশ একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম। আজকের চিঠি পেয়ে বোঝা গেলো অসুখ করেছে বৈকি, কিন্তু মানসিক। উদ্বেগটা বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাতৃবের সংস্কার অগ্নিরূপে।..

সরস্বতী পূজার সময় এখানে এলে কেমন হয়? বিবেচনা করে লিখো। সাহিত্যিক জলবায়ুর অভাবে মারা যাচ্ছি। দ্বিভাষী মজুমদার না থাকলে এত দিনে ভূত হয়ে যেতুম।

কাল রাাত্রি ২টার সময় ডিনার ও ডান্স থেকে ফিরি। নাচতে জানিনে, বসে বসে পর্যবেক্ষণ করছিলাম কে কী করেছে, কত রং মেখেছে, ক’বার চোখ নাচায় ও কানের ছল দোলায়, কেমন করে nervous হাসি হাসে—যেন হিচ্কা উঠেছে। ইত্যাদি। ইংরেজ ও ঈঙ্গ-বঙ্গদের ভিড়ে আমার এত খাপ লাগছিল তবু study করার লোভ দমন করতে পারছিলাম না।

পরশু রাতে ১টা অবধি হয়েছিল fancy dress ball. আমি সেজেছিলাম নন্দ্যাদী। সকলে তারিফ করেছিল।

এমনি করে দিন কাটছে। কবে কে নিয়ন্ত্রণ করলে, কে করলে না, কে ইচ্ছে করে অপমান করলে, কে মান রাখলে না—এই সব নিয়ে মন কবাকবি চলছে ক্লাবের মেম্বরদের সঙ্গে। মুশকিল হয়েছে এই যে, দ্বিভাষী ও আমি হাফগেরস্। আমরা যদি একেবারে পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করে দিতুম ও সানন্দে একঘরে হতুম, তবে এসব pin prick থেকে বাঁচা যেতো। কিন্তু আমরা dinner jacket পরে যেতে যাই অথচ বাঙালী মেয়েদের বিজাতীয়তা দেখে

মর্মান্বিত হই; আমরা ইংরেজী পোশাকে চলি ফিরি, অথচ কোনো বাঙালী তার স্ত্রীকে “dearie” ডাকছে শুনলে চটে যাই। আমাদের চেয়ে বাবা আরেক ডিগ্রী সাহেবিয়ানাগ্ৰস্ত তাদের সম্বন্ধে আমাদের যে আক্রোশ আমাদের ওপরে ডেপুটীবাবদের বোধহয় সেই আক্রোশ। কিন্তু জাতিভেদের দরুন ডেপুটী-উকিল-জমিদার ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের পরিচয় পর্যন্ত হয়নি।

মোটের উপর বড় বিশ্রী লাগছে। টেনিসটা রোজ খেলি সেই এক আনন্দ। আরেক আনন্দ চিঠি ও কাব্যাদি লেখা।

অমিয় হুঁখানা চিঠি লিখেছিলেন। তুমি কি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু লিখছো? আমি সম্ভব শুরু করবো।”

“বন্ধু,

Departmentalএ কেল করবো এ একেবারে মৃত্যুর মতো নিশ্চিত। অতএব আজকের এই বাদলা অপরাহ্নটিতে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো। কোকিল ঝড়বৃষ্টিতে উপেক্ষা করে অশ্রান্ত আলাপ করছে—ভবানীপুরে বা আলিপুরে শুনতে পাও?

আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঝাঁকে ঝাঁকে ঘাসছে। তোমার আসে? সাহিত্য তো তুমিও লেখো, কিন্তু কেউ কি তাই পড়ে তোমাকে মন-প্রাণ সপে? যদি আই-সি-এসটা কোনক্রমে পাশ করে থাকতে তবে হঠাৎ সবাই তোমার সাহিত্যের দরুন তোমাকে পতিরূপে কামনা করতো এবং তুমি প্রত্যাখ্যান করলে hunger strike করতো। এই কয়েক মাসে আমার তারি মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বলব তোমাকে।

অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পের গুট মাখায় ঘুরছে। লিপে উঠতে পারছি নে। সমাজটাকে আরেকটু ভালো কবে দেখতে শুনতে চাই। কিন্তু এ চাকরিতে থেকে সমাজের সঙ্গে point of contact জোড়ে না। আমরা ক্লাব-চর জীব। ক্লাবে সম্প্রতি বাঙালী মেয়ের দুর্ভিক্ষ।

Departmental-এর সময় কলকাতায় যে ক’দিন থাকবো সেই সময়ের মধ্যে অনকয়েক নাহিত্যিককে চা বাওয়াতে চাই। সেই ক্ষেত্রে পরিচয় হবে। তুমি নাম suggest করো দেখি।

তুমি কলকাতাতেই একটা লেকচারারি জোগাড় করে থেকে যাও। মুনসেফী বড় বিদঘুটে। তোমাদের কি খুব টাকার টানাটানি?...”

“বন্ধু,

অনেকদিন পর তুমি আমাকে একখানা চিঠির মত চিঠি লিখলে। চিঠির জবাব আমি প্রাপ্তিমাত্র লিখতে ভালোবাসি, দেরি করলে লিখতে প্রবৃত্তি হয় না, তাব ঘুলিয়ে যায়।...

দশ বছর আমি সমাজ-ছাড়া, কদাচ আমার আপনার লোকদের সঙ্গে দেখা হয়। কচিং তাদের উপর আমি নির্ভর করেছি অনবজের জন্তে বা সাংসারিক সুবিধার জন্তে। এমনি কবে আমি একটা Semi-সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে বিয়ে করা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে পুরোদস্তুর জড়িয়ে পড়া—স্বস্তর-শান্তী শালা-শালী ইত্যাদির উৎপাত সওয়া। তাহলে চিরকাল এই চাকরিতে বাঁধা থাকতে হয়। তাহলে ইউরোপে পালিয়ে বসবাস করা চলে না। একলা মানুষের অনেক সুবিধা। He can travel from China to Peru.

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বটে বিয়ে করে সংসারী হই—একটি জমিদারি কিনি, বাগানবাড়িতে থাকি, নিজের স্কুলে পড়াই, নিজের হাতে বীজ বুনি ও কসল কাটি। একটি কল্যাণী বধু, কয়েকটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে।

কিন্তু এর জন্তে অপেক্ষা করতে হয়। এ স্বপ্ন একা আমার হলে চলবে না। আরেকজনের হওয়া চাই। সাহিত্য আমার কাছে প্রাণের মতো প্রিয়। কিন্তু ওর চেয়ে প্রিয় সুসমঞ্জস প্রেম। ও-জিনিস পেলে আমি হয়তো সাহিত্য ছেড়ে দিতে পারি। জীবনের মধ্যাহ্ন কালটা purely উপলব্ধি করতে চাই, তারপরে সন্ধ্যা এলে জীবনের রূপকথা বলার সময় হবে।—

I feel like a child very often. আমি শানিক কেঁচোছ। যুবক হতে আমার কিছু বিলম্ব হবে, কৈশোরটা ভাজো করে শেষ করে নিই। আমার বৈয়ের বয়স হয়নি।

তোমার চাকরির জন্তে চিন্তিত হয়েছি। তুমি খুব অল্প বেতনে কাজ করতে রাজী হও ও চেকানলের রাজ্যকে গিথতে পারি। চেকানলের জল-হাওয়া ভালো। কত কম মাইনেতে কাজ করতে পারো, লিখো। চেকানলে চার-পাঁচজন মানুষের একটি পরিবার ৪০।১০ টাকায় বেশ চলে। তাবলে বলছিনে যে তুমি ৫০ টাকার চাকরিতে রাজী হও। Say, 100/-? ইতি তোমার অন্নদা”

অন্নদাশঙ্কর তেমন একজন বিরল সাহিত্যিক যাঃ সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার একটি সুপ্রাণ পাওয়া যায় (তেমন আরেকজন দেখেছি। সে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।) একটি মৌন মহত্ব যে তার চিন্তায় তা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করি। কোনো কথা না বলে তার কাছে চূপ করে বসে-থাকাটিও অনেক কথা-ভরা। আত্মার সঙ্গে আত্মার যখন কথা হয় তখনই মহৎ আর্ট জন্ম নেয়। অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আর্টের অন্বেষক। সাহিত্যের আদর্শ তার এত উঁচু, যা তার আয়ত্ত, অধিকৃত, তাতে সে আশুকাষ্ম নয়। জীবনে সে স্বস্থ ও শান্ত হতে পারে কিন্তু স্বজনে সে অপরিতুষ্ট। এমনিতে সহজ গৃহস্থ মাতৃষ, কিন্তু আসলে সে বন্দী প্রমিথিউস।

স্বচ্ছ সরল কথা, স্নিগ্ধ মুক্ত হাসি—চিন্তনৈর্মল্যের দু'টি অপরূপ চিহ্ন। স্টাইল বা লিখনরীতিই যদি মাতৃষ হয় তবে অন্নদাশঙ্করকে বুঝতে কাকর ভ্রম হবে না। মৌনের আবেগ নির্ভার কাঠিন্য আর বৈরাগ্যের গান্ধীর্ষ নিয়ে অন্নদাশঙ্কর। ভিড়ের মধ্যে থেকেও সে অসঙ্গ, অবিকৃত। আর যার বিকার নেই তার বিনাশও নেই। যাকে আমরা বাস্তব বলি তাই বিকাশ—শুধু ক'টি স্বপ্নই বৃষ্টি অবিনাশী, যত্নহীন। অন্নদাশঙ্কর সেই ক'টি স্বপ্নের চারু কার।

ভালো লেখা লিখতে হবে। তার জন্তে চাই ভালো করে ভাবা, ভালো করে অনুভব করা আর ভালো করে প্রকাশ করা—তার মানে, একসঙ্গে মন প্রাণ আর আত্মার অধিকারী হওয়া! অন্নদাশঙ্করের লেখায় এই মন প্রাণ আর আত্মার মহামিলন।

অমিয় চক্রবর্তী “কল্লোলে” না লিখলেও কল্লো-শৃংগের মাতৃষ। এই অর্থে যে, তিনি তদানীন্তন তাক্ষণ্যের সমর্থক ছিলেন। নিজেও অন্তরে সংক্রামিত করে নিয়েছিলেন সেই নতুনের বহিষ্কপ। “শনিবারের চিঠি”র বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়েছিলেন “বিচিত্রা”য়।

পুর্বানো দিনের ফাইলে তাঁর একটা মাত্র চিঠি খুঁজে পাচ্ছি।

“প্রিয়বরেবু, আপনার চিঠিখানি পেয়ে খুব ভালো লাগল। এবারকার যাত্রাপর্ব স্থলর হোক—আপনাদের নতুন পত্রিকা ঐশ্বর্থে পূর্ণ হয়ে নিজেকে বিকশিত করুক এই কামনা করি। “কল্লোল”কে আপনি চৈতন্যময় মুক্তির বাণীতে মুখর করে তুলবেন—তার বীর্ষ অন্তরের নির্মলতারই পরিচয় হবে।

রবীন্দ্রনাথের এই ছোটো গানটি বোধহয় কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তিনি যাবার আগে ব'লে গিয়েছিলেন “মহয়া”র কবিতা বাদে কোনো কিছু থাকলে তা আপনাকে পাঠাতে।

তাঁর ঠিকানা দিচ্ছি।...আপনি ঐ ঠিকানায় চিঠি লিখলে তিনি পাবেন—

তবে পেতে দেয়ি হবে, কেন না তিনি কোনো স্থানেই বেশি সময় থাকবেন না, কাজের ভিড়ও তাঁকে ঘিরে রাখবে। আপনার চিঠি এবং নূতন পত্রিকা পেলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হবেন।

আমার একটা কবিতা পাঠালাম—এইটুকু অমরোধ্যমাত্র যেন ছাপার ভুল না হয়। এই ভয়বশত কোথাও কোনো কবিতা ছাপাতে ভরসা হয় না। “প্রবাসী”তেও ভুল করেছে—হয়তো এ বিষয়ে আমাদের কাগজপত্র অসাবধানী। কবিতা ছাপানোর কথা বলছি—কিন্তু বলা বাহুল্য এয়ারকার রচনা উপযুক্ত না ঠেকলে কখনোই ছাপাবেন না! পরে অথ কিছু লিখে পাঠাতে চেষ্টা করব।

আমার একটা বক্তব্য ছিল। আপনার “বেদে” সম্বন্ধে কবির লেখা চিঠিখানি আপনি যদি সমগ্র উদ্ধৃত করে নূতন “কল্লোলে” ছাপান একটা বড়ো কাজ হবে। ঐ পত্রের মূল্য সমস্ত দেশের কাছে, আপনার লেখার সমালোচনা আছে কিন্তু তা ব্যক্তিগতের চেয়ে বেশি।”

গানটি “দুয়ার” নাম দিয়ে “কল্লোলে” ছাপা হয়েছিল। এ দুয়ার প্রকাশ-প্রারম্ভের প্রতীক, চিরকালের অনাগতের আমন্ত্রণ। সেই অর্থে এ গানটির প্রযুক্ততা “কল্লোলে” অত্যন্ত স্পষ্ট।

হে দুয়ার, তুমি আছো মুক্ত অক্ষুণ্ণ

রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।

অস্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে তাই

প্রবেশিতে সংশয় সদাই ॥

হে দুয়ার, নিত্য আগে রাত্রি দিনমান

স্বগন্তীর তোমার আস্থান।

সূর্যের উদয় মাঝে থো.না আপনারে।

তারকায় খোলো অন্ধকারে ॥

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে

খোলো পথ, ফুল হতে ফলে।

যুগ হতে যুগান্তর করো অব্যাহত।

মৃত্যু হতে পরম অমৃত ॥

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে

করে যাত্রা মরণে মরণে ।

মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে

“মা ভৈঃ” বাজে নৈরাশ্রনিশীথে ॥

অমিয়বাবুর ভাই অজিত চক্রবর্তীর নাম সাহিত্যের দৈনিক বাজারে প্রচলিত নয়। কেননা সে তো সাহিত্য রচনা করেনি, সে সাহিত্য ভজন করেছেন। ভক্ত কি ভজনীর চেয়ে কম? রসস্রষ্টার দাম কী যদি রসজ্ঞ না থাকে? চারদিকেই যদি অরসিক-বেরসিকের দল, তবে তো সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে। অজিত চক্রবর্তী ছিল রসোপভোগের দলে, তার কাজ ছিল তার বোধের দীপ্তি দিয়ে লেখকদের বোধকে উজ্জ্বলিত করা। ট্রামে-বাসে রাস্তায়-ঘাটে যেখানেই দেখা হোক, কার কী কবিতা ভালো লেগেছে তাই মুখস্থ বলা। অনেক দিন দেখা না হলে বাড়িতে বয়ে এসে অন্তত প্রশংসনীয় অংশটুকুকে চিহ্নিত করে যাওয়া। যার সৃষ্টিতে হৃদয় বলে অনুভব করগাম সেই আনন্দ সৃষ্টিকর্তাকে পৌঁছে না দিলে আশ্বাদনের পূর্ণতা কই?

সর্বতোদীপ্ত ঘোবনের প্রতিভা ছিল অজিত। সে যে অকালে মরে গেল তাতেও তার রসবোধের গভীরতা উছা ছিল। জীর্ণ বসন ছাড়তে যদি ভয় নেই তবে মৃত্যুতে বা কী ভয়? তার নিঃশব্দ মুখে এই রসাস্বাদের প্রসন্নতাটি চিরকালের জন্য লেখা হয়ে আছে।

একদিন এক হালকা ছপুরে কল্লোল-আপিসের ঠিকানায় লম্বাটে খামে একটা চিঠি পেলাম। কবিতায় লেখা চিঠি—১০২ শ্রীশ্যাম ঘোষ ষ্ট্রট থেকে লিখেছে কে এক শ্রামল রায়। কবিতাটি উদ্ধৃত করতে সংকোচ হচ্ছে, কবির তরফ থেকে নয়, আমার নিজের তরফ থেকে। কিন্তু যখন ভাবি শ্রামল রায় বিয়ু দে এবং এই চিঠির স্তম্ভ ধরেই তার “কল্লোলে” আবির্ভাব, তখন চিঠিটার নিশ্চয়ই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাই তুলে দিচ্ছি :

“হৃদয়ের মাঝে আছে যে গোপন বেদে,

অদ্ভুত তার বিচিত্র কিবা ভাষা,

অশরূপ তার ক্ষণিকের ভালোবাসা

ঘোরে সে কেবল খেলালিয়া হেসে কঁদে ।

ভাষার বাঁধন রেখে দেছে তারে বেঁধে
 ফোটেনিক তার অতীত স্মৃতি ও আশা,
 জোটেনিক তার কবিদের স্নেহ-হাসা—
 বেদে যে ডুবেছে মহানিষিদ্ধ ক্লেদে !
 তুমি দিলে তার মুকমুখমাঝে ভাষা
 হে নবস্রষ্টা ! দিলে জীবনের আশা ।
 বনজ্যোৎস্নার আলোতে ছেয়েছে মন,
 মৈত্রেয়ী মোরে মিত্র করেছে তার,
 বাতাসী খুলিছে উদাস হিয়ার দ্বার—
 হৃদয়বেদিয়া ঘুরিছে—এই জীবন ॥

স্বপ্নভরা দু'টি সম্মিত চোখ, স্মৃতিমূহু কথা আর সবলস্বস্থ তামি এই তখন
 বিষ্ণু দে। এস্তার বই আর দেদার সিগারেট—দুই-ই অজস্র পড়তে আর
 পোড়াতে দেয় বন্ধুদের। বেশবাসে সাদানিধে হয়েও বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন,
 ব্যবহারে একটু নিমিগ্ন হয়েও দৌড়ন্তস্বন্দর। কাছে গেলে সহজে চলে আসতে
 ইচ্ছে করে না। বুদ্ধির ঝলস বা বিত্তের জৌলুসের বাইরেও এমন এ-টি নিভৃত
 হৃদয় আছে যা মনকে আকর্ষণ করে, ভিড় সরিয়ে মনের অন্তরে বসিয়ে রাখে।
 যেটুকু তার স্থান ও যেটুকু তার সংস্থান তাইই মধ্যে তার সৌন্দর্যের অঙ্গিষ্ঠান
 দেখেছি। ঠিক গল্প নয়, কেছা শুনতে ও বলতে খুব ভালবাসে বিষ্ণু। এবং
 সে সব কাহিনীর মধ্যে যেটুকুতে দ্রবমুক্ত শেষ আছে সেটুকু আহরণ ও বিতরণ
 করে। স্মৃতিশক্তি প্রখর, তাই মজাদার কাহিনীর সঞ্চয় তার অফুরন্ত অল্প
 কথায় অনেক অর্থের সূচনা করতে জানে বলে বিষ্ণুর রচনায় নিঃসঙ্গ আবেগ,
 প্রোজ্জ্বল কাঠিগু।

“প্রগতি”তে তখন ‘পুরাণের পুনর্জন্ম’ লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও
 সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহঠাকুরতাই সে লেখার
 উদ্বোধন করেছেন। তাঁরই অন্তরঙ্গ বিষ্ণু “কল্লোনে,” ‘পৌরাণিক প্রশাধা’
 লিখলে—ভরতকে নিয়ে। প্রভু গুহঠাকুরতা ঢাকার দলের মুকুটমণি—ব্যক্তিত্ব-
 স্বাতন্ত্র্যে শোভনমোহন! ওঁর কাছ থেকে সাহিত্য-বিষয়ে পাঠ নেওয়া, বই
 পড়তে চাওয়া বা সিগারেট খেতে পাওয়া প্রায় একটা সম্মানের জিনিস ছিল।
 আমার তিরিশ-গিরিশের বাসায় যখন উনি প্রথমে আসেন, তখন মনে হয়েছিল

লক্ষীছাড়াদের দলে এ কোন লক্ষ্মীমন্ত রাজপুত্র! কিন্তু যিনি লক্ষীছাড়াদের গুরু
তাকে স্নানক্ষণাক্রান্ত মনে করার কোনো কারণ ছিল না। নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা
নৌকোর তিনিও অপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

“আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।

আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,

দ্বীপ আছে কি ভবমাগরে—

যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল ॥”

“খুঁপছায়া” বেরোয় এ সময়। আধুনিক সাহিত্যেরই পতাকাবাহী পত্রিকা।
সম্পাদক ডাক্তার রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় জুলে আমার আর প্রেমেনের সহপাঠী
ছিল। তাই আমাদের দলে টানল সহজেই। সেই টানে আমরা শু-দল থেকে
নতুন কয়েকজন লেখককে “কল্লোলে” নিয়ে এলাম। পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
আগেই এসেছিল, এবার এল সত্যেন্দ্র দাস, প্রণব রায়, ফণীন্দ্র পাল আর সুনীল
ধর। ভবের পদ্মপত্রে আরো ক’টি চকল জলবিন্দু। নবীনের দৌশ্কার্কাগে
কলমল।

“কল্লোলের” এ নব পথ্যটি আরো মধুর হয়ে উঠল। ছয়ার অলঙ্কণ খোলা
আছে, হে তরুণ, জরাহীন যৌবনের পূজারী, নবজীবনের বার্তাবহ, এখানে
তোমাদের অনন্ত নিমন্ত্রণ। বর্ষে-বর্ষে যুগে-যুগে আসবে এমনি এই যৌবনের
চেটে। ধ্বন-ধারণ-করণ-কারণ-না-জানা শাসন-বারণ-না-মানা নিঃস্বলের
দল। স্বপ্নের নিশান নিয়ে সত্যের চারণেরা! “কল্লোল” চিরযুবা বলেই
চিরজীবী।

সত্যেন্দ্র দাস কোথায় সরে পড়ল, থেকে গেল আর চার-জন, পাচুগোপাল,
প্রণব, ফণী আর সুনীল—“বন্ধু-চতুষ্টয়”। একটি সংযুক্ত প্রচেষ্টা ও একটি প্রীতি-
প্রেরিত একপ্রাণতা। যেন বিরাট একটা বস্তুর জল কোথায় গিয়ে নিভূতে
একটি স্তম্ভশীতল জলাশয় রচনা করেছে। “কল্লোল” উঠে গেলে আড্ডার
খোজে চলে এসেছি এই বন্ধু-চতুষ্টয়ের আশ্রয়। পেয়েছি সেই হৃদয়ের উষ্ণতা,
সেই নিবিড় এক্যবোধ। মনে হয়নি উঠে গেছে “কল্লোল”।

এই সময়ে নবগত বন্ধুদের সমাগমে “মহাকাল” নামে এক পত্রিকার
আবির্ভাব হয়। “শনিবারের চিঠি”র প্রত্যুত্তি। “শনিবারের চিঠি” যেমন
বাংলাসাহিত্যের অন্ধেরদের গাল দিচ্ছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ

চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র—তেমনি আরো ক'জন প্রকৃতাভাজনদের—যাদের প্রতি “শনিবারের চিঠির” মমতা আছে—তাদেরকে অপদস্থ করা। “মহাকালের” সঙ্গে আমি, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু সংশ্লিষ্ট ছিলাম। মহাকাল অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে মানুষের জীবনের ইতিহাস লেখে, কিন্তু এ “মহাকাল” যে কিছুকাল পরেই নিজের ইতিহাসটুকু নিয়ে কালের কালিমায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এ একটা মহাশাস্তি। বিবেচনা করে দেখলাম, যে সৃষ্টিকর্তা সে শুধু রচনাই করে, সমালোচনা করে না। গিনি আকাশ ভরে এত তারার দাপ জালিয়েছেন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র লেখেন না। মলিনাথের চেয়ে কালিদাস অতুলনীয়রূপে বড়। সৃষ্টিতে যে অপটু সে-ই পরের উচ্ছিষ্ট ঘাঁটে। নিজের পূর্ণতার দিকে না গিয়ে সে যা'য পরেব ছিড়াবেখনের দিকে। লেখক না হয়ে অবশেষে সমালোচক হয়।

নিন্দা করছে তো ককক। নিন্দার উত্তর কি নিন্দা? নিন্দার উত্তর, ভগ্নিষ্টের মত নিজের কাজ করে যাওয়া, নিজের ধর্মপথে দৃঢ়ত্ব থাকা। স্বভাব-চ্যুতি না ঘটানো, আত্মস্বরূপে অবস্থিতি কবা। এক কথায় চূপ কবে যাওয়া। অক্ষুরস্ত লেখা। ধ্যানবৃক্ষের ফল এই স্নকৃত্য। কর্মবৃক্ষের ফল এই সৃষ্টি। আর সংক্ষেপে, ধৈর্য ধবা। ধৈর্যই সব চেয়ে বড় প্রাথনা।

তাছাড়া, এমনতেও “মহাকাল” চলত না। তার কারণ অন্য কিছু নয়, এ ধরনের কাগজ চালাতে যে কূটনীতি দরকার তা তার জানা ছিল না। হেয়-র সঙ্গে উপাদেয়কে মিশিয়ে দেওয়া, লঘুও সঙ্গে গম্ভীর, বিস্তি-খেউডের সঙ্গে বৈরাগ্যশতক বা বেদান্তদর্শন। “শনিবারের চিঠি” এ বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। একদিকে মণিমুকুতার আবর্জনা, অন্যদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, মোহিতলাল মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রতন চান্দার ইত্যাদির প্রবন্ধ। অকুলীনকে আভিজাত্যের মুখোমুখি পড়ানো। এবং এ-দের পর্যন্ত যে, মোহিতলাল শিবস্তুব করতে বসলেন। কথাই আছে, শিশো ভূমি শিবং যজ্ঞে। ‘শনিবারের চিঠি’কে উদ্দেশ্য করে লিখলেন মোহিতলাল :

“শিব নাম জপ করি’ কালবার্তা পায় হয়ে যাও—

হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার।

নির-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—

ধ্বংস দেশ মহামারী।—এ আশানে কারে ডাক দাও ?

কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও ?
 সব মরা !—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
 প্রাণহীন বীর-বপু, উদ্বিগ্নে করিছে চীৎকার !
 কেহ নাই !—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও !

ছলভরা কলহাস্তে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
 ঈর্ষার অজস্র ফণা, অর্ধমগ্ন শবের দশনে
 বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলী ঘনায়—
 তবু পার হতে হ'বে, বাঁচাইতে হবে আপনায় ।
 নয় বক্ষে, পাল তু'র' একমাত্র উত্তরী-সমনে,
 ধর হাল—বন্ধ দ'রু' করাজলি, আডষ্ট আনৌ !”

আদিরসমিত্ত আধুনিক কীর্তনের এমনিভালে রাধ'-কৃষ্ণের নাম ঢুকিয়ে দেবার চতুৰতা দেখেছি ।

আরো দু'জন যথাক্রমে কবিতা-চিত্রে মত্ত এসে চলে গেল—“কল্লোলের” বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আর “দুপচ যাত্র” অরিন্দম বসু । বাসুদেব “কল্লোলের” বহু আড্ডা-পিকনিকে এনেছে, তেঁসে গেছে অনেক বড় হাসি—“ব'চত্রায়”ও তার লেখার জের চলেছে কিছুকাল । তারপর কোণায় চলে গেল আর ঠিকানা নেই । অরিন্দমও বেপাত্তা ।

এসেছিল অখিল সিয়োগী আর ময়ূখ যায় । ময়ূখকে যদিও সব সময় মনের মত করে পাওয়া যেত না কাছাকাছি, অখিলের ঘরের দবজায় খিল ছিল না । আমাদের বহুয়ের তো আবার একজন আর্টিস্ট চাষ্ট—আখলই আমাদের সেই চিত্তরঞ্জী চক্রবর্তী ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশি ও পরিমল গোস্বামীও “কল্লোলে” লিখেছেন । বিভূতিবাবু প্রায় নিয়মিত লেখকের মধ্যে । তাঁর অনেকগুলি গল্প “কল্লোলে” বেরিয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে কোনোদিন “কল্লোলে” আসেননি । যিনি হাসির গল্প লেখেন তিনি সকল দলেই হাসির খোরাক পান এবং কাজেকাজেই তিনি সকল দলের বাইরে । বা, তিনি সকল দলের সমান প্রিয় ।

শিবরাম তো হাসির গল্প লেখে, তবে তাকে “কল্লোলে”র দলে টানি কেন ? কারণ “কল্লোলে” সময়সময়ে শিবরাম বিপ্লবপ্রধান কবিতা লিখত । যার

কবিতার বইয়ের নাম “মাল্লুধ” আর “চুষন” সে তো সবিশেষ আধুনিক বই
ছ’খানি থেকে ছ’টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

“আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার

এই আলো এ বাতাস

যেন পরিহাস—

আমার সম্মান মোরে করে অপমান —

ভ্রূমতেও নাহি স্বথ, অস্বতেও নাহি অধিকার

—কে সহিবে আত্মার ধিকার !....

স্বথ নাই পূর্ণতায়, তিত্ত প্রেমসীর গুণধর,

সত্যতায় স্বথ নাই, শত কোটি নর বার পর—

এ জীবন এত স্বথহীন—বেদনাও পেথায় বিলাস !

কিংবা :

“গাহি জয় জননী রাতির ।

এ ভুবনে প্রথম গতির—

গাহি জয়—

যে গতির মাঝে ছিল জীবনের শত লক্ষ গতি

নিত্য নব আগাতর

অনন্ত বিস্ময় ।

অর্গ হতে আঁলি যে রসাতলে নেমে

সকলের পাপে আর সকলের প্রেমে...

গাহি জয় সে বিজয়িনীর !

যে বিপুল যে বিচিত্র যে বিনিদ্র কাম

গাহি জয়—তারই জয় ।”

হেমন্ত সরকার কল্লোল যুগের কেউ মন এতখ, বলতে রাজি নই । তিনি
আমাদের পক্ষে লেখেননি হয়তো কিন্তু বরাবর অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছেন ।
স্বভাষচন্দ্রের সতীর্থ, নজরুলের বন্ধু, হেমন্তকুমার চিরকাল বন্ধন-বশুতা-না-মানা

অমেয়জীবী যৌবনের পক্ষে। তাই তিনি বহুবার আমাদের সঙ্গে মিলেছেন, আমরাও তাঁর কাছ থেকে বহু আনন্দ নিয়ে এসেছি। উল্লাসে-উৎসবে বহু ক্ষণ-খণ্ড কেটেছে তার সাহচর্যে। তিনি বলতেন, যে কিছুই করে না, কিছুই বলে না, কিছুই হয় না, সেই শুধু নিন্দা এড়ায়। যে কিছু করে, বলে, বা হয়, সেই তো নিন্দা দ্বারা স্বীকৃত, সংবধিত। চলতে-চলতে একবারও পড়ব না এতে কোনো মহত্ব নেই, যতবার পড়ব ততবারই উঠব এতেই আসল মহত্ব। তাই যত গাল খাবে তত লিখবে। শত চিংকারেও ক্যারাভেন থামেনি কোনোদিন।

বর্ধমানের বলাই দেবশর্মার চিঠি নিয়ে কল্লোল-আপিসে আসে একদিন দেবকী বহু, বর্তমানে একজন বিখ্যাত ফিল্ম-ডিরেক্টর। চিঠিখানি পত্রবাহকের পরিচিতি বহন করেছে—‘ইনি আমার ‘শক্তি’ কাগজের সহকারী—অন্তরোধ—‘যদি এর লেখা তোমরা দয়া করে একটু স্থান দাও তোমাদের পত্রিকায়।’ ঠিক উদীয়মান নয়, উদয়-উন্মুখ দেবকী বোস বিনয়গলিত ভঙ্গিতে বলল “কল্লোলের” তক্তপোশে। দীনেশরঞ্জন হয়তো বুঝলেন, এর স্থান এই তক্তপোশে নয়, অলম্বে। দমদমে তখন ধীরে গাজুলিয়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম-কোম্পানি চালাচ্ছে, সেইখানে যাতায়াত ছিল দীনেশরঞ্জনের। দেবকী বোসকে সেখানে নিয়ে গেলেন দীনেশরঞ্জন। দেবকী বোস দেখতে পেল তার সাফল্যের সম্ভাবনা। সে আর ফিরল না। বলাই দেবশর্মার পরিচয়পত্র প্রত্নতত্ত্বে লীন হয়ে গেল।

সিনেমার ফল পেলে সাহিত্যিকের জগে বৃষ্টি কেউ আর পালায়িত হয় না। মদের স্বাদ পেলে মধুর সন্ধানে কে আর কমলবনে বিচরণ করে? এককালে দারিদ্র্য-পীড়িত লেখকের দল ভাগ্যদেবতার কাছ এই প্রার্থনাই করেছিল, জমিদারি-তেজারতি চাই না, শুধু অভাবের উদ্বেগ থাকতে দাও, এই ক্রেশক্রেদময় কায়ধাংগের উদ্বেগ। দাও শুধু ভদ্র পরিবেশে পবিমিত উপার্জন, যাতে স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন মনে পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করতে পারি। সাহিত্যই মুখ্য আর সব গৌণ। সাহিত্যই জীবনের নিশ্বাসবায়ু।

গল্পে নাকের বদলে নকন দিয়েছিল। ভাগ্যদেবতা সাহিত্যের বদলে সিনেমা দিলেন।

তেইশ

লিখছি, চোখের সামনে কম্পমান কুয়াশার মত কি-একটা এসে দাঁড়াল ভাসতে-ভাসতে। আস্তে-আস্তে সে শূন্যাকার কুয়াশা রেখায়িত হয়ে উঠল। অস্পষ্ট এক মানুষের মূর্তি ধারণ করলে। প্রথমে ছায়াময়, পরে শরীরী হয়ে উঠল।

অপরূপ সুন্দর এক যুবকের মূর্তি। যুবক, না, তাকে কিশোর বলব? ধোপদস্ত ধূতি-পাজাবি পরে এসেছে, পায়ে ঠনঠনের চটি। মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল। সেই শিথিল-স্থলিত কেশদামে তার গৌর মুখখানি মনোহর হয়েছে। ঠোঁটে বৈরাগ্যানির্মল হাসি, চোখে অপরিপূর্ণতার ঔদাস্য। হাতে কতকগুলি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি।

‘কে তুমি?’

‘চিনতে পাচ্ছ না?’ স্নানমুহুরেখায হাসল আগন্তুক : ‘আমি স্কুমার।’

‘কোন স্কুমার?’

‘স্কুমার সরকার।’

চিনতে পারলাম। কল্লোলের দলের নবীনতম অত্যাগত।

‘হাতে ও কী! কবিতা?’ প্রশ্ন করলাম মকৌতুহলে।

‘পৃথিবীতে যখন এসেছি, কবিতার জন্মেই তো এগেছি। কবিতাই তো পৃথিবীর প্রাণ, মানুষের মূর্তি। স্বর্গের অমৃতের চেয়েও পৃথিবীর কবিতা অমৃততর।’

‘কিসের কবিতা? প্রেমের?’

‘প্রেম ছাড়া আবার কবিতা হয় নাকি? তোমাদের এ সময়ে রুটি নিয়ে ঢের রোমাণ্টিসিজম চলেছে—কিন্তু যাই বলো, সব বিদেই মেটে, প্রেমের ক্ষুধাই অতৃপ্য। লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয় রাখল—এ তো কম করে বল। শুনবে একটা কবিতা? সময় আছে?’

তার পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল স্কুমার :

“সে হাসির আড়ালে রাখিব হুই সার খেত মৃতমালা,
রাঙা-রাঙা ক্ষীণ মণি-কণা পাশে-পাশে অন্ধিব নিরালা!
প্রাণের উড়ন্ত জলদে রচি এলো-কেশ নিরুপম,
সিঁথি দেব তম্বালের বনে সরিতেই শীর্ণ ধারা সম!

ললাট সে লাবণ্যবারিধি, সিঁছর প্রদীপ তার বুকে
 অলকের কালিমা-সন্ধ্যায় ভাসাইব তৃপ্তি ভরা স্থখে !
 বাহু হবে বসন্ত উৎসবে লীলায়িত বেতসের মত,
 স্পর্শনের শিহর-কণ্টকে দেবে মধুদংশ অবিরত !
 চম্পকের কুঁড়ি এনে এনে সৃষ্টি করি স্নন্দর আঙুল,
 শীর্ষদেশে দেব তাহাদের ছোট-ছোট বঁকা চন্দ্রকূল !
 সুষম্মুখী কুসুমের বুকে যে স্বর্ণ যৌবনের আশ
 নিঙাড়িয়া তার সর্বরস এঁকে দেব বক্ষের বিলাস !
 পরে অর্ধ হৃৎপিণ্ড মোর নিজ হাতে ছিন্ন করি নিয়া
 দেহে তব আনিব নিশ্বাস প্রেমমন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠিয়া !”

মুহূর্তে স্কুমারের উপস্থিতি দিব্যাক্রান্তিময় হয়ে উঠল। আর তাকে
 রেখার মধ্যে চেতনাবেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখা গেল না। মিলিয়ে গেল
 জ্যোতির্মণ্ডলে।

কতক্ষণ পরে বরের স্তব্ধতায় আবার কার সাড়া পেলাম। নতুন কে
 আরেকজন যেন ঢুকে পড়েছে জোর করে। অপারচিত, বিকটবিকৃত চেহারা।
 ভয় পাইয়ে দেবার মত তার চোখ।

‘না, ভয় নেই। আমি।’ আশ্বস্তমানো স্বরে বললে।

গলার আগুয়াজ যেন কোথায় গুনোছ। জিগগেস করলাম, ‘কে তুমি?’

‘আমি সেই স্কুমার।’

সেই স্কুমার? সে কি? এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ। তোমার সেই
 চম্পককান্তি কই? কই সেই অকণ-তারুণ্য? তোমার চুল শুককক, বেশবাস
 শর্তাচ্ছন্ন, নগ্ন পায়ে ধুলো—

‘বসব একটু এখানে?’

‘বসো।’

‘তুমি বসতে জায়গা দিলে তোমার পাশে? আশ্চর্য! কেউ আর জায়গা
 দেয় না। পাশে বসলে উঠে চলে যায় আচমকা। আমি স্থগ্য, অস্পৃগ।
 আমি কি তবে এখন ফুটপাতে শুয়ে মরব?’

‘কেন, তোমার কি কোনো অস্থখ করেছে?’

‘করেছিল। এখন আর নেই।’ বিজ্রমকুটিল কণ্ঠে হেসে উঠল স্কুমার।

‘নেই ?’

‘বহু কষ্টে সেরে উঠেছি ’

‘কি করে ?’

‘আত্মহত্যা করে ।’

‘সে কি ?’ চমকে উঠলাম : ‘আত্মহত্যা করতে গেলে কেন ?’

‘নৈরাশ্রের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলাম, মনোবিকারের শেষ আচ্ছন্ন অবস্থায় । সংসারে আমার কেউ ছিল না—মৃত্যু ছাড়া । আর একজন যে ছিল সে আমার প্রেম, যে অপ্রাপ্তব্য অলঙ্ঘ্য—যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষ-চক্ষে । সেই অন্ধ আবৃত মুখ উন্মোচিত করবার জন্তে তাই চলে এলাম এই নিজনে, এই অন্ধকারে—’

‘ফেন তোমার এই পরিণাম হল ?’

‘যিনি পরিণামপ্রদায়ী তিনি বলতে পারেন ।’ হোসল সুকুমার ‘যুগব্যাপির জর ঢুকেছিল আমার রক্তে, সব কিছু অস্বীকার করার হুঁসাহস । সমস্ত কিছু নিয়মকেই শঙ্কল বলে অমাত্য করা । তাই নিয়মহীনতাকে বরণ করতে গিয়ে আমি উচ্ছৃঙ্খলতাকেই বরণ করে নিলাম । আমার সে উচ্ছল উদার উচ্ছৃঙ্খলতা । অল্পপ্রাণ হিসেবী মনের মলিন মীমাংসা তাতে নেই, নেই তাতে আত্মরক্ষা করবার সংকীর্ণ কাপুরুষতা । সে এক নিবারণহীন অনাবৃতি । পড়ব তো মরব বলে ভয় করব না । বিদ্রোহ যখন করব তখন নিজের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করব । তাই আমার বিদ্রোহ সার্থকতম, পবিত্রতম বিদ্রোহ ।’ প্রদীপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সুকুমার ।

‘কিন্তু, বলো, কী লাভ হল তোমার মৃত্যুতে ?’

‘একটি বিপুল আত্মদ্রোহের স্বাদ তো পেলো । আর বুঝলে, যা প্রেম তাই মৃত্যু । জীবনে যে আবৃতমুখী মৃত্যুতে সে উন্মোচিত ।’

বলতে-বলতে সমস্ত কার্যমালিঙ্গ কেটে গেল সুকুমারের । অন্তরীক্ষের ধৌন্দবল জ্যোতির্জ্ঞান উপস্থিতিতে সে উপনীত হল । স্বপ্নের মধ্যে শুধু একটি কুমার-কোমল বন্ধুতার মেহম্পর্ষ এইল চিরস্থায়ী ব্যথ ।

শিশিরকুমার ভাড়াড়ির নাট্যনিকেতনে একদা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ‘শেষরক্ষা’ দেখতে । সেটা “কল্লোলের” পক্ষে একটা অরণীর রাত, কেননা সে অভিনয় দেখবার জন্তে “কল্লোলের” দলেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল । আমরা অনেকেই

সেদিন গিয়েছিলাম। অভিনয় দেখবার ফাঁকে-ফাঁকে বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি তাতে কখন ও কতটুকু হাসির রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। স্বভাবতই, অভিনয় সেদিন ভয়ানক জমেছিল, এবং ‘যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে’ গানের সময় অনেক দর্শকও হ্রস্ব মিলিয়েছিল মুক্তকণ্ঠে। শেষটার আনন্দের লহর পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। শিশিরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলেন কবির কাছে, অভিনয় কেমন লাগল তাঁর মতামত জানতে। সরল স্নিগ্ধ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘কাল সকালে আমাদের বাড়িতে যেও, আলোচনা হবে।’ আমাদের দিকেও নেত্রপাত করলেন : ‘তোমরাও যেও।’

দৌনেশদা, নূপেন, বুদ্ধদেব আর আমি—আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না—গিয়েছিলাম পরদিন। শিশিরবাবুও গিয়েছিলেন শুদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবার ঘরে একত্র হলাম সকালে। স্নানপাশে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন।

কি কি কথা হয়েছিল স্পষ্ট কিছু মনে নেই। ইংরিজি পাবলিক-কথ’টার রসাত্মক অর্থ করেছিলেন—লোকলগ্নী—এ শব্দটা গঁথে আছে। সেদিনকার সকালবেলার এই ছোট্ট ঘটনাটা উল্লেখ করাছি, আর কিছুর জন্তে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে কত মহিমাযুক্ত তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বলে। এমনভিত্তে শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি—অনেক উচ্চস্ব। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্তে হলেও, শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে বেন কোনোই প্রভেদ ছিল না। দেবতান্মা নগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ-তৃণ সবই সমান।

শরৎচন্দ্র এসেছিলেন একদিন “কল্লোলে”—“কালি-কলমে” একাধিক দিন।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপরে বরদা এজেন্সি অর্থাৎ কালি-কলম-আপিসের পাশেই আর্থ-পাবলিশিং হাউস। আর্থ পাবলিশিং-এর পরিচালক শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। শশাঙ্ক তখন “বাংলার কথায়” সাব-এডিটরি করে আর দোকান চালায়। বেলা দুটো পর্যন্ত দোকানে থাকে তারপর চলে যায় কাগজের আপিসে। বেস্পতিবার কাগজের আপিসে ছুটি, শশাঙ্ক সেদিন পুরোপুরি দোকানের বাসিন্দে।

‘মুরলী আছে? মুরলী আছে?’ শশাঙ্ক হয়ে শরৎচন্দ্র একদিন ঢুকে পড়লেন আর্থ-পাবলিশিং-এ।

দরজা ভুল করেছেন। লাগোয়া আর্থ-পাবলিশিংকেই ভেবেছেন বরদা এজেন্সি বলে।

এত ত্বরায় যে, দোকানের পিছন দিকে যেখানটায় একটু অন্তরাল রচনা করে শশাক বসবাস করত সেখানে গিয়ে সরাসরি উকি মারলেন। অথচ ঘরে চোকবার দরজার গোড়াতেই যে শশাক বসে আছে সে দিকে লক্ষ্য নেই। পিছন দিকের ঐ নিভৃত অংশে মুরলীকে পাওয়া যাবে কিনা বা কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে শশাককে একটা প্রশ্ন করাও প্রয়োজনীয় মনে করলেন না। মুরলী যে কী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা মুরলী জানে না—মুরলীকে এই দণ্ডে, এই মুহূর্তবিন্দুতে চাই। যেমন দ্রুত এসেছিলেন তেমনি স্মরণশক্তি চলে গেলেন।

গায়ে খদ্দেরের গলাবন্ধ কোট। তারই একদিকের পকেটে কী ওটা লুপ্ত বার করে রয়েছে?

বুঝতে দেয়ি হল না শশাকর। শরৎচন্দ্রের পকেটে চামড়ার কেসে মোড়া একটি আস্ত জলজ্যান্ত রিভলবার।

সবুজ লাইসেন্স পাওয়ার পর ঐ ভায়োলেন্ট বস্তুটি শরৎচন্দ্র তাঁর নন-ভায়োলেন্ট কোর্সের পকেটে এমন অবলোলায় কিছুকাল বহন করেছিলেন।

ওদিককার কোর্সের পকেটে আরো একটা জিনিস ছিল। সেটা কাগজে মোড়া। সেটা শশাক দেখেনি। সেটা শরৎচন্দ্রের ‘সত্য’ গল্পের পাণ্ডুলিপি।

ঐ গল্পটিই তিনি দিতে এসেছিলেন “কালি-কলমে”। তারই জন্তে অমনি হস্তদস্ত হয়ে খুঁজছিলেন মুরলীধরকে। মুরলীধরকে না পেয়ে সোজা চলে গেলেন ভবানীপুরে—“বঙ্গবাণীতে”। ‘সত্য’ পুস্তকস্পর্শ পড়ল না আর মসীচিহ্নিত “কালি-কলমে”।

এদিকে ঐ দিনই মুরলীধর আর শৈলজা সকালবেলার টেনে চলে এসেছে পানিডাস। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে শোনে, শরৎচন্দ্র সকালবেলার ট্রেনে চলে গিয়েছেন কলকাতা। এ যে প্রায় একটা উপন্যাসের মতন হল। এখন উপায়? ফিরবেন কখন? সেই রাত্রে। তাও ঠিক কি।

এতটা এসে দেখা না করে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। রাত্রে না হোক, পরদিন কিংবা কোনো একদিন তো ফিরবেন। স্মরণাৎ থেকে যাওয়া যাক। কিন্তু শুধু উপন্যাসে কি পেট ভরবে?

শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশের সঙ্গে শৈলজা ভাব ভাগিয়ে ফেলল। কাজেই থাকা বা যাওয়া-দাওয়ার কিছুই কোনো অস্ববিধে হল না।

রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি পালকির আশ্রয়াজ শোনা গেল। আসছেন শরৎচন্দ্র।

কি জানি কেমন ভাবে নেবেন তর করতে লাগল, দুই বন্ধুব। এত রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়ি আগলে আছে ধাপটি মেয়ে এ কেমনতর অতিথি।

পালকি থেকে নামতে লঠনটা তুলে ধরল শৈলজা। এমন ভাবে তুলে ধরল যাতে আলোর কিছুটা অন্তত তাদের মুখে পড়ে—যাতে তিনি এবট চিনলেও চিনতে পারেন বা। প্রত্যক্ষমান বিদেশী লোক দেখে পাছে কিঃ বিরক্তিব্যঞ্জক উক্ত করেন, তাই দ্রুত প্রণাম সেরেই মূল্যধর বলে উঠলেন ‘এই শৈলজা’, আর শৈলজাও সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিধান করল : ‘এই মূল্যদা।’

‘আরে, তোমরা?’ শরৎচন্দ্রের স্তম্ভিত ভাবটা নিমেষে কেটে গেল : ‘আমি যে আজ দুপুরে তোমাদের কালি-কলমেই গিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য—তোমরা এখানে? এলে কখন?’

হঃসংবাদটা চেপে গেলেন—ভাগ্যের কারসাজিতে কী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ‘কালি-কলম’। উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন আতিথেয়তার ঔদায়ে : ‘তবেশ হয়েছে—তোমরা এসেছ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো? অসুবিধে হয়নি তো কোনো? কি আশ্চর্য—তোমরা আমার বাড়িতে আব আমি তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা এইরকমই হয় সংসারে। একরকম ভাবি হয়ে ওঠে অপরকম। আচ্ছা, তোমরা বোসো, আমি জামা-কাপড় ছেড়ে খেয়ে আদি। কেমন?’

বলেই ভিতরে চলে গেলেন, এবং বললে বিশ্বাস হবে না, মিনিট পনেরো মধ্যেই বে রয়ে এলেন চটপট। তারপর স্তব্ধ হল গল্প—সে আর থামতে চায় না। মমতা করবার মত মনের মাগুয পেয়েছেন, পেয়েছেন ‘সুপ্তরঙ্গ বিবরণ-জীব আর জীবন—’তাকে আর কে বাধা দেয়! রাত প্রায় কাবার হতে চলল, তরল হয়ে এল অঙ্ককার, তবু তাঁর গল্প শেষ হয় না।

তাকে বারণ করবার লোক আছে ভিতরে। প্রায় ভোরের দিকে ডাক এল : ‘ওগো, তুমি কি আজ একটুও শোবে না?’

তক্ষুনি মূল্যদারা তাঁকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। যেতে-যেতেও কিছু দোর করে কেললেন। তাঁর লাইব্রেরি ঘরে মূল্যদাদের শোবার বিস্তৃত ব্যবস্থা করলেন। তাতেও যেন তাঁর তৃপ্তি নেই। বিছানার চারপাশ ঘুরে-ঘুরে নিজ হাতে মশারি গুঁজে দিলেন।

আমি একবার গিয়েছিলাম পানিত্রাস। একা নয়, শৈলজা আর প্রেমেনের সঙ্গে। ভাগ্য ভালো ছিল, শরৎচন্দ্র বাড়ি ছিলেন। আমি তো নগণ্য নেতিবাচক উপসর্গ, তবুও আমারও প্রতি তিনি স্নেহে দ্রবীভূত হলেন। সারা দিন আমবা ছিলাম তাঁর কাছে-কাছে, কত-কী কথা হয়েছিল কিছুই বিশেষ মনে নেই, শুধু তাঁর সেই সামান্যের সম্মুখিতি মনের মধ্যে এখনো লেগে আছে। আমাদের সেদিনকার বহুব্যঞ্জিত অরের থালায় যে অদৃশ্য হস্তের স্নেহ-সেবা-স্বাদ পরিবেশিত হয়েছিল তাও ভোলবার নয়।

কথায়-কথায় তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন : ‘কার জন্তে, কিসের জন্তে বেঁচে আছ ?’

মন্দিরের ঘণ্টার মত কথাটা এসে বাজল বুকের মধ্যে।

জীবনে কোথায় সেই জাগ্রত আদর্শ ? কে সেই মানসনিবাস ? কার সন্ধানে এই সম্মুখযাত্রা ?

আদর্শ হচ্ছে রাতের আকাশের সুদূর তারার মত। ওদের কাছে পৌঁছতে পারি না আমরা, কিন্তু ওদের দেখে সমুদ্রে আমরা আমাদের পথ করে নিতে পারি অন্তত।

সত্যরত হও, ধৃতব্রত। পার্বতী শিবের জন্তে পঞ্চানল জ্বলে পঞ্চতপ করেছিলেন। তপস্যা করেছিলেন পঞ্চমুণ্ডির উপর বসে। নিরুত্থান তপস্যা। ইন্ধন না থাকে, তবুও আগুন নিভবে না। হও নিরিন্দ্রনাগি।

যে শুধু হাত দিয়ে কাজ করে সে শ্রমিক, যে হাতের সঙ্গে-সঙ্গে মাথার খাটায় সে কারিগর, আর যে হাত আর মাথার সঙ্গে হৃদয় মেশায় সে-ই শো আর্টিস্ট। হও সেই হৃদয়ের অধিকারী।

“কালি-কলমের” আড্ডাটা একটু কঠিন গম্ভীর ছিল। সেখানে বখল ছিল বেশি, উপকথন কম। মানে ঘান বক্তা তাঁরই একলার সব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব। আর সব শ্রোতা, অর্থাৎ নিশ্চলজিহ্বর। সেখানে একাভিনয়ের ঐকপত্য। বক্তার আসনে বেশির ভাগই মোহিতলাল, নয়তো সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়তো কখনো-কখনো সুরেন গাঙ্গুলী, নয়তো কোনো বিরল অবসরে শরৎচন্দ্র। “কালি-কলমের” আড্ডায় তাই মন ভরত না। তাই “কালি-কলমের” লাগোয়া ঘরেই আধ-পাবলিশিং-এ আমরা আন্তে-আন্তে একটা মনোরম আড্ডা গড়ে তুললাম। অর্থাৎ “কালি-কলমের” সঙ্গে সংসর্গ রাখতে গিয়ে না শুধু তত্ত্বতর্ক নিয়েই বাড়ি ফিরি।

আর্থ-পাবলিশিং-এ জমে উঠল আমাদের ‘বারবেলা ক্লাব’। সেই ক্লাবের কেন্দ্রবিন্দু শশাঙ্ক। বৃহস্পতিবার শশাঙ্কের কাগজের আপিসে ছুটি, তাই সেদিনটা অহোরাত্রব্যাপী কীর্তন। এ শুধু সম্ভব হয়েছিল শশাঙ্কের ঔদ্যোগিক জ্ঞে। নিজে যখন সে কবি আর সৌভাগ্যক্রমে হৃদয়ে ও দোকানে যখন সে এতখানি পরিসরের অধিকারী, তখন বন্ধুদের একদিনের জগ্ন অস্ত্রত আশ্রয় ও আনন্দ না দিয়ে তার উপায় কি? দোকানের কর্তা বলতে সে-ই, আর নিশ্চয় সেটা বইয়ের দোকান আর দোতলার উপর বইয়ের দোকান বলে নিঃস্বঃ খদ্দেরের আনা-গোনাঃ আমাদের আড্ডার তালভঙ্গ হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এত লোকের গুলতানির মধ্যে শশাঙ্ক নিজে কোথাও স্পষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়ে নেই। মধ্যপদ হয়েও মধ্যপদলোপী সমাসের মতই নিজের অস্ত্রটুকুকে কুণ্ঠিত করে রেখেছে। এত নম্র এত নিরঙ্কর শশাঙ্ক! অধিসংকাবে হস্তেও সংই থেকে গেল চিরদিন, কারকত্বের কণামাত্র অভিমানকেও মনে স্থান দিল না।

সাহিত্যিক সাংবাদিক অনেকেই আসত সে আড্ডার “কল্লোল” সম্পর্কে এতাবং যাদের নাম করেছি তারা তো আমশোই, ত ছাড়া আসত প্রমোদ সেন, বিজয় সেনগুপ্ত, গোপাল সান্যাল, ফার্দু মুখোপাধ্যায়, নলিনীকিশোর গুহ, বারিদবরণ বসু, রামেশ্বর দে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সারানান্দ রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্রলাল ঘোষ, বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, অরিনাশ ঘোষাল, সন্ন্যাসী সাধুর্থা এবং আরো অনেকে। এ দলের মধ্যে দু’জন আমাদের অত্যন্ত অস্থির এসেছিল—বিবেকানন্দ আর অবিনাশ—দু’জনেই প্রথমে সাহিত্যিক পরে সাংবাদিক। বিবেকানন্দ তখন প্রাণময় প্রেম বা প্রেমময় প্রাণের কাণ্ড লেখে, আর ভাগ্যের প্রতিরোধ হয়ে জীবিকার সম্মানে ঘুরে বেড়ায় বৈতে বামুন আর বাড়াল—এই তিন ‘ব’ নিয়ে তার গর্ব, যেন ত্রিগুণাত্মক ত্রিশূল ধারণ করে সে দ্বিবিজয়ে চলেছে। আরো এক ‘ব’-এর সে অধিকারী—সে তার তেজস্ক্রান্ত নাম! মোটকথা হস্তী অথ রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গে পরিপূর্ণ সৈন্যক। অবিনাশ ক্রোধদয়রহিত একনিষ্ঠ সাধক—ফলাকাজ্জাহীন। সহায়সম্পন্ন না হয়েও উপায়কুশল। মলয় হাওয়ার আশায় সারাজীবন সে পাখা করতে প্রস্তুত, এত শুদ্ধবুদ্ধিমত্তার তার কাজ। সেই কাজের শুদ্ধিতে তার আর বয়স বাড়ল না কোনোদিন। এদিকে সে পবিত্র সমতুল।

বারবেলাক্লাবে, শশাঙ্কের ঘরে, আমাদের যুগযুগ মজলিস। কখনো

খুনহুটি, ছেলেমাছ'ব, কখনো বা বিস্কুট ইয়াকি। প্রমথ চৌধুরী মাঝে-মাঝে এসে পড়তেন। তখন অকালমেঘোদয়ের মত সবাই গভীর হয়ে যেতাম, কিন্তু সে-গাভীরে রসের ভিষান থাকত। এক-একদিন এসে পড়ত নজরুল। ভাঙা হারমোনিয়ম একটা জুটত এসে কোথেকে, চারদিক সরগরম হয়ে উঠত। ওর প্রথম কীর্তন 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া' এই বারবেলাকাবেই প্রথম শু শুনিয়ে গেছে। কোন এক পথের নাচুনী ভিক্ষুক মেয়ের থেকে শিখে নিয়েছিল স্বর, তারই থেকে রচনা করলে—"ক্ষমুক্ষু ক্ষমুক্ষু কে এলে নুপুর পার", আর তা শোনার জগ্রে সটান চলে এল রাস্তার প্রথম আস্তানা শশাঙ্কর আখড়াতে।

এত জনসমাগম, তবু যেন "কল্লোলের" মত জমত না। জনতার জগ্রেই জমত না। জনতা ছিল, কিন্তু ঘনতা ছিল না। আকস্মিক হলোড় ছিল খুব, কিন্তু "কল্লোলের" সেই আকস্মিক স্তব্ধতা ছিল না। যেন এক পরিবারের লোক এক নৌকোয় বাচ্ছি না, ছত্রিশ জাতের লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলেছি এক জাহাজে, উত্তেজ-উদ্বেল জল ঠেলে।

তবু নজরুল নজরুল। এদে গান ধরলেই হল, সবাই এক অলক্ষ্য স্বরে বাঁধা পড়ে যেতাম। যৌবনের আনন্দে প্রত্যেক হৃদয়ে বহুতার স্পন্দন লাগত, যেন এক বৃক্ষে পল্লব-পরস্পরায় বসন্তের শিহরন লেগেছে। একবার এক দোল-পূর্ণিমায়ে ত্রিগ্রামপুরে গিয়েছিলাম আমরা অনেকে। বোটানিক্যাল গার্ডেনস পর্যন্ত নৌকে। নিয়েছিলাম। নির্ঘেব আকাশে পর্যাপ্ত চন্দ্র—সেই জ্যোৎস্না সত্যি-সত্যিই অমৃততরঙ্গিনী ছিল। গঙ্গাবক্ষে সে রাত্রিতে সে নৌকোয় নজরুল অনেক গান গেয়েছিল—গজল, ভাটিয়ালি, কীর্তন। তার মধ্যে 'আজি দোল-পূর্ণিমাতে ঢলবি তোরা আয়', গানখানির স্বর আজও স্মৃতিতে মধুর হয়ে আছে। সেট অনির্বাচনীয় পরিপার্শ্ব, সেই অবিস্মরণীয় বন্ধুসমাগম, জীবনে বোধহয় আর দ্বিতীয় বার ঘটবে না।

চকিবল

তারাক্ষরেরও প্রথম আবির্ভাব "কল্লোলে"।

অজ্ঞাত-অথাত তারাক্ষর। হয়তো পৈত্রিক বিষয় দেখবে, নয়তো কয়লাখাদের ওভারম্যানি থেকে শুরু করে পারমিট-ম্যানেজার হবে। কিংবা বড় জোর স্বদেশী করে এক-আধবার জেল খেটে এসে মন্ত্রী হবে।

কিন্তু বাংলা দেশের ভাগ্য ভালো। বিধাতা তার হাতে কলম তুলে দিলেন, কেরানি বা খাজাকির কলম নয়, শ্রেষ্টার কলম। বেঁচে গেল তারাশঙ্কর। শুধু বেঁচে গেল নয়, বেঁচে থাকল।

সেই মামুলি রাস্তায়ই চলতে হয়েছে তারাশঙ্করকে। গাঁয়ের সাহিত্য-সভায় কবিতা পড়া, কিংবা কাকুর বিয়েতে প্রীতি-উপহার লেখা, যার শেষ দিকে ‘নাথ’ বা ‘প্রভু’কে লক্ষ্য করে কিছু ভাবাবেশ থাকবেই। মাঝে-মাঝে ওর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে হত না তা নয়। ডাক-টিকিটসহ কবিতা পাঠাতে লাগল মাসিকপত্রে। কোনোটা ফিরে আসে, কোনোটা আবার আসেই না—তার মানে, ডাক-টিকিটসহ গোটা কবিতাটা লোপাট হয়ে যায়। এই অবস্থায় মনে শ্মশানবৈরাগ্য আসার কথা। কিন্তু তারাশঙ্করের সহিষ্ণুতা অপরিমেয়। কবিতা ছেড়ে গেল সে নাট্যশালায়।

গাঁয়ে পাকা স্টেজ, অটেল সাজ-সরঞ্জাম, মায় ইলেকট্রিক লাইট আর ডায় নাযো। যাকে বলে ষোল কলা। সোঁদকার সখের থিয়েটারের উৎসাহে যে একটু তেজালো হবে তাতে সন্দেহ কি। নির্মলশিব বন্দোপাধ্যায় ছিলেন সেই নাট্যসভার সভাপতি—তার নিজের সাহিত্যসাধনার মূলধারা ছিল এই নাট্য সাহিত্য। তা ছাড়া তিনি কৃতকীর্তি—তার নাটক অভিনীত হয়েছে কলকাতায়। তারাশঙ্কর ভাবল, এটাই বুঝি সুগম পথ, অর্থাৎ নাটক লিখে একেবারে পাদ প্রদৌদের সামনে চলে আসা। খ্যাতির ঝিলক না পেলে সাহিত্য বোধহয় জলের তিলকের মতই অসার।

নাটক লিখল তারাশঙ্কর। নির্মলশিববাবু তাকে সানন্দে সংবর্ধনা করলেন—সখের থিয়েটারের দুখী-সারথিরাও উৎসাহে-উত্তেজিত হয়ে উঠল। মঞ্চস্থ করলে নাটকখানা। বইটা এত জমল যে নির্মলশিববাবু ভাবলেন একে গ্রামেবাসীমানা পেরিয়ে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া দরকার। তদানীন্তন আর্ট-থিয়েটারের চাইদের সঙ্গে নির্মলশিববাবুর দ্বন্দ্বম-মহরম ছিল, নাটকখানা তিনি তাদের হাতে দিলেন। মিটমিটে জোনাকির দেশে এসে তারাশঙ্কর বিদ্যাবদীপছাত্তর স্বপ্ন দেখলো। আর্ট থিয়েটার বহুখানি মধ্যস্থ প্রত্যক্ষ করলে, বঙ্গ বাঙাল্য অনধীত অবস্থায়ই। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলশিববাবুর কানে একটু গোপনগুঞ্জনও দেওয়া হল : ‘মশাই, আপনি জমিদার মাছুষ, আমাদের বন্ধুলোক, নাট্যকার হিসেবে ঠাইও পেয়েছেন আসরে। আপনার নিজের বই হয়, নিয়ে আসবেন, যে করে হোক নামিয়ে দেব। তাই বলে বন্ধুবান্ধব শালা-জামাই আনবেন না ধরে-ধরে।’

নির্মলশিবাবু তারশঙ্করে মায়াশঙ্কর।

সবিধাদে বইখানি ফিরিয়ে দিলেন তারশঙ্করকে। ভেবেছিল কথামূলি আর শোনাবেন না, কিন্তু কে জানে ঐ কথামূলিই হয়তো মস্তেয় মস্ত কাজ করবে। তাই না শুনিয়ে পারলেন না শেষ পর্যন্ত, বললেন, তুমি নাকি অপাঙ্করে, তুমি নাকি অনধিকারী। রক্তমঞ্চে তোমার স্থান হল না তাই, কিন্তু আমি জানি তোমার স্থান হবে বঙ্গমালঞ্চে। তুমি নিরাশ হয়ে না। মনোভঙ্গ মানায় না তোমাকে।

স্কোকাব্যের মত মনে হল। রাগে-দুঃখে নাটকখানিকে জলজ উত্তরের মধ্যে গুঁজে দিল তারশঙ্কর।

ভাবল সব চাই হয়ে গেল বুঝি। প্রাদুর্ভূতের আগে বুঝি সব নিবে গেল। হয়তো গিয়ে ঢুকতে হবে বয়লাখাদের অন্ধকারে, কিংবা জঘিনারি সেরেফার ধুলো-কাদাব মধ্যে। কিন্তু সেই গতাভ্যুতীত শ্রীষ্ট। নয়তো গলায় তিনকরা তুলসীর মালা দিয়ে সোজা বৃন্দাবন।

কিন্তু না পথের নির্দেশ পোয় গেল তারশঙ্কর। তার অস্ব-সামান্য তার হল।

কিন্তু মাঝে মাঝে স্বদেশে বাজে গিয়েছে এক মফস্বী লোক। এঁর উকিলের বাড়ির বৈঠকখানায় তত্ত্বশেষের এক বায়ে চান্দর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে-শুয়ে আর সময় কাটান — কিছু একটা পড়তে দেবে মন্দ হবে না। যেমন ভাবনা তেমন সিদ্ধি। যেয়ে দেখবে মতামতের তরঙ্গ। একটা চাপানো কাগজমণ্ডন পড়ে আছে নিলাম হস্তাহার ফাইল। কিছু হলেই হয়। কাগজটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল তারশঙ্কর। দেখল মনে ভেঙে, বুলোমাথা একখানা “ফার্ম-কলম”।

নামটা আশ্চর্যকর নতুন। যেন অনেক শক্তি বটে বলে। এক সহজ টেলিটে-পালটে দেখতে লাগল তারশঙ্কর। এক এন্ট রিচিও-১৭২২ গল্প দেখে থমকে গেল। গল্পের নাম ‘পোনাঘাট পোরণ’—হ্যাঁ লেগবে নামের দুঃসাহসী—প্রেমেন্দ্র সিংহ।

এক নিশ্বাসে গল্পটা শেষ হয় গেল। একটা অণু আশ্বাদ পেলে তারশঙ্কর, যেন এক নতুন সাম্রাজ্য আবিষ্কার করলে। যেন তার প্রজ্ঞানন্দ তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল। খুঁজে পেল সে মাটিকে, মনির অথচ মহিমার মাটি, খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাধের মানুষ। পাত্তের মধ্যে খুঁজে

পেল সে শাস্ত আত্মার অমৃতপিপাসা। উঠে বসল তারাশঙ্কর। যেন তার মগ্নচৈতন্য হল!

‘স্বাহ স্বাহ পদে পদে।’ পৃষ্ঠা ওলটাতে-ওলটাতে পেল সে আরেকটা গল্প। শৈলজানন্দের লেখা। গল্পের পটভূমি বীরভূম, তারাশঙ্করে নিজের দেশ। এ যে তারাই অন্তঃকথা কাহিনী—একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা! মনের স্বপ্নাংশ মিশিয়ে সহজকে এত সত্য কবে প্রকাশ করা যায় তা হলে! এত অর্থায়িত করে। বাংলা সাহিত্যে নবীন জীবনের আভাস-আস্বাদ পেয়ে জেগে উঠল তারাশঙ্কর। মনে হল হঠাৎ নতুন প্রাণের প্লাবন এসেছে—নতুন দর্শন নতুন সজ্ঞান নতুন জিজ্ঞাসার প্রদীপ্তি—নতুন বেগবোধের প্রবলতা। সাধ হল সেও এই নতুনের বন্ধ্যায় গা ভাসায়। নতুন রসে কলম ডুবিয়ে গল্প লেখে।

কিন্তু গল্প কই? গল্প তোমার আকাশে-বাতাসে মাঠে-মাটিতে হাটে-বাজারে এখানে-সেখানে। ঠিক মত তাকাও, ঠিক মত শোনো, ঠিক মত বুকের মধ্যে অনুভব করো।

বৈষয়িক কাজে ঘুরতে-ঘুরতে তারাশঙ্কর তখন এসেছে এক চাষী-গাঁয়ে। যেখানে তার আস্তানা তার সামনেই রসিক বাড়লের আখড়া! সরোবরের শোভা যেমন পদ্ম, তেমনি আখড়ার শোভা কমলিনী বৈষ্ণবী।

প্রথম দিনই কমলিনী এসে হাজির—কেউ না ডাকতেই। হাতে তার একটি রেকাবি, তাতে দুটি সাজা পান আর কিছু মশলা। রেকাবিটি তারাশঙ্করের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে গড় হয়ে, বললে, ‘আমি কমলিনী বৈষ্ণবী, আপনাদের দাসী।’

শ্রবণলোভন কণ্ঠস্বর। অতুল-অপরূপ তার হাসি। সে-হাসিতে অনেক গভীর গল্পের কথকতা।

কি-একটা-কাজে ঘরের মধ্যে গিয়েছে তারাশঙ্কর, স্তন্যে গোমস্তা কমলিনীর সঙ্গে রসিকতা করছে, বলছে, ‘বৈষ্ণবীর পানের চেয়েও কথা মিষ্টি—তার চেয়েও হাসি মিষ্টি—’

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কমলিনীর মুখ। সহজের স্বপ্নাংশ মাখানো সে মুখে। যেন বা সর্বসমর্পণের শান্তি। মাথার কাপড়টা আরো একটু টেনে নিয়ে আরো একটু গোপনে থেকে সে হাসল। বললে, ‘বৈষ্ণবের গুটী তো সবল প্রভু।’

কথাটা লাগল এসে বাঁশির সুরের মত। সে সুর কানের নয়, মর্মের—

কানের ভিতর দিয়ে যা মর্মে এসে লেগে থাকে। শুধু শ্রোত্রের কথা নয়, যেন তত্ত্বের কথা—একটি সহজ সরল আচরণে গহন-গুঢ় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রকাশ। কোন সাধনার এই প্রকাশ সম্ভবপর হল—ভাবনায় ভোর হয়ে গেল তারাশঙ্কর। মনে নেশার ঘোর লাগল। এ যেন কোন আনন্দবশাশ্রয় গভীর প্রাপ্তির স্পর্শ।

এল বুড়ো বাউল বিচিত্রবেশী রসিক দাস। যেমন নামে ধামে তেমনি কথায়-বার্তায়, অতুল্য রসিক সে। আনন্দ ছাড়া কথা নেই। সংসাবে সৃষ্টিও মায়া সংহারও মায়া—সুতরাং সব কিছুই আনন্দময়।

‘এ কে কমলিনীর ?’

‘কমলিনীর আখড়ায় এ ঝাড়ুদার। সকাল-সন্ধ্যায় ঝাড়ু দেয়, জল তোলে, বাসন মাজে—আর গান গায়। মহানন্দে থাকে।’

তারাশঙ্কর ভাবলে এদের নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়। এ মধুবতাবসাধন—অদ্বায়ুক্ত শাস্তি—এর রসতত্ত্ব কি কোনো গল্পে জীবন্ত করে রাখা যায় না ?

কিন্তু শুরু করা যায় কোথেকে ?

হঠাৎ সামনে এল আধ-পাগলা পুলিন দাস। ছন্নছাড়া বাউল।

রাতে চুপচাপ বসে আছে তারাশঙ্কর, কমলিনীর আখড়ার কথাশতা তার কানে এল।

পুলিন আড্ডা দিচ্ছিল ওখানে। বাড়ি যাবার নাম নেই। রাত নিরুন্ম হয়েচে অনেকক্ষণ।

কমলিনী বলছে, ‘এবার বাড়ি যাও।’

‘না।’ পুলিন মাথা নাড়ছে।

‘না নয়। বিপদ হবে।’

‘বিপদ ? কেনে ? বিপদ হবে কেনে ?’

‘গোসা করবে। করবে নয় করেছে এতক্ষণ।’

‘কে ?’

‘তোমার পাঁচসিকের বোঁটুঁমি।’ বলেই কমলিনী ছড়া কাটল : ‘পাঁচসিকের বোঁটুঁমি তোমার গোসা করেছে হে গোসা কবেছে—

তারাশঙ্করের কলমে গল্প এসে গেল। নাম ‘রসকলি’। গল্পে বসিয়ে দিলে কথাগুলো।

তারপর কি করা ! সব চেয়ে যা আকাজক্ষনীয়, “প্রবাসী”তে পাঠিয়ে দিল তারাশঙ্কর। সেটা বোধ হয় বৈশাখ মাস, ১৩৩৪ সাল। সঙ্গে ডাক-টিকিট

ছিল, কিন্তু মামুলি প্রাপ্তিসংবাদও আসে না। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠও যায়-যায়, কোনো খবর নেই। অগত্যা তারাশঙ্কর জোড়া কার্ডে চিঠি লিখলে। কয়েকদিন পরে উত্তর এল—গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাদ্বীন আছে। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ়, আষাঢ়ের পর—আবার জোড়া কার্ড ছাড়ল তারাশঙ্কর। উত্তর এল, সেই একই বয়ান—সম্পাদক বিবেচনা করছেন। ভাত থেকে পোঁষে আরো পাঁচটা জোড়াকার্ডে একই খবর সংগৃহীত হল—সম্পাদক এখনো বিবেচনাময়! পোঁষের শেষে তারাশঙ্কর জোড়া পায়ে একেবারে হাজির হল “প্রবাসী” আপিসে।

‘আমার গল্পটা’—সভয় বিনয়ে প্রশ্ন করল তারাশঙ্কর।

‘ওটা এখনো দেখা হয়নি।’

‘অনেক দিন হয়ে গেল—’

‘তা হয়। এ আর বেশি কি! হয়তো আরো দেরি হবে।’

‘আরো?’

‘আরো কতদিনে হবে ঠিক বলা কঠিন।’

একমুহূর্ত ভাবল তারাশঙ্কর। কাঁচের বাসনের মত মনের বাসনাকে ভেঙে চূরশার করে দিলে। বললে, ‘লেখাটা তাহলে ফেরৎ দিন দয়া করে।’

বিনাবাক্যব্যয়ে লেখাটি ফেরৎ হল। পথে নেমে একটা দীর্ঘখান ফেলল তারাশঙ্কর। মনে মনে সংকল্প করল লেখাটাকে নাটকের মতন অগ্নিদেবতাকে সমর্পণ করে দেবে, বলবে : হে অগ্নি, শেষ অর্চনা গ্রহণ কর। মনের সব মোহ লাগ্তি নিমেষে ভস্ম করে দাও। আর তোমার তীব্র দীপ্তিতে আলোকিত কর জীবনের সত্যপথ।

অগ্নিদেবতা পথ দেখালেন। দেশে ফিরে এসেই তারাশঙ্কর দেখা ব কলেরা লেগেছে। আগুন পুড়ের কথা, কোথাও এতটুকু তৃষ্ণার জল নেই। দু’হাত খালি, সেবা ও স্নেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারাশঙ্কর। গল্পটাকে ভণ্ডাকৃত করার কথা আর মনেই রইল না। বরং দেখতে পেল সেই পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান ও অসহায়তার মধ্যে আরো কত গল্প। আরো কত জীবনের বাধ্যন।

একদিন গাঁয়ের পোস্টাপিসে গিয়েছে তারাশঙ্কর। একদিন কেন প্রায়ই যায় সেখানে। গাঁয়ের বেকার ভবঘুরেদের এমন আড্ডার জায়গা আর কি আছে! নিছক আড্ডা দেওয়া ছাড়া আরো দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক, দলের চিঠিপত্র সত্ত-সত্ত পিণ্ডনের হাত থেকে সংগ্রহ করা; দুই, মাসিক-পত্রিকা-কোরং

লেখাগুলো গায়ের কাপড়ে ঢেকে চুপিচুপি বাড়ি নিয়ে আসা। অমনি একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল একটা চমৎকার ছবি-আঁকা মোড়কে কি-একটা খাতা না বই। এসেছে নির্মলশিবাব্যুর ছোট ছেলে নিত্যনারায়ণের নামে। নিত্যনারায়ণ তখন স্কুলের ছাত্র, রাশিয়া-ভ্রমণের খ্যাতি তখনো তার জয়টীকা হয়নি। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল তারাক্ষর। এ যে মাসিক পত্রিকা। এমন সুন্দর মাসিক পত্রিকা হয় নাকি বাংলাদেশে! চমৎকার ছবিটা প্রচ্ছদপটের—সমুদ্রতটে নটরাজ নৃত্য করছেন, তাঁর পদপ্রান্তে উদ্ভাসিত মহাসিন্ধু তাণ্ডবতালে উদ্বেলিত হচ্ছে—ধ্বংসের সংকেতের সঙ্গে ও কি নতুনতরো সৃষ্টির আলোড়ন! নাম কি পত্রিকার? এক কোণে নাম লেখা: “কল্লোল”। কল্লোল অর্থ শুধু ঢেউ নয়, কল্লোলের আরেক অর্থ আনন্দ।

ঠিকানাটা টুকে নিল তারাক্ষর। নতুন বাঁশির নিশান সুনলে সে। মনে পড়ে গেল ‘রসকলি’র কথা—সেটা তো পোড়ানো হয়নি এখনো। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে গল্পের শেষ পৃষ্ঠাটা সে নতুন করে লিখলে। ও পৃষ্ঠার পিঠে “প্রদীপী”তে পাঠাবার সম্বন্ধে পোস্টমার্ক পড়েছে, তাই ওাকে বদলানো দরকার—পাছে এক জায়গায় ফেরৎ লেখা অন্য জায়গায় না অকটিকর হয়। জয় হুগো বলে পাঠিয়ে দিল লেখাটা। যা থাকে অদৃষ্টে।

অলৌকিক কাণ্ড—চারদিনেই চিঠি পেল তারাক্ষর। শাদা পোস্টকার্ডে লেখা। সে-কালে শাদা পোস্টকার্ডের আভিযাত্র্য ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় সমবন্ধ আত্মীয়তার স্বর। নোণের দিকে গোল মনোগ্রামে কল্লোল” জাণী, ইতিতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। মোটামুট, গবর কি? গবর অশার অধিক লভ—গল্পটি মনোনীত হয়েছে। আরো সুখদায়ক, আসছে ফাল্গুনেই ছাপা হবে। শুধু ‘শাই’ নয়, চিঠির মাঝে নিতুল নেই অন্তর্জ্ঞানের স্পর্শ যা স্পর্শমণির মত কাজ করে; ‘এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?’

পবিত্র চিঠির ঐ লাইনটিই তারাক্ষরের জীবনে মজাবনীব বাজ করলে। যে আগুনে সমস্ত সংকল্প ভস্ম হবে বলে ঠিক করেছিল সেই আগুনই জ্বাললে এবার আত্মসিকা শিখা। সত্য পথ দেখতে পেল তারাক্ষর। সে পথ সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ। যোগশাস্ত্রের ভাষায় ব্যাখ্যানের পথ। পাবত্রর চিঠির ঐ একটি লাইন, “কল্লোলের” ঐ একটি স্পর্শ, অসাধ্যসাধন করল—যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল ঐক্যগ্র, যেখানে বিমর্ষতা, সেখানে প্রসন্ন-সমাধি। যেন নতুন করে গীতার বাণী বাহিত হল তার কাছে : তন্ম্যং ত্ৰুত্বিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিতা শত্রুণ ভুজ্জু রাজ্যং সমৃদ্ধং—তারশঙ্কর দৃঢ়পরিকর হয়ে উঠে দাঁড়াল।
আগুনকে সে আর ভয় করলে না। জীবনে প্রজ্জলিত অগ্নিই তো গুরু।

‘রসকলি’র পর ছাপা হল ‘হারানো স্বর’। তার পরে ‘হুলপদ্ম’।
মাঝখানে তারুণ্যবন্দনা করলে এক মাজল্যসূচক কবিতায়। সে কবিতায়
তারশঙ্কর নিজেকে তরুণ বলে অভিখ্যা দিলে এবং সেই সম্বন্ধে “কল্লোলের”
সঙ্গে জানালে তার ঐকাত্ম্য। যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম, তেমনি তারুণ্য
থেকেই “কল্লোলের” আবির্ভাব। তারুণ্য যখন বর্ষ বিদ্রোহ ও বলবতার
উপাধি। বিকৃতি যা ছিল তা শুধু শক্তির অসংযম। কিন্তু আসলে সেটা
শক্তিই, অমিততেজার ঐশ্বর্য। সেই তারুণ্যের জয়গান করলে তারশঙ্কর।
লিখলে :

“হে নূতন জাগরণ, হে ভীষণ, হে চির-অধীর,
হে ঋতুর অগ্রদূত, বিদ্রোহের ধ্বজবাহী বীর...
ঝঞ্ঝার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,
সেখা তুমি জীর্ণ নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,
হে স্মরণ, হে ভীষণ, হে তরুণ, হে চারু কুমার,
হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার ॥”

এর পর একদিন তারশঙ্করকে আসতে হল কল্লোল-আপিসে। যেখানে
তার প্রথম পরিচিতির আয়োজন করা হয়েছিল সেই প্রশস্ত প্রাক্ষণে! কিন্তু
তারশঙ্কর যেন অনুভব করল তাকে উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে বরণ-বর্ধন করা হচ্ছে না।
একটু যেন মনোভঙ্গ হল তারশঙ্করের।

বৈশাখ মাস, দুপুর বেলা। তারশঙ্কর কল্লোল-আপিসে পদার্পণ করলে।
ঘরের এক কোণে দীনেশরঞ্জন, আরেক কোণে পবিত্র চেয়ার-টেবিলে কাজ
করছে, তন্তুপোশে বসে আছে শৈলজানন্দ। আলাপ হল সবার সঙ্গে, কিন্তু
কেমন যেন ফুটল না সেই অন্তরের আলাপী চক্ষু। পবিত্র উঠে নমস্কার জানিয়ে
চলে গেল, কোথায় কি কাজ আছে তার। দীনেশরঞ্জন আর শৈলজা কি-
একটা অজ্ঞাত কোডে চালাতে লাগল কথাবার্তা। তারশঙ্করের মনে হল
এখানে সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। “কল্লোল”-এর লেখকদের মধ্যে
তখন একটা দল বেঁধে উঠেছিল। তারশঙ্করের মনে হল সে বৃষ্টি সেই দলের
বাইরে।

কবিতা আওড়াতে-আওড়াতে উসকো-খুসকো চূলে স্বপ্নালু চোখে ঢুকল এসে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। একহাতে দইয়ের ভাঁড়, কয়েকটা কলা, আরেক হাতে চিঁড়ের ঠোঁড়। জ্বিনিসগুলো রেখে মাথার লম্বা চুল মচকাতে-মচকাতে বললে, ‘চিঁড়ে খাব।’

দীনেশরঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিলেন। চোখ বুজে গভীরে যেন কি রসাস্বাদ করলে নৃপেন। তদগতের মত বললে, ‘বড ভাল লেগেছে ‘বসকলি’। খাসা!’

ঐ পর্যন্তই।

কতক্ষণ পরে উঠে পড়ল তারাশঙ্কর। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে।

ঐ একদিনই শুধু। তারপর আর যায়নি কোনোদিন ওদিকে। হয়তো অন্তরে-অন্তরে বুঝেছে, মন মেলে তো মনের মাত্রা মেলে না। “কল্লোলে” লেখা ছাপা হতে পারে কিন্তু “কল্লোলের” দলের সে কেউ নয়।

অন্তত উত্তরকালে তারাশঙ্কর এমনি একটা অভিযোগ করেছে বলে শুনেনি। অভিযোগটা এই “কল্লোল” নাকি গ্রহণ করেনি তারাশঙ্করকে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়, কিংবা এক দিক থেকে যথার্থ হলেও আরেক দিক থেকে সংকুচিত। মোটে একদিন গিয়ে গোটা “কল্লোলকে” সে পেল কোথায়? প্রেমেন-প্রবোধের সঙ্গে বা আমার সঙ্গে তার তো চেনা হল প্রথম “কালি-কলমের” বারবেলা আসরে। বুদ্ধদেবের দাঙ্গা আদৌ আলাপ হয়েছিল কি না জানা নেই। তা ছাড়া “কল্লোলের” সুরের সঙ্গে যার মনের তার বাঁধা, সে তো আপনা থেকেই বেজে উঠবে, তাকে সাধ্যসাধনা করতে হবে না। যেমন, প্রবোধও পরে এসেছিল কিন্তু প্রথম দিনেই অন্তকূল ঔৎসুক্যে বেজে উঠেছিল, ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ঢেউ হয়ে। তারাশঙ্কর যে মিশতে পারেনি তার কারণ আস্থানের অনাস্তরিকতা নয়, তান্ধি নিজের বহিঃস্থিত। আসলে সে বিজ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির, সে স্বৈর্ঘ্যের। উত্তাল উমিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা, বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।

দল যাই হোক, “কল্লোল” যে উদার ও গুণবাহী তাতে সন্দেহ কি। নবীনপ্রবণ ও রমবুদ্ধিসম্পন্ন বলেই তারাশঙ্করকে স্থান দিয়েছিল, দিয়েছিল বিপুল-বহুল হবার প্রেরণা। সেদিন “কল্লোলের” আস্থান না এসে পৌঁছলে আরো অনেক লেখকেরই মত তারাশঙ্করও হয়তো নিদ্রানিম্নিত থাকত।

তারাশঙ্করে তখনো বিপ্লব না থাকলেও ছিল পুরুষকার। এই পুরুষকারই

চিরদিন তারাশঙ্করকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। পুরুষকারই কর্মযোগীর বিভূতি। কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নি উদ্দীপিত হয় কাষ্ঠের সংঘর্ষে, তেমনি প্রতিভা প্রকাশিত হয় পুরুষকারের প্রাবল্যে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে দৈবও অকৃত্য! নিষ্ঠার আসনে অচল অটল স্তম্ভকবৎ বসে আছে তারাশঙ্কর—সাহিত্যের সাধনার থেকে একচূন তার বিচ্যুতি হয়নি। ইহাসনে শুষ্কত্ব মে শরীর—তারাশঙ্করের এই সংকল্পসাধনা। যাকে বলে স্বস্থানে নিঃশব্দতা—তাই সে রেখেছে চিরকাল। তীর্থের সাজ সে এক মুহূর্তের জন্তোও ফেলে দেয়নি গা থেকে। ছাত্রের তপস্যায় সে দটনিশ্চয়। স্থিরপদে চলেছে সে পর্বতারোহণে। সম্প্রতি এত বড় ইষ্টনিষ্ঠা দেখিনি আর বাংলা সাহিত্যে।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীও “কল্লোলের” প্রথমাগত। দৈনিক “বাংলা-কথার” কাজ করত প্রেমেনের সহকর্মী হিসেবে। তার লেখায় প্রসাদগুণের পরিচয় পেয়ে প্রেমেন তাকে “কল্লোলে” নিয়ে আসে। প্রথমটা একটু লাজুক, গম্ভীর প্রকৃতির ছিল, কিন্তু হৃদয়বানের পক্ষে হৃদয় উন্মোচিত না করে উপায় কি! অত্যন্ত সহজের মাঝে অত্যন্ত সরস হয়ে মিশে গেল অনায়াসে। লেখনীটি সূক্ষ্ম ও শাস্ত, একটু বা কোমলাঙ্গ। জীবনের যে খুঁটিনাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তরদৃষ্টি তার প্রতিই বেশি উৎসুক। “কল্লোলের” যে দিকটা বিপ্লবের সেন্দিকে সে নেই বটে, কিন্তু যে দিকটা পরীক্ষা বা পরীক্ষিত সে দিকের সে একজন। এক কথায় বিদ্রোহী না হোক সন্দানী সে। এবং যে সন্দানী সেট সংগ্রামী। সেই দিক থেকে “কল্লোলের” সঙ্গে তার ঐক্যদৃঢ়।

মনোজ বসুও না লিখে পারেনি “কল্লোলে”। “কল্লোলে” চাপা হল তার কবিতা—জসিমী চক্রে লেখা। তার মেসের বিছানার তলা থেকে কাঁবতাটি লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল কবি ধারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মনোজের সঙ্গে পড়োচ এক কলেজে। মনের প্রবণতায় এক ন হলেও মনের নবীনতায় এক ছিলাম। “কল্লোল” যে রোমাঞ্চমিষ্টম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইট কাঠ লোহা-লকড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে-বাদায় খালে-বিলে পতিতে-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় “কল্লোল” দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি, প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা। একদিকে নেতি, অগুদিকে আপ্তি। যোগবলের আরেক দৃষ্ট উদাহরণ মনোজ বসু। কর্ম কলদাতা, তাই কর্মে সে অনম্য, কর্মই তার আত্মলক্ষ্য। যে তীব্র পুরুষকারবান তার নিশ্চয়সিদ্ধি।

একদিন গুপ্ত ব্রহ্মসং-এ, আশু ঘোষের দোকানে, বিষ্ণু দে একটি স্মৃষ্কার

যুবকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। নাম ভবানী মুখোপাধ্যায়। মিতবাক শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা নির্মলমানস। সুনাম লেখার হাত আছে। তবলায় শুধু টাটি মারবার হাত নয়, দস্তরমতো বোল ফোটার হাত। নিয়ে এলাম তাকে “কল্লোলে”। তার গল্প বেকলো, দলের খাতায় সে নাম লেখালে। কিন্তু কখন যে হৃদয়ের পাতায় তার নাম খিল কিছুই জানি না। যখন আমাদের ভাব বদলায় তখন সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধু বদলায়, কেননা বন্ধু তো ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু ভবানীর বদল নেই। তার কারণ বন্ধুর চেয়েও মানুষ যে বড় তা সে জানে। বড় লেখক তো অনেক দেখেছি, বড় মানুষ দেখতেই সাধ আজকাল। আর সে বড়ত্ব গ্রন্থের আয়তনে নয়, হৃদয়ের প্রসবতায়। যশবৃন্দ আর জন-প্রিয়তা মুহূর্তের ছলনা। টাকা-পয়সা ক্ষণবিহারী রঙচঙে প্রজাপতি। থাকে কি? টেকে কি? টেকে শুধু চরিত্র, কর্ণোদযাপনের নিষ্ঠা। আর টেকে বোধ হয় পুরানো দিনের বন্ধুত্ব। পুরানো কাঠ ভালো পোড়ে, তেমনি পুরানো বন্ধুতে বেশি উষ্ণতা। আনন্দ বস্তুতে নয়, আনন্দ আমাদের অন্তরের মধ্যে। সেই আনন্দময় অন্তরের স্বাদ পাওয়া যায় ভবানীর মত বন্ধু যখন অনন্তর।

এই সম্পর্কে অবনোদ্য রায়ের কথা মনে পড়ছে। চিরকাল প্রায় প্রবাসেই কাটালেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বরাবর নিবিড় সংযোগ রেখে এসেছেন। চাকরির খাতারে যেখানে গেছেন সেখানেই সাহিত্যসভা গড়েছেন বা মরা সভাকে প্রাণরসে উজ্জীবিত করেছেন। হাতে নিয়েছেন আধুনিক সাহিত্য-প্রচারের বতিকা। কলকাতায় এসেও যত সাহিত্য-ঘোঁষা সভা পেয়েছেন, “রবীন্দ্রসর” বা “সাহিত্য-সেবক সমিতি,”—ভিড়ে গিয়েছেন আনন্দে। নিজেও লিখেছেন অল্প—“সবুজ পত্র” থেকে “কল্লোলে”। সাহিত্যিক সুনলেই সৌহার্দ্য করতে ছুটেছেন। আমার তিরিশ গিরিশে প্রথম যৌজ নিতে এসে সুনলেন আম দিল্লি গিয়েছি। মৌরাত ঘাবার পথে দিল্লিতে নেমে আমাকে খুঁজে নিলেন সমর প্রসে, ভবানাদের বাড়িতে।

“কল্লোলে” অনেক লেখকই ক্ষণস্থায়ী প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ হয়েছেন। অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। “কল্লোলের” দিনে একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেখি সে গল্প লেখে, এবং যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ার মত, বস্তু আর ভক্তি দুইই অগতালুগ। খুশি হয়ে তার ‘কলের নৌকো’ ভাসিয়ে দিলাম “কল্লোলে”। ভেবেছিলাম ঘাটে-ঘাটে অনেক রক্ত-গণ্যভার সে আহরণ করবে। কোথায় কোন দিকে যে ভেসে

গেল নৌকো, কেউ বলতে পারল না। ডুবে তলিয়ে গেল কি না তাই বা কে বলবে। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তার পুনরাবির্ভাব হল। এখন আর সে ‘কলের নৌকা’ হয়ে নেই, এখন সে সমুদ্রাভিসারী সুবিশাল জাহাজ হয়ে উঠেছে—নতুনতরো বন্দরে তার আনাগোনা। ভাবি জীবনে কত বড় যোগসাধন থাকলে এ উন্মোচন সম্ভবপর।

কল্লোল-আপিসে তুমুল কলরব চলেছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ কে একজন খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে গুটিহুটি। পাছে তাকে দেখে কেলে হল্লোড়ের উত্তালতায় বাধা পড়ে, একটি অট্টহাসি বা একটি চিৎকারও বা অর্ধপথে থেমে যায়—তাই তার সংকোচের শেষ নেই। নিজেই গুটিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে চুপিচুপি। কিংবা এই বলাই হয়তো ঠিক হবে, নিজেকে মুছে ফেলেছে সে সম্ভর্পণে। সকালবেলায়ও আবার আড্ডা, তেমনি অনিবার্য অনিয়ম। আবার লোকটি বোরয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে, তেমনি কুন্তিত অপ্রস্তুতের মত—যেন তার অস্তিত্বের খবরটুকুও কাউকে না বিব্রত করে। কে এই লোকটি? কর্তা হয়েছে যে কর্তা নয়, কে এই নির্লেপ-নিমুক্ত উদাসীন গৃহস্থ? সবহমানে তাঁকে স্মরণ করছি—তিনি গৃহস্থামী—দীনেশরঞ্জনর তথা “কল্লোলের” সবাইকার মেজদাদা। কাকুর সঙ্গে সংস্রব-সম্পর্ক নেই, তবু সবাংকার আত্মীয়, সবাংকার বন্ধু। বস্তুর আকারে কোনো কিছু না দিয়ে একটি রমণীয় ভাবও যদি কাউকে দেওয়া যায় তা হলেও বোধ হয় বন্ধুরই কাজ করা হয়। “কল্লোলের” মেজদাদা “কল্লোল”কে দিয়েছেন একটি রমণীয় সহিষ্ণুতা, প্রশ্ন প্রশ্ন।

পঁচিশ

“কল্লোলের” শেষ বছরে “বিচিত্রায়” চাকরি নিলাম। আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নাম সাব এডিটর। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

বহুবিশ্রুত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় “বিচিত্রায়” সম্পাদক। তাঁর ভাগ্নে ‘আদি’ পোস্ট-গ্রাজুয়েটে আমার সহপাঠী ছিল। সেই একদিন বললে চাকরি করব কি না। চাকরিটা অপ্রীতিকর নয়, মাসিক পত্রিকার আপিসে সহ-সম্পাদক। তারপর “বিচিত্রায়” মত উচ্চপালে পত্রিকা—যার স্তনেছি, বিজ্ঞাপনের পোস্টার শহরের দেয়ালে ঠিক-ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা

দেখবার জন্তেই ট্যান্ডি-ভাড়া লেগেছিল একটা ক্ষীণকায় অন্ধ। কিন্তু আমরা নিম্নিত অতি-আধুনিকের দলে, অভিজ্ঞতায় মহলে পাত্তা পাব কিনা কে জানে। সাহিত্যের পূর্বগত সংস্কার-মানা কেউ আছে হয়তো উদ্বেগের। সে-ই কামনীয় সন্দেহ কি।

কিন্তু উপেক্ষাবাবু অবাধ্যব্যায়ে আমাকে গ্রহণ করলেন। দেখলাম গণ্ডুজলে সফরীরাই ফরফর করে, সত্যিকারের যে সাহিত্যিক সে গভীরসঞ্চারী! উপেন-বাবুর ছই ভাই গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছইঅন্যেই আধুনিক সাহিত্যের সংরক্ষক ছিলেন। সুরেনবাবু তো সক্রিয় ভাবে অজস্র লিখেছেনও কল্লোল-কালিকলমে। গিরীন্দ্রবাবু না লিখলেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন মজঃফরপুর সাহিত্য-সম্মিলনে। খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি :

“আজ সাহিত্যের বাজারে শ্লীল-অশ্লীল স্বরুচিসম্পন্ন-কচিবিগহিত রচনার চুল-চেরা শ্রেণীবিভাগ লইয়া যে আলোচনার কোলাহল জাগিয়াছে তাহা বহু সময়েই সত্যকার কচিবি সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়। কুৎসিতকে নিন্দা করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা নিজেই কুৎসিত।

অশ্লীলতা এবং কুৎসিত সাহিত্য নিন্দনীয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা এমন একটা অদ্ভুত কথা নহে যাহা মাহুযকে কুৎসিত কণ্ঠে শিখাইয়া না দিলে সে শিখিতে পারিবে না। কিন্তু আসল গোল হইতেছে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমানির্দেশ ব্যাপার নইয়া। কে এই সীমা-নির্দেশ করিবে?... ”

এই তথাকথিত অশ্লীলতা লইয়া এত শব্দিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছেলেবেলায় আমি একজন শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি অন্তরিকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সমস্ত দিনটাই রাস্তায় লম্ফ দিয়া চলিতেন, কিন্তু যোজ্জই দিনশেষে তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে শুনিতাম যে, অন্তরিকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। মাঝে হইতে তাঁহার লম্ফকম্পের পরিক্রমই সার হইত। সাহিত্যেও এই অভ্যস্ত অন্তরিকায়োগের হাত এড়াইতে হইবে।...

যাহা সত্য তাহা যদি অন্তরিত হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা। বরং তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা কোথায় জানিয়া লইয়া সাবধান হওয়াই বিবেচনার কার্য।...

মাসিকে সপ্তাহিকে দৈনিকে আজ এই হাহাকারই ক্রমাগত শোনা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের আজ বড় দুর্দিন, বাঙলা-সাহিত্য জ্বালালে ভরিয়া গেল—

বাঙলা-সাহিত্য ধ্বংসের পথে ক্ষত নামিয়া চলিয়াছে। হাহাকারের এই একটা মন্ত দোষ যে, তাহা অকারণ হইলেও মনকে দমাইয়া দেয়, খামকা মনে হয় আমিও হাহাকার করিতে বলি। এই সভায় সমাগত হে আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, বাঙলা-সাহিত্যের অত্যন্ত শুভদিনে আপনাদের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে, এত বড় শুভদিন বাঙলা-সাহিত্যের আর আসিয়াছিল কি না জানি না। বাঙলা-সাহিত্যজননী আজ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎবরণ্যা। জননীর পূজার জগ্না যে বহু বঙ্গসন্তান, সক্ষম অক্ষম, বড় ও ছোট—আজ ধরে-ধরে অর্ধের ভার লইয়া মন্দির-পথে উৎসুক নেত্র ভিড় করিয়া চলিয়াছেন, এ দৃশ্য কি সত্যই মনোরম নহে?”

উপেনবাবুই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন নি, না কোনো সাহিত্য-সাহচর্যে না কোনো লেখায়-বক্তৃতায়। তাই কিছুটা সংকোচ ছিল গোড়াতে। কিন্তু, প্রথম আলাপেই বুঝলাম, “বিচিত্রা”র ললাট যতই উচ্চ হোক না কেন, উপেনবাবুর হৃদয় তার চেয়ে অনেক বেশি উদার। আর, সাহিত্যে যিনি উদার তিনিই তো সবিশেষ আধুনিক। কাগজের ললাটে-মলাটে যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকচাপা থাক না কেন, অন্তরে সত্যিকারের রসসম্পদ কিছু থাক, তাই উপেনবাবুর লক্ষ্য ছিল। সেই কারণে তিনি কুলীনে-অকুলীনে প্রবীণে-নবীনে ভেদ রাখেননি, আধুনিক সাহিত্যিকদেরও সাদরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বয়সের প্রাবীণ্য তাঁর হৃদয়ের নবীনতাকে গুচ্ছ করতেও পারেনি। আর যেখানেই নবীনতা সেখানে সৃষ্টির ঐশ্বর্য। আর যেখানেই প্রীতি সেখানেই রসস্বরূপ।

আর এই অক্ষয়-অক্ষুণ্ণ প্রীতির ভাবটি সর্বকণ পোষণ করেছেন কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়—বাংলা-সর্বজনীন দাদামশাই। “কল্লোলে” তিনি শুধু লেখেনইনি, সবাইকে স্নেহানীবাদ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দু’টি সাধ ছিল—প্রথম, ভক্তের রাজা হবেন, আর দ্বিতীয়, গুটিকে সাবু হবেন না। কেদারনাথের জীবনেও ছিল এই দুই সাধ—প্রথম, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দর্শন পাবেন আর দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হবেন। এই দুই সাধই বিধাতা পূর্ণ করেছিলেন তাঁর।

সজ্জা শোভা ও কারুকার্যের দিকে “বিচিত্রা”র বিশেষ ঝোঁক ছিল। একেক সময় ছবির জমকে লেখা কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, মনে হত লেখার চেয়ে ছবিরই বেশি মর্যাদা—অস্বচ্ছন্দ্য চাইতে চর্মচন্দ্র। লেখকের নামসজ্জা নিয়েও কারিকুরি ছিল। প্রত্যেক লেখার দু’অংশে নাম ছাপা হত। লেখার নিচে লেখকের যে

নাম সেটি লেখকদত্ত, তাই সেটি ত্রীহীন, আর যেটি শিরোভাগে সেটি সম্পাদকদত্ত তাই সেটি শ্রীযুক্ত। , এর একটা তাৎপর্য ছিল। নামের আগে যে শ্রী বসে সেটা সম্মান হয়ে বসে, তার অর্থ, নামধারী একজন শ্রীসম্পৎশালী লক্ষ্মীমন্ত লোক। নিজের পক্ষে এই সাহস্কার আত্ম-ঘোষণাটা শিষ্টাচার নয়। তাই বিনয়বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোক নিজের নামের আগে এই শ্রী ব্যবহার করে না। সেই ব্যবহারটা অব্যবহার। কিন্তু পরের নামের বেলায় শ্রীযুক্ত করে দেয়াটা সৌজন্যের ক্ষেত্রে সমীচীন। পরকে সম্মান দেওয়া স্তম্ভস্বয়বান আখ্যা দেওয়া ভদ্রতা, সভ্যতা, বিনয়বাক্যের প্রথম পাঠ। এই তাৎপর্যের ব্যাখ্যাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর, এটি একটি মথার্থ ব্যাখ্যা।

যতদূর দেখছি, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধহয় আত্মোল্লেখ প্রথম শ্রী বর্জন করেন। এবং সে সব দিনে এমন অরসিকেরও অভাব ছিল না যে ‘ত্রীহীন চারু’কে নিয়ে না একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে।

আসলে সব চেয়ে সরল ও পরিচ্ছন্ন, নাম নামের আঁকারেই ব্যক্ত করা। নাম শুধু নামই। নামের মধ্যে নাম ছাড়া আর কিছুই নাম-গন্ধ না প্রকাশ পায়। শ্রী একেবারে বিশ্রী না হোক, নামের ভো বটেই, প্রসঙ্গেরও বহির্ভূত।

একদিন ছুপুরবেলা বসে আছি—দা, বলতে পারি, কাজ করছি—একটি দীর্ঘকায় ছেলে ঢুকল এসে বিচিত্রা আপিসে। দোতলায় সম্পাদকের ঘরে।

উপেনবাবু তখনো আসেননি! আমিই উপনেন্তা।

‘একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে’—হাতে একটা লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল।

প্রথমে একটা ক্ষিপ্ততা তার চোখে-মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দোহিত। গল্প যেন সে এখনি শেষ করেছে আর যদি কাল বিলম্ব না করে এখনি ছেপে দেওয়া হয় তা হলেই যেন ভালো হয়।

‘এই রইল—’

ভক্তিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীত হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু দ্বন্দ্ব নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কোতুল নেই একরতি।

যেন এলুম, লিখলুম আর জয় করলুম—এমনি একটা দ্বিবা ভাব।

লেখাটা নিলুম হাত বাড়িয়ে; গল্পটির নাম ‘অতসী মামী’। লেখক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক ভট্টাচার্য যিনি লিখতেন এ সে নয়। এ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখাটা অদ্ভুত ভালো লাগল। উপেনবাবুও পছন্দ করলেন। গল্প ছাপা হল “বিচিত্রা”য়। একটি লেখাতেই মানিকের আবির্ভাব অভ্যর্থিত হল।

মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে “কল্লোল” ডিঙিয়ে “বিচিত্রা”য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে “কল্লোলেবই” কুলবর্ধন। তবে ছোটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো স্বরাধিত। কল্লোলের দলের কারু-কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে, তখন মানিক বোধ হয় শুক্তি-য়গ! এক যুগে যা অশ্লীল পরবর্তী যুগে তাই জ্বলো, সম্পূর্ণ হতশাবাক্ষক।

“বিচিত্রা”য় এসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মিলিত হই। তখন তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ ছাপা হচ্ছে—মঝে-মঝে বিকেলের দিকে আসতেন “বিচিত্রা”য়। যখনই আসতেন মনে হত যেন অল্প জগতের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। সে জগতে প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব—যেন অনেক শান্তি অনেক ধ্যানলীনতার সংবাদ সেখানে। ছায়ামায়াভরা বিশালনির্জন অরণ্যে যে তাপস বাস করছে তাকেই যেন আসন দিয়েছেন হৃদয়ে—এক আত্মতোলা সন্ন্যাসীর সম্পর্কে তিনিও যেন সমাহিত, প্রসন্নগম্ভীর। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য আত্মসংযোগ রেখেছেন বলে তার ব্যক্তে ও মৌনে সর্বত্রই সমান স্বচ্ছতা, সমান প্রশান্তি। তাঁর মন যেন অনন্তভাবে স্থির ও আবিষ্ট। মনের এই স্তব্ধতা বা নৈরম্যশক্তি অল্প মনকে স্পর্শ করবেই। যে মানবপ্রীতির উৎস থেকে এই প্রজ্ঞা এই আনন্দ তাই তো পরমপুরুষার্থ। এই প্রীতিস্বরূপে অবস্থিতিই তো সাহিত্য। এই সালিত্যে বা সহিত-ত্বেই বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবস্বচ্ছধবল নিশ্চিন্ত-নিম্পৃহ বিভূতিভূষণ।

এই বিভূতিভূষণের আওতায় এসে “শনিবারের চিঠি” তার স্বর বদলাতে শুরু করল। অর্থাৎ সে স্তুতি ধরলে। এর আগে পর্যন্ত সে একটানা স্তুতি-নিন্দা করেই এসেছে, পণ্ডের ছিত্রদর্শনই তার একমাত্র দর্শন ছিল। চিন্তের ধর্মই এই, যখন সে যার ভাবনা করে, তখন তদাকারাকারিত্ব হয়। আকাশ বা সমুদ্র ভাবলে মন যেমন প্রশান্ত ও প্রসারিত হয় তেমনি ক্রোধ ও কর্দম ভাবলে হয় দূষিত ও কলুষিত। যার শুধু পয়ের দোষ ধরাই বৌক—এমন মজা—সে দোষই তাকে ধরে বসে। আর, ভাগ্যের এমন পরিহাস, যে অশ্লীলতার বিকল্পে জেহাদ

ঘোষণা করে সে-ই শেষে একদিন সেই অল্লীলতার অভিযোগেই রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়।

সব চেয়ে লাজনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস। “শনিবারের চিঠি”র হয়তো ধারণা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ নন—তঁারই প্রশংসার আশ্রয়ে তারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রাভবনে যে বিচার-সভা বসে তা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের গতি ও রীতি নিয়ে যে তর্ক উঠেছে তার মীমাংসা নিয়েই সে সভা। মীমাংসা আর কি, রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাই শোনা।

দু’দিন সভা হয়েছিল। প্রথম দিন “শনিবারের চিঠি” উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় দিন ছিল। তার দলে অনেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—মোহিতলাল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, গোপাল হালদার—তবে দ্বিতীয় দিনের সভায় ও-পক্ষে ঠিক কে-কে এসেছিলেন মনে করতে পারছি না। কাল্লাল দল দু’দিনই উপস্থিত ছিল। আর অগ্রপক্ষদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, প্রশান্ত মহলানবিশ, অপূর্বকুমার চন্দ, নরেন্দ্র দেব—আর সর্বোপরি অবনীন্দ্রনাথ।

কথা-কাটাকাটি আর হট্টগোল হয়েছিল মন্দ নয়। এর কোনো ডিক্রি-ডিসমিস আছে, না, এ নিয়ে আপোষ-নিষ্পত্তি চলে ? দল বেঁধে যদি সাহিত্য না হয়, তবে সভা করেও তার বিধি-বন্ধন হয় না।

চরম কথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, ‘এদের লেখা যদি খারাপ তবে তা পড়ো কেন বাপু। খারাপ লেখা না পড়লেই হয়।’

শুধু নিজেরা পড়েই ক্ষান্ত নেই, অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে পড়ানো চাই। আর তারি জন্তে মণি-মুক্তা অংশটিতে ঘন-ঘন ফোঁড় দিয়ে দেওয়া যাতে করে বেশ নিরিবিলিতে বসে উপভোগ করা চলে। প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপনটি এইরূপ : “অল্লীলতার জন্ত যাহারা শনিবারের চিঠির মণিমুক্তা অংশটি না ছিঁড়িয়া বাড়ি যাইতে পারেন না বলিয়া আপত্তি করেন তাঁহাদের জন্ত মণিমুক্তা perforate করিয়া দিলাম।” কেউ-কেউ আকর্ষণ বাড়াবার জন্তে পৃষ্ঠাগুলো আঠা দিয়ে এঁটে দেয়, কেউ-কেউ বা স্বচ্ছাবরণ জ্যাকেটে পুরে রাখে।

অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি ‘সাহিত্যধর্ম’ নামে ছাপা হল

“প্রবাসী”তে। মূল কথা যা বলেছিলেন সেদিন, তা যেন আজকের দিনের সাহিত্যের পক্ষেও প্রযোজ্য।

“রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।

মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে।...অতএব বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে-কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন কথাটা বলা হয়েছে তার উপর বোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিই।...

কল্পনার খনি বা পানুওয়ারালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসবে? এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় এ মানতে পারব না। বিশেষ একটা চাপরাসপরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতে সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। তার ভিতরকার দৈন্ত আছে বলেই চাপরাসের দেমাক-বেশি হয়।...আজকের হাতে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়।...সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্বতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায়, যখন দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।...বিষয়-প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয়, তা হলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।”

কিন্তু আসল মর্মকথাটি কি?

“রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন—অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বোধ করি চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্তে নয়, ধনের জন্তে নয়, রাজকন্টারই জন্তে। এই রাজকন্টার স্থান ল্যাবরটরিতে নয়, হাট-বাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে, যেখানে কাব্যের কল্ললভায় ফুল ধরে; যাকে জানা যায় না, যার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়—তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, ‘তুমি কেন?’ সে বলে, ‘তুমি যে তুমিই এই আমার যথেষ্ট।’ রাজপুত্রও রাজকন্টার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথের এই ‘সাহিত্যধর্ম’ নিয়েও তর্ক ওঠে। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন “বঙ্গবাণী”তে—‘সাহিত্যের রাতি ও নীতি’। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র তো প্রকাশ্যভাবেই আধুনিক-

তার স্বপক্ষে। “শনিবারের চিঠি” মনে করল, রবীন্দ্রনাথও যেন প্রচ্ছন্নরূপে
আশীর্বাদময়। নইলে এমন কবিতা তিনি কেন লিখলেন ?

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ;
উর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হ’তে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিকুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, “আশীর্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।” সরোবর কহিল হাসিয়া,
“আশীষ তোমার তরে নীলাশ্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাত সূর্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরি তপস্বীর
নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ-নীর
তোমাতে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায় হ’তে
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্ঝরিত স্রোতে
সঙ্কীর্ণ-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিম্বপুঞ্জ পথরোধী পাঁচাণ-সঙ্কয়
গুট জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিগে আপনাতে জাগাবে উৎসাহ ॥”

শুধু আশীর্বাদ নয়, বিপক্ষদলের শত্রুকে “মসীকৃষ্ণ” বলা, “জড়” বলা।
অসহ। স্বতরাং বেড়া-আঙুনে পোড়াও সবাইকে। অন্ধা ভক্তি ভদ্রতা
শালীনতা সব বিসর্জন দাও।

স্তব্ধ হল সে এক উদ্ভগু তাণ্ডব। “তাণ্ডবে তুষিয়া দেবে খণ্ডাইবে পাপ।”
পাপটি খণ্ডে গেল, মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে কোল দিলেন। কংস পেয়ে গেল
কৃষ্ণের পাদপদ্ম।

স্ববাতাস বইতে লাগল আস্তে আস্তে। কটকটি ছেড়ে সহজির চেঁচা-চঁচা
শুরু করল “শনিবারের চিঠি”। বিভূতিভূষণের আগমনেই এই বাক নিলে,
বাকাকে সোজা করার সাধনা। আসলে রোষ অন্ত গেলেই রস এসে দেখা
দেয়। “শনিবারের চিঠি”ও ক্রমে-ক্রমে রোষের জগৎ থেকে চলে আসতে
লাগল রসের জগতে। “পতন রবুদয়-হুর্গম-পন্থা” শেষ পর্যন্ত “পতন-অভ্যুদয়-
বন্ধুর-পন্থা” বলেই মান পেল। “খোকা-ভগবান” বা “গক্” মান পেল

বহাপুরুষপ্রবয় নেতাজীরূপে! বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম পেল উপযুক্ত স্বদেশ-
 প্রেমীর বিজ্ঞাপন। ক্রমে-ক্রমে সে স্বাভিমানের সংসারে দেখা দিতে লাগল
 বিতৃষ্ণাভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাকর, কিছুকালের জন্তে বা মানিক, মনোজ,
 বনফুল—এবং পরবর্তী আরো কেউ-কেউ। বস্তুত ইচ্ছে করলে ওদের সহজেও
 কি অপভাষ রচনা করা যেত না? কিন্তু “শনিবারের চিঠি” হৃদয়ঙ্গম করল শুধু-
 নিন্দা কোথাও নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় না; আর শুধু প্রশংসা কোথাও নিয়ে
 গিয়ে পৌঁছে না দিলেও অন্তত হৃদয়ে এনে জায়গা দেয়। সেই তো অনেক।
 এমনিতে সমালোচনা নয়, অমনিতেও সমালোচনা নয়। তবে বৈরাচরণ না
 করে বন্ধুত্ব্য করাই তো শুভকর। আঘাত অনেকই তো দিয়েছি, এবার
 আলিঙ্গন দেয়া যাক। দেখিয়েছি কত পরাক্রান্ত শত্রু হতে পারি, এখন দেখানো
 যাক হতে পারি কত বড় অনিন্দ্যবন্ধু। সজনীকান্ত প্রীতির মায়াপাশে বাঁধা
 পড়ল। যার যেমন পুঁজি, জিনিসের সে সেই রকমই দাম দেয়। কিন্তু অন্তরে
 প্রীতি জন্মালে বোধ করি নিজেকেও দিয়ে দিতে বাধে না।

“কল্লোল” উঠে যাবার পর কুড়ি বছর চলে গেছে। আরো কত বছর চলে
 যাবে, কিন্তু ওরকমটি আর “ন ভূতো ন ভাবী”। দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে
 দিনে-দিনে, কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়ে-
 ছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই—সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে।
 যারা একদিন সে আলোকসভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবনিয়ে
 পরস্পর-বিচ্ছিন্ন—প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত—তবু,
 সন্দেহ কি, সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহাকাশের গ্রহতারা। যে যার
 নিজের ধান্দায় ঘুরছে বটে, কিন্তু সব এক মত্রে বাঁধা, এক ছন্দে অহুর্ভূত।
 তত্ত্বাতীত সত্তা-সমুদ্রের কল্লোল একেক জন। বাহ্যত বিভিন্ন, আসলে একত্র।
 কর্ম নানা আনন্দ এক। স্পর্শ নানা অহুর্ভূতি এক। তেমনি সর্বঘটে এক
 আকাশ, সর্বপীঠে এক দেবতা, সর্বদেহে এক অধিষ্ঠান। “একো দেবঃ সর্বভূতেষু
 গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাঙ্গা!” তাই সর্বত্র মহামিলন। ভেদ নেই, দ্বৈত
 নেই, তারতম্য নেই, সর্বত্র এক সনাতনের উপাসনা।

সূচীপত্র

অখিল নিয়োগী	২১৮	আফজল-উল-হক	৩৪, ৭২, ১৮৮
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	১২১	আভ্যদয়িক	১৩-১৫, ২১
অজিতকুমার দত্ত	২২, ১৪৪, ১৬২-৬৪	আন্ততৌষ মুখোপাধ্যায়	১১১
	১৭৪	আন্ত ঘোষ	৬৭-৬৮, ২১, ২৩৮
অজিত চক্রবর্তী	২১৪	ইয়োন নোগুচি	১৮৩
অজিত সেন	৬৮	উত্তরা	২৮-২২, ১০৩-৪
অতুল গুপ্ত	১১২	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৪০-৪৩
অতুলপ্রসাদ সেন	২৮, ১০৩	উমা গুপ্ত	৬৪
অনিল ভট্টাচার্য	১৬২, ১৭০	উষারঞ্জন রায়	১০
অন্নদাশঙ্কর রায়	২০০-১৪	এইজ জি ওয়েলস	১৮৩
অপূর্বকুমার চন্দ	২৪৫	এম এম ব্রিজেন	১৮২
অবনীনাথ রায়	১৩২	কঙ্কাবতী	১৩৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৫	কান্তিচন্দ্র ঘোষ	৪১
অবিনাশ ঘোষাল	১২৮	কামিনী রায়	২৫
অমরেন্দ্র ঘোষ	২৩২	কালিদাস নাগ	১১৪-১৫ ১২১, ১৭৮,
অমল হোম	২৮, ১৫৭		১৮৩, ১৮২
অমলেন্দু বসু	১৬২, ১৭০	কিরণকুমার রায়	৪৫
অমিয় চক্রবর্তী	২০২, ১১২-১৪	কিরণ দাশগুপ্ত	৫৩
অরবিন্দ দত্ত	৪৫-৪৬	কৃষ্টিশাস ভদ্র	২০৩-৪
অরসিক রায়	২০২	কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪২
অরিন্দম বসু	২১৮	ক্ষিতীন সাহা	১৬১
অশোক চট্টোপাধ্যায়	২৪৫	গণবাণী	১৩
অশ্রু দেবী	৬৩	গণশান্তি	২৩
অহীন্দ্র চাঁদুরী	৫, ১১৪	গিরিজা মুখোপাধ্যায়	২২৮
আদি	২৪০	গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২৪১-৪২

গোকুলচন্দ্র	২-৬, ২১-২২, ২৬, ২৯, ৪৪, ৪৮-৫১, ৫৪-৫৫, ৫৯- ৬৩, ৯২, ১১১, ১১৪-১২৫, ১২৭, ১৪০, ১৭৮
গোপাল সান্যাল	২২৮
গোপাল হালদার	২৪৫
গোলাম মোস্তাফা	৩১
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯, ৩৮, ২৭৩
চিত্তরঞ্জন দাশ	১১১-১১৩
জগৎ মিত্র	১৪১
জগদীশ গুপ্ত	৯৯, ১৬০, ১৯৪-২৫
জলধর সেন	৬৮, ১৮৪-৮৫
জসিম উদ্দিন	১৩৬
জামিন্তো বেনাৰ্ভাতে	১৮১
জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৩-২৪
জীবনানন্দ দাশ	১২২-৩২, ১৬১
জ্ঞানাজন পাল	২৩, ২৫, ৫৭
কর্ণা	৫৪
তারানাথ রায়	২২৮
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়	২২২-৩৮, ২৪৮
দা-ঠাকুর	১৮৮
দিদ্বিমণি	১১৪-১৫
দীনেশচন্দ্র সেন	১১৪ ১১৬
দীনেশবৰ্জ্জন দাশ	৫, ৬, ২২, ২৯, ৪১- ৪৪, ৪৭-৪৮, ৫১-৫২, ৫৭-৬০, ৬২, ৯১, ১১২, ১২২, ১২৯, ১৩৩-৩৪, ১৪০, ১৫৮, ১৬০, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৮, ১৮২-৯১, ২২৪, ২৩৭
দেবকী বসু	২২০-২১
দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	২০-১২

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	৭৮
ধন্ননীধর মুখোপাধ্যায়	২৭
ধীৰাজ ভট্টাচার্য	২১, ২৬
ধীরেন গাঙ্গুলি	২২০
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৩৮
ধুমকেতু	৩৪-৩৭, ৪১
ধূৰ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৯১
নজরুল ইসলাম	১০, ২২-৩১, ৪১-৪২, ৪৪-৪৬, ৫১, ৫৬, ৬১, ৬২, ৬৬, ৯১, ৯২, ১২৩-২৫, ১৪২-৫০, ১৫৪-৫৫, ১৬০, ১৬৬-১৬৭, ১৭৪, ১৭৫, ১৮৮, ১৯৬, ২২৯
নতুন বাবু	৭৯
নরেন্দ্র দেব	১৮৫-৮৬, ১৮৯, ২৪৭
নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৫৪, ১৯৬, ১৯৯, ২১৬, ২৪৬
নলিনীকান্ত সরকার	৩৯-৪০
নলিনীকিশোর গুহ	২২৮
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	২৫
নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৫
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩০-৩১
নিরুপম গুপ্ত	১২৬
নীরদ চৌধুরী	২৪৫
নীলিমা বসু	২০২
নীহারিকা দেবী	১-২, ২৬
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৬, ৫২-৫৫, ৩৭, ৫৮-৬২, ৪৪, ৪৭, ৫৫, ৭১, ৭২-৮২, ৯১, ১১২, ১২৭-২৯, ১৩৫, ১৪১, ১৫৮, ১৬১, ১৬৭, ১৭৪, ১৮৯, ১৯১, ২২৪, ২৩৭

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	২৮-২৯, ৩৭-৪২,
৪৪, ৯৮, ১১৬-১৭, ১২১-১২৭,	
১৪০, ১৮৯, ২৩৫-৩৬	
পরিমল ঘোষ	১৬৪, ১৭১
পরিমল গোস্বামী	২১৮
পরিমল রায়	১৬১-৬২, ১৭০
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	২১৬
পূর্বাশা	১০৪
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	১
প্রণব রায়	২১৬
প্রবাসী ১, ৩, ৩, ২১, ২৯, ১৮৩, ১৩০	
	২৩৫, ২৪৫
প্রবোধকুমার সান্যাল	৯১, ৯২
	১৬১, ১৭৬-৭৭, ১৯২-৯৩
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	১২৫-২৬
প্রভু গুহঠাকুরতা	২১৫-১৬
প্রমথ চৌধুরী	৩৮, ৬২-৬৩, ১২৬,
	১২৯, ১৭৫, ২১৬, ২৪৫
প্রমথ বিশি	১১৯, ২১৮
প্রমোদ সেন	২২৮
প্রশান্ত মহলানবিশ	২৪৫
প্রোমাকুর আতর্গী	১৮৫-৮৬
প্রোমেন্দ্র মিত্র ৩, ৭, ৯-২১, ২৬, ৩১,	
৪৪, ৫১-৫৩, ৫৮, ৬৮-৭৯, ৮০,	
৮১-৮৫, ৯১, ৯২, ১৪০, ১৫৬-৬১,	
১৬৫, ১৭৪, ১৮৯-৯১	
ফণীন্দ্র পাল	২১৬
ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৮
ফণীভূষণ চক্রবর্তী	১৬৪

ফেভারিট কেবিন	৭৯
ফোর আর্টস ক্লাব	
বনফুল	২৪৭
বলাই দেবশর্মা	২২০
বসন্ত	৩৮-৩৯, ৪৩
ব্রজেন্দ্র শীল	২৫
বাঁকা লেখা	১৪, ১২১
বারিদবরণ বসু	২২৮
বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
বিচিত্রা	২১, ৪০, ১৬৮, ২৪২
	২৪৪, ২৪৬
বিচিত্রাগৃহ	১৮৮, ২৪৫
বিজন সেনগুপ্ত	২২৮
বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত	২২৮
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	২২৮
বিজয় সেনগুপ্ত ৭১-৭৩, ১১১, ১২৫-	
	২৬, ২২৮
বিজলী	৪৫, ৬১, ১৩৩
বিনয় চক্রবর্তী	১৩-১৪, ১৬, ৫৩
বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮
বিপিনচন্দ্র পাল	৯, ২৩, ২৫
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	২২৮
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২১২, ২১৮,	
	২৪৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪-৪৫,	
	২৪৭
বিশ্বপতি চৌধুরী	২৬-২৭
বিষ্ণু দে	২১৪-১৫, ২১৬, ২৩৮
বীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	২৬, ৫৭
বুদ্ধদেব বসু ৯২, ৯৯, ১২৫, ১৪৪-৪৯,	
১৫১-৫২, ১৫৪-১৫৫, ১৬১-১৭২,	
১৭৪, ১৮৭-৮৮, ১৯০-৯১, ১৯৩,	
২১৬	

ভবানী মুখোপাধ্যায়	২৩২-৪০	বাগিনী রায়	১৩৪
ভাবু	১৮৪-৮৫	যুবনাথ	৭৫-৭৬, ১৪২, ১৫৪
ভী	২, ৩, ১৩	যোগেশ চৌধুরী	১৩২
ভূপতি চৌধুরী ৬, ৪৪, ১৩২-৪২, ১৮২		যোয়ান বোয়ান	১৮২
ভৃগুমার গুহ	১৬২, ১৬৭	রজনী হালদার	২১৭
মাডলিন বর্ল্যা	১৮০-৮১	রণেন্দ্র গুপ্ত	৭
মণীন্দ্র চাকী	৬৬-৬৭	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩-২৫, ৩৫-৩৬, ৩৮-৩৯, ১০৭-১১১, ১৪২, ১৫৩-৫৫, ১৭৫, ১৭৮, ১২৪-২৫, ২২৩-২৪, ২৪১-৪৮	
মণীন্দ্রলাল বসু	৫, ১০, ২১		
মণীশ ঘটক	৭৩, ৭৮, ১৬২,		
মনোজ বসু	২৩৮		
মন্মথ রায়	২১৮	রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	২৪৫
মহাকাল	২১৬-১৭	রম্যা বর্ল্যা	২৩, ১৭৮-৮০
মহাত্মা গান্ধী	১১২	রমেশচন্দ্র দাস	১৩, ১৬
মহিলা	১২০-২১	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪
মহেন্দ্র রায়	২২, ১২৬	রাজশেখর বসু	২১৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৪-৪৫, ১৪৭	রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	২৮-২৯, ১০৩
মালিনী	১১৪	রাধারাণী দেবী	১৮৮
মিলেস ক্রুট হামসন	৮২	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২১৭
মুরলীধর বসু ২২-২৩, ২৪-২৬, ৩০, ৪৪, ৫৩, ১৫৮-৬০, ১৮২, ১২৬ ২০৬		রামেশ্বর দে	২২৮
মেজদাদা	২৪০	রেনুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৬
মেজ বৌদি	৫১, ৭৮	লাউল	২৩
মোক্ষদাচরণ সামথ্যায়ী	৪০	লেখরাজ সামন্ত	১২১
মোসলেম ভারত	২২, ৩৪	শচীন কর	২৩
মোহনবাগান	৮৭-৯৭, ১৬৬-৬৭	শচীন সেনগুপ্ত	২০২
মোহিতলাল মজুমদার ৫৬-৫৭, ৬৪-৬৭, ১০০-১০৪, ১৫৮, ১৬৬, ১২৬, ২১৭		শচীন্দ্রলাল ঘোষ	২২৮
মোঁচাক	১৩	শনিবারের চিঠি	১৫৪, ১৫৯, ১৬৩, ১৭৪, ১৮৬-৮৭, ১২১-২৪, ২৪৫, ২৪৭-২৪৮
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৫৬, ১০৪-৫, ২১৭	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫, ১৩২, ১৪১-৪২, ১২০, ২০২-৩, ২১৬, ২২৪-২২৫, ২৪৬
যতীন্দ্রমোহন বাগচী	৩৩-৩৪, ১০৫	শশক চৌধুরী	২২৪, ২২৭-২২৮

শান্তা দেবী	১৭৮	স্বকুমার সরকার	
শিবরাম চক্রবর্তী	২৫-২৭, ২১৮-১৯	স্বধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০২.
শিশিরকুমার নিয়োগী	১২৬	স্বধীরকুমার চৌধুরী	১০
শিশিরকুমার ভাট্টা	১৩২-৩৬, ২২৩-২৪	স্বধীশ ষটক	১৬২, ১৬৭, ১৭০
		স্বনির্মল বসু	১০
শিশিরচন্দ্র বসু	১৩-১৪, ৫৩	স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৩
শুকথকর	১১৪	স্বনীতি দেবী	৫
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২১, ২৫-৩০, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৬৯-৭০, ২২, ২২, ১৪০, ১৫৮-৬০, ১৬৬, ১৭৪, ১৮২, ১২০-২১, ১২৭	স্বনীতি সজ্জ	৭৬
সংহতি	২২-২৬	স্বনীল ধর	২১৬
সজ্জনীকান্ত দাস	১৫৩-৫৫, ১৭৪-৭৭, ২৪৮	স্ববোধ-দাশগুপ্ত	১-৪, ৫৪, ৪৫-৪৬, ৫৭, ১৮২
সতীপ্রসাদ সেন	৬, ৬৪, ২১, ১২৮	স্ববোধ রায়	১৩৮, ২২৭
সত্যসন্ধ সিংহ	১২৬	স্বরেশ চক্রবর্তী	২৮-১০০, ১০৩-৪
সত্যেন্দ্র দাস	২১৬	স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৫-২৬, ২২৭, ২৪১
সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু	১৪১-১৪৪	স্বরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২১
সনৎ সেন	৭১	সোমনাথ সাহা	৫৩-৫৪, ২১
সন্ন্যাসী সাধুরা	২২৮	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৮৫
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	২৩৮	হরিহর চন্দ্র	৬৩, ১৮২
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪৫, ১৩৩	হসন্তিকা	১৮৬-৮৭
স্বকুমার চক্রবর্তী	১১৭	হেমচন্দ্র বাগচী	১৬১, ১৭৬-৭৭
স্বকুমার ভাট্টা	৪২, ৪৪, ৭১-৭২, ১১১, ১২৬-২২	হেমন্ত সরকার	২১২
		হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮৫
		হেমেন্দ্রলাল রায়	১৮৮-২১
		ছায়ায়ুন কবির	২২, ১৩৬-৩৭